এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান দুনিয়ার লাগাম পাশ্চাত্যের হাতে। এদের রাজনৈতিক শ্লোগান হল গণতন্ত্র ; সামাজিক বুলি হল মানবাধিকার ; আর এদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল সুদ। সুতরাং যারাই গণতন্ত্রের কথা বলবে তাদেরকেই পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে নির্বিরোধ মেনে নিতে হবে। আজ হোক কাল হোক অচিরেই তাদেরকে মানবাধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থার শোষণনীতিতে আত্মাহুতি দিতে হবে। কারণ, অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে প্রতিকূলে যাবার ভাবনা পাগলের কিংবা অর্বাচীনের। সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তার এ দীনতা ও বৈপরীত্য থেকে মুক্ত।

বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

বিশ্বায়ন

তাগুত

খিলাফাহ্



মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমানে দু'টি শরয়ী সমস্যায় ভুগছে।

এক. তাগুতের অনুসরণ.

দুই. সুদ ভিত্তিক লেন-দেন।

এখানে প্রথম সমস্যাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

প্রকাশকাল

প্রথম ঃ ২০০১

দ্বিতীয় ঃ ২০০২

তৃতীয় ঃ ২০০৪

প্রচ্ছদ

রেডিয়্যান্ট

প্রকাশক

মতিয়া হাসান

৫০০, মগবাজার

ঢাকা - ১২১৭

মুদ্রণ ঃ

রেডিয়্যান্ট, ১৭৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা- ১০০০।

ফোন : ৯৩৩৮৩৪২।

মূল্য ঃ দুইশত টাকা মাত্র

Bishayan Tagut Khilafah By Mohammad Aminur Rahman
Printed by Radiant, 173/2 Fakirapool, Dhaka-1000.
3rd Edition, June, 2004.

হাম্‌দ

জগতসমূহের প্রতিপালক বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি সকল করুণার আধার অতি পবিত্র সুউচ্চ মহান আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা এবং স্তুতি নির্দিষ্ট, আমরা তাঁর দরবারেই আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি। তাঁর সমীপেই ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমাদের প্রবৃত্তির সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তিনিই পারেন আমাদের মুক্ত করতে আর তিনিই সক্ষম আমাদের অন্তরে ঈমান ও জ্ঞান ঢেলে দিতে। তিনি যাকে চান সৎপথ প্রদর্শন করেন আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তার জন্য পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই, আবার তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যও কোন পথ প্রদর্শক নেই। হে আল্লাহ্! যে রাস্তায় তোমার অনন্ত পুরস্কার, রহমত, দয়া, মাগফিরাত বর্ষিত হয়েছে, যে পথ তোমার রাসূলদের, সিদ্দিকদের, শহীদদের এবং সৎকর্মশীলদের সে পথে তুমি আমাদের পরিচালিত কর। যে পথ কেবলই ধোকা প্রতারণার, যেখানে কেবলই লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা সেই তোমার অভিশপ্ত নাফরমানদের পথ থেকে তুমি আমাদেরকে দূরে রাখ। কবুল কর প্রভু, কবুল কর তোমার দাসদের এই আকুল আবেদন।

না'ত

যিনি অনাথ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও সমগ্র জগতবাসীর জন্য রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছেন, যিনি নিরক্ষর হওয়া সত্বেও সমগ্র মানবতার শিক্ষাগুরুতে উন্নীত হয়েছেন, যিনি তাঁর স্বভাব চরিত্রগুণে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগেও আল-আমীন বা বিশ্বস্ত নামে খ্যাত হয়েছেন, যাঁর মধ্যে নিহীত রয়েছে সমগ্র মানবতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ, যাঁকে অনুসরণ করলেই স্রষ্টার অনুসরণ হয় এবং স্রষ্টার ভালবাসা পাওয়া যায়, যাঁর নীতি এবং আদর্শ অনুসরণ ছাড়া খৃষ্টীয় ৬১০ সন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবতার একজনও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে না এবং পারবে না, যিনি সর্বকালের সর্বস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষরূপে বিশ্বে বরিত হয়েছেন সেই পুণ্যবান জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের স্মরণে জানাই লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম।

সাক্ষ্য

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আমার সকল ইবাদাত, দাসত্ব, প্রশংসা-স্তুতি, পূজা, অর্চনা পাওয়ার কেউ নেই। তিনি ব্যতীত আর কারো আইন-বিধান, নিয়ম-নীতি আমার জন্য প্রযোজ্য নয়, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই, মোহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত পুরুষ এবং একমাত্র মানুষ যাঁর অনুসরণ আমার জন্য শিরোধার্য। আমি আরও ঘোষণা করছি আমার সালাত, আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা-সাধনা, আমার জীবন, আমার মৃত্যু জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট, আর সর্বাগ্রে আমিই তাঁর দরবারে আত্মসমর্পিত, আমি তাঁর দাস, তিনি আমার প্রভু।

উৎসর্গ

তাগুত উৎখাতের চলমান আন্দোলনে যারা অংশীদার
তাগুত আক্রোশের যারা প্রকৃত শিকার
সদস্য যারা হিযবুল্লাহ্‌র
সেই যাদের খুনে রঞ্জিত হচ্ছে জমীন আল্লাহ্‌র
তাদেরই স্মরণে

প্রফেসর ড. আ ফ ম আবুবকর সিদ্দীক এর অভিমত

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

স্নেহভাজন মুহাম্মদ আমিনুর রহমান পেশাদার চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তার লিখা বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্‌ বইটিতে তার চিন্তার পরিশুদ্ধতা সুসংবদ্ধতা এবং পরিপক্কতার সাক্ষর রয়েছে। বর্তমান সময়কার প্রেক্ষাপটে দ্বীনের চৌহদ্দিতে শিরক এবং তাগুত কিভাবে কোন রূপে প্রবেশ করেছে তার সার্থক বিশ্লেষণ রয়েছে বইটিতে। আল্লাহ্‌ সোবহানাহু ওয়াতায়ালার উলুহিয়্যাত এবং রবুবিয়্যাতকে চ্যালেঞ্জ করেই যুগে যুগে শিরক ও তাগুত প্রবেশ করেছে দ্বীনের চিন্তা-দর্শনে, সমাজ সংস্কৃতিতে এবং ব্যক্তি সমষ্টির আচরণে। শিরক ও তাগুত এর সংমিশ্রণের দার্শনিক দিক কি এর জন্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কত খানি দায়ী, সর্বোপরি সমাজ-রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও সংস্কৃতি বিশ্বাসে এগুলো কী ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টি করেছে এ বিষয়গুলো উপস্থাপনে বইটি অনন্যসাধারণ বলে বিবেচিত হবে। বিশ্বায়নের স্বরূপ কি, এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য কি, মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এটা কতটা বিপজ্জনক বিশেষ করে গণতন্ত্রের পথ ধরে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আনুগত্যের মাধ্যমে শিরক প্রতিষ্ঠায়, মানবাধিকার বাস্তবায়নের পথ ধরে সামাজিক সম্বন্ধগুলোর শরীয়াহ নির্ধারিত সীমারেখার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন নিশ্চিত করণে, মুক্তবাজার অর্থনীতির ছল চাতুরিতে উম্মাহ্‌র সকল মেধা ও সম্পদের পাশ্চাত্য মুখি শ্রোত সৃষ্টিতে এবং সুদের প্রচলনে নব্য বৈশ্বিক নিয়ম কতটা পারঙ্গম তা এ বইতে স্পষ্টরূপে চিত্রায়িত হয়েছে। অপরদিকে এর মোকাবেলায় শরীয়তের মূলদাবী খিলাফাহ্‌র রূপ-রেখা নির্দিষ্ট করণে, সর্বোপরি ঐ খিলাফাহ্‌ বাস্তবায়নের পথও পদ্ধতি যে কোন অবস্থাতেই গণতন্ত্র হতে পারে না বরং তা যে একমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্‌ নির্দেশিত কর্মসূচী ও কর্ম পদ্ধতিতেই সম্ভব সে বিষয়ে লেখকের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার অবকাশ কম। আগ্রহী পাঠক সমাজে বইটির বহুল প্রচারের আশা রেখে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করছি।

৫.১০.০৪ ই.

প্রফেসর ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক
আবরী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কবি আবু জাফর এর অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র। প্রথমেই উল্লেখ করি, মুহাম্মদ আমিনুর রহমান-এর 'বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্‌' গ্রন্থটি আমাকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করেছে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌কে নিয়ে প্রণীত বহু ইসলামি সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা আমার আছে; সেই অভিজ্ঞতা থেকেই অকপটে ও দ্বিধাহীনচিত্তে বলছি, বইটি অসাধারণ। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় অনুগ্রহে আমিনুর রহমানকে দিয়ে এমন একটি অত্যাবশ্যক কর্ম সম্পাদন করালেন, যা এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্‌র আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির জন্য অতীব জরুরী।

যাই হোক, কঠিন বাস্তবতা হলো, মুসলিম উম্মাহ্‌ আজ বহুমুখী অধঃপাতের শিকার; এবং বিধর্মীদের ভয়াবহ চক্রান্ত শুধু নয়, রীতিমত করুণারও শিকার। কিন্তু এটা কোন দুর্ঘটনা নয়; ইসলামের প্রকৃত দাবী ও পয়গাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমান নিজেই নিজের এই করুণ পরিণতি ডেকে এনেছে। তাগুত-এর সঙ্গে সখ্য স্থাপনে উৎসাহী ও ধন্য রাজা-বাদশাহ্‌রাতো বটেই, মনীষীপ্রতিম বহু ইসলামি চিন্তাবিদও আজ এমন বিবিধ আপোষকামিতার কথা বলেন, যা ইসলামের প্রকৃত দাবীর প্রশ্নে খুবই বিপজ্জনকভাবে আত্মঘাতী। এতে মুসলিম উম্মাহ্‌ একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকেই হেদায়াত বলে মনে করছে, অপরদিকে কাফের মুশরিক মুনাফিকদের বর্ণিল চক্রান্তজালও মুসলিম মিল্লাতকে ক্রমাগত জড়িয়ে নিচ্ছে। তাগুত কী, খিলাফাহ্‌ কেন বিকল্পহীন, বিশ্বায়নের কী রহস্য, আধুনিক গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বিশ্বব্যবস্থা ইত্যাদি ইসলামের পেশকৃত জীবনব্যবস্থার সঙ্গে কী পরিমাণে সাংঘর্ষিক, এই সকল কথা আমিনুর রহমান অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে পেশ করেছেন। তিনি নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে কিছু বলেননি; মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও সপ্রতিভ-সমনস্ক ইতিহাস জ্ঞানই তাঁর নিজস্ব সম্বল। আর এই জন্যই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং সর্বোপরি আল কোরআন ও সহীহ্‌ হাদিসসমূহ থেকে দালীলিক প্রমাণ সহযোগে তিনি যা ব্যক্ত করেছেন, তা নিয়ে বিশেষ আর কোন দ্বিমতের অবকাশ থাকে না; মিল্লাতের আত্মবিশ্লেষণে বইটি হয়ে ওঠে একান্তভাবেই অকাট্য। বইটি পড়ে দেখবার জন্য আমি পাঠককে আহ্বান জানাই। জানাই এই জন্য যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বই আমাদের সবাইকে বিভ্রান্তিকর আপোষকামিতা থেকে আত্মরক্ষা ও আত্মসংশোধনের কথা বলবে, নতুন করে ভাবতে শেখাবে। ইসলামের যে প্রকৃত রূপরেখা, তার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য সত্যই এক অনবদ্য উপহার। আমিনুর রহমানকে আমরা আমাদের সপ্রীতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ্‌ হাফিজ।

আবু জাফর
১০৯ এস, বি, রোড
কুষ্টিয়া
আগস্ট ৩০, ২০০৪

পূর্বকথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির্‌ রাহীম

হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে আমাদের নিজেদের এবং আহালদের মুক্তির প্রশ্নে সচেতন আত্ম-জিজ্ঞাসা থেকেই এই লেখা। আশা করি, সুপ্রিয় পাঠক সমাজ নিজেদের আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে বইটিকে গ্রহণ করবেন। লেখার যাবতীয় দোষ-ত্রুটির সংশোধন কামনা করি এবং ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এ বইটির প্রথম মুদ্রণের নাম ছিল **"সত্যের সাক্ষ্য"**। নাম পরিবর্তনের পরামর্শ ছিল অনেকের। তাই দ্বিতীয় মুদ্রণে এর নাম পরিবর্তন করে **"তাগুত"** রাখা হয়। বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ দ্রুত শেষ হয়ে যায়। অনেকের পরামর্শ ছিল বইটিকে আরো বোধগম্য এবং বিস্তারিত করার। তাই এবার বইটির অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। বিশেষতঃ বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে তৌহিদবাদী জীবনের উপর যে সর্বগ্রাসী সর্বনাশী আক্রমণ চলছে প্রতি ক্ষণে, প্রতি স্থানে, প্রতি দিক থেকে এবং যার সূত্রপাত ঘটিয়েছে ইউরোপীয় জাগরণ, তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং পরবর্তীতে যাকে লালন-পালন ও ষোলকলায় বিকাশ সাধন করেছে বর্তমান সময়কার Novus Ordo Seclorum তথা New World Order-এর শ্লোগানদাতা আমেরিকা, তার সম্পর্কে কিঞ্চিত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াসে বইটির নতুন নামকরণ হয়েছে "বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্‌"।

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

সূচিপত্র

- ভূমিকা
- নোভাস অর্ডো সেকলোরাম
- মানবাধিকার
- মুক্তবাজার অর্থনীতি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

ভূমিকা

সর্বোচ্চ প্রশংসিত মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا

অতঃপর তাকে সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। [১]

بَلِ الاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ وَلَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرَهٗ

বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান,
যদিও সে নানারূপ ওজর-আপত্তি পেশ করে। [২]

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। [৩]

উপরের প্রথম বাক্যে আল্লাহ্ পাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক সবার অন্তরেই সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের জ্ঞান ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং কোনটা সৎ কোনটা অসৎ তা আমরা সবাই বুঝতে পারি। এখানে ভুল হওয়ার সুযোগ খুবই কম, যদি না আমরা দুনিয়াবী স্বার্থে অন্ধ হই। দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেন যে, সব মানুষ তার নিজ সম্পর্কে চক্ষুষ্মান, যদিও সে নানারূপ ওজর-আপত্তি পেশ করে। সুতরাং প্রথম বাক্যের সাথে মিলালে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ আমরা প্রত্যেকে অন্তরের অন্তঃস্থলে আমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্তব্যকে অনুধাবন করি এবং এর **মধ্যে কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ, কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয়** তা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি, যদিও আমরা নানারূপ টালবাহানা করি। তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমাদের যোগ্যতার পার্থক্য রয়েছে **এবং প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়ী।**

---

১. সূরা আশ্ শামস, আয়াত নং ৮।
২. সূরা আল ক্বিয়ামাহ্, আয়াত নং ১৪-১৫।
৩. সূরা আল বাকারাহ্, আয়াত নং ২৮৬।

সুতরাং আমরা যারা এ দুনিয়াতে আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে ভালোবাসি, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে বোঝার যোগ্যতা অর্জন করেছি, তারা সবাই বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক নাজুক অবস্থার সাথে এবং বর্তমান **বিশ্বায়নের** প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছি। আমরা যে পরিস্থিতি বুঝেছি এবং এই পরিস্থিতি যে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খুবই সঙ্গীন আর কাল কিয়ামতে আমরা যে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো তার প্রমাণ উপরোক্ত তিন আয়াত।

আল্লাহ্র দ্বীনকে মুছে দেয়ার সব রকমের ষড়যন্ত্রই পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। জগত জুড়ে মুসলমানদের আবাসভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সব দিক থেকেই বিজাতীয় শক্তির হুমকির সম্মুখীন হয়ে আছে। আমাদের ঈমান-আমান, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আমাদের তাহজীব-তমদ্দুন, সর্বোপরি আমাদের জান-মাল ও মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রু কোনটাই বাদ পড়ছেনা। এক মেরু বিশ্বের মোড়ল শয়তানের প্রতিভূ আমেরিকা-ইউরোপ তথা জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতা (**Novus Ordo Seclorum**)-এর সর্বগ্রাসী থাবা তো আছেই।

আমাদের এ সঙ্গীন অবস্থা কেন ?

এক কথায় এর একমাত্র কারণ হল **তাগুতের অনুসরণ**। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্যই আমরা মুসলমানরা আদিষ্ট হয়েছিলাম। আল্লাহ্র সব নবীই তাগুতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দিয়েছেন। প্রমাণ হল সূরা আন নাহ্লের ৩৬ নং আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি

এই নির্দেশ দেয়ার জন্য যে,

তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।

সূরা বাকারা-এর ২৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

সুতরাং যারা "তাগুতকে" অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে তারা আল্লাহ্র রজ্জুকে (দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে।

মনে রাখা দরকার, এখানে দ্বীনের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার পূর্ব শর্ত হলো দু'টি। এক. তাগুতকে অস্বীকার করা এবং **দুই.** আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা।

এখানে يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ বলা হয়েছে। يَكْفُرْ শব্দের " ر " বর্ণের উপর সকুন করা হয়েছে। সুতরাং এটি فِعْلُ شَرْط । তাই فِعْلُ شَرْط পূরণ না হলে جَوَابُ شَرْط ঠিক হবে না। যেমন অজুর চার ফরজের একটিও যদি আদায় না হয় তবে অজু হবে না, তেমনি তাগুতকে অস্বীকার না করলে দ্বীনের রজ্জুকে ধারণ করা যাবে না। যেমন পবিত্রতা অর্জন ছাড়া নামায হয় না, তেমনি তাগুতকে অস্বীকার করা ছাড়া ঈমান আনা হয় না। ঈমান আনা না হলে দ্বীনি জিন্দেগীও হয় না। সুতরাং তাগুতকে অস্বীকারের উপরই আমাদের ঈমান-আমল সহীহ্ হওয়া এবং পরকালীন নাজাত পাওয়া নির্ভর করে। সংক্ষেপে তাগুত হলো এমন কোন শক্তির প্রতিভূ, যে বা যারা আল্লাহ্র আইন বাদ দিয়ে নিজেদের গড়া আইন-কানুন দিয়ে দেশ ও সমাজ পরিচালনা করে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সকল আইন-কানুন গোটা বিশ্বের একক কর্তৃত্বের অধিকারী আমেরিকার ইচ্ছানুযায়ী কিংবা যারা আমেরিকার ঘোষিত আদর্শ মেনে নিয়েছে তাদের সমর্থন দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সেখানে আল্লাহ্র আইনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কাও করা হয়না। এমতাবস্থায় আমেরিকা হলো বিশ্ব তাগুত বা সবচাইতে বড় তাগুত। মুসলিম দেশসমূহের শাসকগণ, রাজা-বাদশাহ্গণ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় যে সব অঙ্গীকারনামাতে সই-স্বাক্ষর করে তার সবই পশ্চিমা আদর্শ তথা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মুক্তবাজার অর্থনীতি সমুন্নত করার অঙ্গীকারপত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এরা বিশ্ব তাগুতের প্রতিনিধিরূপে

আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দূরে ঠেলে রেখে বিজাতীয়দের আইন দিয়ে দেশ চালায়। তাই এরাও তাগুত। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মূল আদর্শগুলোর কিঞ্চিত পরিচয় তুলে ধরা হল যাতে বর্তমান সময়কালের সর্ববৃহৎ তাগুতকে চেনা যায়।

সর্বশেষে একটি কথা না বললেই নয় যে, এ অধমের একার পক্ষে এ জাতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না, যদি না নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং দুনিয়া বিমুখ পরিশ্রমী ও বিজ্ঞ ভাইদের শ্রম ও মেধা এখানে যোগ না হত। আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের নিঃস্বার্থ শ্রমকে কবুল করুন। অনুরূপভাবে এর ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচে যারা গোপনীয়তার আড়ালে থেকেই সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও আল্লাহ্‌ রব্বুল আ'লামীন যেন সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেন সেই দোয়া করছি সর্বান্তঃকরণে।

নোভাস অরডো সেকলোরাম

বিশ্বায়ন বা New World Order এর অপর নাম হলো নোভাস অরডো সেকলোরাম। ইউ. এস. ডলারের মধ্যে এ শ্লোগানটাকে উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে। ইউ. এস. ডলার এর যে ছবিটি নিচে দেয়া হলো তা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে।



দুই পার্শ্বের গোল বৃত্তের ন্যায় আমেরিকার সীলকে আমেরিকার দু'চোখের মত দেখানো হয়েছে। এর ডান গোল বৃত্তে যা আছে তা আমেরিকান সভ্যতার উত্তরোত্তর উন্নতির নির্দেশক। কিন্তু বাম দিকের গোল বৃত্তকে খুব ভাল করে খেয়াল করলে **নব্য বৈশ্বিক নিয়মের** নীতি এবং আদর্শকে বোঝা যায়। এই সীলের মধ্যে লেখা রয়েছে Novus Ordo Seclorum কথাটি। এখানে রয়েছে Pyramid যার চূড়ায় রয়েছে একটি চোখ।

পিরামিডের তিন পার্শ্বের তিন তল তিনটি মূল শ্লোগানকে নির্দেশ করে। পিরামিড শিলার কাঠিন্য এই শ্লোগানগুলোর পক্ষে তাদের দেয়া বক্তব্যের অনমনীয়তা এবং স্থায়িত্বের নির্দেশক। শ্লোগান তিনটি হলো-

- গণতন্ত্র
- মানবাধিকার
- মুক্তবাজার অর্থনীতি

বিশ্বায়নের রাজনৈতিক শ্লোগান **গণতন্ত্রের** জন্ম, ক্রমান্বয়ে তার শিকড় বিস্তার এবং পূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে জানার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যারা কষ্ট করে তা করেছেন তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত হবেন যে বহুত্ববাদ বা প্লুরালিজম, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম, বস্তুবাদ বা মেটেরিয়েলিজম, জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম-এর মত বিষয়গুলো গণতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, জীবন ও সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার, কথা বলার অধিকার নারীর সমানাধিকারসহ যাবতীয় অধিকারভিত্তিক বিষয়কে নব্য বৈশ্বিক নিয়মে হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার শিরোনামে আলোচনা করে। এ বিষয়গুলোর মানবিক দিকের কথা স্মরণ করে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ এগুলোকে নিজেদের জন্য ইতিবাচক মনে করে। কিন্তু **নব্য বৈশ্বিক নিয়মের** ধারক-বাহকগণ এগুলোর এমন একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং তাদের দেয় ব্যাখ্যাকে কার্যতঃ বাস্তবায়নের জন্য বাকী দুনিয়াকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য করে যার মাধ্যমে কেবল তাদের স্বার্থই সংরক্ষিত হয় আর বাকী সকলের অধিকার হয় অবহেলিত, পদদলিত কিংবা নিশ্চিহ্ন। অপরদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির পশ্চিমা ব্যাখ্যা স্পষ্টতঃই **নব্য বৈশ্বিক নিয়মের** প্রবক্তাদের স্বার্থে প্রণীত মহা শোষণ প্রক্রিয়ার 'সুগারকোটেড' নাম।

পিরামিডের চূড়ায় চোখটি এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে যাতে মনে হয় গোটা চিত্রকর্মের উপর এটিরই কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবেই নব্য বৈশ্বিক নিয়মের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ববাদী বক্তব্য **"জাতীয় স্বার্থ"** এই এক চোখ দ্বারাই সংকেতায়িত হয়েছে। নব্য বৈশ্বিক নিয়মের ধারক-বাহকগণ তাদের **জাতীয় স্বার্থের** প্রশ্নে এমনই এক চোখা যে সে ক্ষেত্রে তারা সকল নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। **"জাতীয় স্বার্থ"** শ্লোগানটি তাদের প্রতিটি সদস্যের মন-মগজে এমনভাবে গেঁথে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, তাদের কোন একজন যদি এ প্রমাণ পায় বা তাকে যদি বোঝানো সম্ভব হয় যে তার মা-বাবা-ভাই কিংবা দাদা-দাদী কেউ তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী তা হলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাত তার ঐ বাবা-মা-ভাই কিংবা দাদা-দাদী যে কেউ হোক না কেন তাকে গুলি করে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। IN GOD WE TRUST বলে যে কথাটি

লেখা রয়েছে তা তাদের এই **"জাতীয় স্বার্থ"** কথাটিকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের এই **'জাতীয় স্বার্থ'** নেহায়েত তাদের বস্তুগত স্বার্থ, ভোগ-বিলাস এবং জাতীয় অহংকারকে নিশ্চিত করে। বস্তুতঃ তারা এই জাতীয় স্বার্থেরই পূজা করে।

এই এক চোখ তাদের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্ধত্ব ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্দেশ করে, আর তা হলো তাদের গোটা সভ্যতা যে দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত সে দর্শনের মৌলিক পরিচয়। এ সভ্যতা যা Judio Christian Civilization নামে খ্যাত তা মূলতঃ এক চোখা। স্রষ্টার অস্তিত্ব সন্দিহান কিংবা অস্বীকার পোষণ করার সাথে সাথে তারা রুহ্ (আত্মা) এবং আত্মার মাঝে স্রষ্টার জ্ঞান ঢেলে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিষয়কে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের অন্তর্চক্ষু অন্ধ। সুতরাং অন্তরাত্মাকে নয়, কেবল বাহ্যিকতাকেই তারা গুরুত্ব দেয়। ইহকাল নিয়েই এরা ব্যস্ত, পরকাল সম্পর্কে হয় সন্দিহান কিংবা উন্নাসিক। নারী-পুরুষের বৈধ বৈবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবার তথা সমাজ গঠনের চাইতে বিবাহ বহির্ভূত একত্রবাস, সমকামী বিবাহ, যৌন অনাচারসহ বিকৃত রুচির এক অশ্লীল সমাজ তাদের নিকট যুক্তিযুক্ত এবং অধিক গ্রহণীয়। বৈধ ব্যবসায়িক লেন-দেনের তুলনায় সুদভিত্তিক শোষণ-নিপীড়নমূলক অর্থ ব্যবস্থা প্রচলনে এরা বদ্ধপরিকর। তাদের এই এক চোখা নীতি কিভাবে তাদের মন-মগজ দখল করলো এবং তার ফলে তারা বিগত শতাব্দীসমূহের পথ পরিক্রমায় কোন অবস্থানে আসল এবং বর্তমান বিশ্বের অপরাপর জাতি-গোষ্ঠি বিশেষ করে মুসলিম জন-গোষ্ঠির প্রতি তাদের মনোভাব কি তা জানতে হলে বিশেষ করে New World Order এর বাস্তব দলিল প্রমাণ জানতে হলে পাঠককে আমরা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে "এক চোখ" শিরোনামের প্রবন্ধটি পড়ার অনুরোধ জানাবো। **বিশ্বায়নের রাজনৈতিক বিষয় তথা গণতন্ত্র আমাদের অনেকগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনবসতিতে চালু হয়ে আছে। এর কারণে আমরা তাগুতের সরাসরি অনুসরণের মাধ্যমে শিরকে পঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়েছি।** তাই এই পুস্তকে গণতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হলো। বিশ্বায়নের বাকী দু'টি বিষয় সম্পর্কে এই অধ্যায়েই আলোচনা পেশ করা হলো। আমরা মনে করি মানবাধিকার এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান বিকৃতরূপ যদিও আমাদের সমাজে চালু আছে তবুও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে খিলাফাত আলা মিন্হাজিন নবুওয়্যাহ্ প্রতিষ্ঠিত হলে সত্যিকার মানবাধিকার এবং শোষণহীন সুষম বন্টনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানবাধিকার

চমৎকার শ্লোগান। শুনতে খুবই আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় মনে হয়। যে কেউ এ বক্তব্য আমেরিকানদের মুখ থেকে শুনবে কিংবা তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকে শুনবে সেই চমৎকৃত হবে। ইব্রাহীমি ধর্মের অনুসারিসহ বাকী সব ধর্ম যেখানে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সোচ্চার সেখানে মানুষের দুর্বল প্রবৃত্তিকে উচকিয়ে দিয়ে অধিকারভিত্তিক শ্লোগান তথা শিশু অধিকার, নারী অধিকার, কথা বলার অধিকার, জীবনের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার ইত্যাকার মুখরোচক শ্লোগানে মানবতাকে ঘুমে রেখে তারা তাদের কার্য সিদ্ধির মতলব আঁটে। প্রসঙ্গক্রমে **আমেরিকান সভ্যতার বর্তমান ধারক-বাহকদের** সামান্য পরিচয় তুলে ধরছি। সাধারণতঃ পশ্চিমা সভ্যতা বলতে বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকার সভ্যতাকে বোঝানো হয়। এ সভ্যতার আঁতুড় ঘর হল **ফ্রান্স এবং বৃটেন**। **বর্তমানে এ সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি আমেরিকা**। যারা খুব ভাল করে এ সভ্যতাকে পর্যবেক্ষণ করছেন তারা সকলেই একমত যে **ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদ** এবং **বর্তমান আমেরিকান বিশ্বায়ন** একই সূত্রে গাঁথা এবং একই ধারার **দ্বিতীয় স্তর** মাত্র। এর **তৃতীয় বা শেষ স্তর** সমাগত। Novus Ordo Seclorum, New World Order, Globalization এ তিনটি মূলতঃ সমার্থক। বাংলাতে একে বিশ্বায়ন বলে। সমার্থক বলেছি এ কারণে যে, এই শ্লোগানদাতারা তাদের আদর্শকে এই তিন নামেই উপস্থাপন করে। যদিও বিশ্বের সাধারণ মানুষ অনেক সময় সচেতনতার অভাবে তিনটিকে তিন ধরনের বক্তব্য মনে করে। দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের এভাবে বিভ্রান্ত রাখতে পারাটা তাদের কৃতিত্ব। অসম্ভব চাকচিক্যে ভরা এই আদর্শ। যে কেউ শুনে সে মোহিত হয় এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলে। **কেবল তারাই এ থেকে রক্ষা পায় যাদেরকে আল্লাহ্ পাক তাঁর খাস রহমতে এর অন্তর্নিহিত ধোকা-প্রতারণাসহ এর অন্তঃসারশূন্যতা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন।**

এমন সুজন, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক তাঁর মেহেরবানীতে রক্ষা করেছেন তারা সকলেই বর্তমান এ সভ্যতার মূল চালিকা হিসেবে **"আমেরিকান কর্পোরেটদের"**

চিহ্নিত করেছেন। এ কর্পোরেটদের **প্রায় সবাই ইয়াহুদী**। যারা (সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য) অ-ইহুদী কিন্তু কর্পোরেট তারাও চিন্তা-চেতনায় কর্মপদ্ধতিতে একেবারেই ইয়াহুদী কর্পোরেটদের ন্যায়। এই আমেরিকান কর্পোরেট সদস্যগণ আবার Ashkenazi Jew, এদেরকে অনেকে The Thirteenth Tribe নামেও অভিহিত করে থাকেন। এরাই Zionism নামক বর্ণবাদের মূল হোতা। যায়নবাদী ইয়াহুদীদের প্রকৃত পরিচয় নিম্নরূপ-

স্পেন ও পর্তুগালের ইয়াহুদীদের সেফার্দিম ইয়াহুদী এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদীদেরকে আশকেনাযিম ইয়াহুদী বলা হয়। হিব্রু ভাষায় স্পেনকে সেফারাদ এবং জার্মানিকে আশ্কেনায বলা হয়। সেফারাদ-এর নামানুসারে সেফার্দিম এবং আশকেনায-এর নামানুসারে আশ্কেনাযিম। যে পাহাড়ের উপর হজরত সোলায়মান (আ.)-এর মসজিদ বা বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত তার নাম যায়ন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইয়াহুদীদের জেরুজালেমে ফিরিয়ে এনে তাদের ধারণামতে তৌরাত ঘোষিত অঞ্চল নীল নদ থেকে ফোরাতের তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে যে আন্দোলন দানা বাঁধে এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে যে আন্দোলন উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাধিক শক্তিশালী ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্থায়ী রূপ দিয়েছে তাকেই ঐ পাহাড়ের নামানুসারে **যায়নবাদী আন্দোলন** বলে। এই যায়নবাদীরা বর্তমানে ঐ ইসরাঈল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ইউরোপীয় ইয়াহুদীদের শতকরা পঁচাশি ভাগই আশ্কেনাযিম। আনুমানিক ২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ককেসাস পাহাড় ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী রাশিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে যে জাতি ক্ষমতাধর ছিল তাদেরকে **খাযার** বলা হয়। এশিয়া মাইনরে ইসলামের বিজয় সূচনার অল্প আগেই খৃষ্টীয় ৬৯৬ অব্দে এই খাযার জাতির খাকান বা রাজা এক অজ্ঞাত কারণে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। তাকে অনুসরণ করে কিছু কালের মধ্যে খাযার জাতির অধিকাংশ লোক ইয়াহুদী ধর্মমত গ্রহণ করে। এই ধর্মান্তরিত খাযারদের শক্তিশালী প্রতিরোধের কারণেই ইসলাম ককেসাস পর্বতমালার উত্তরে প্রবেশ করতে অক্ষম হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রপুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-এর ১২ সন্তানের ১২ গোত্রকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। হযরত ইসহাক (আ.)-এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। সে কারণেই এদেরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। এই বনী ইসরাঈল বংশীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবী হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর উপর

অবতীর্ণ কিতাব তৌরাতের অনুসারীদেরকে ইয়াহুদী বলে। পবিত্র কোরআনে বনী ইসরাঈল এবং ইয়াহুদ নামে এদের পরিচয় করানো হয়েছে। এই ইয়াহুদী ধর্ম মূলতঃ গোত্রীয় ধর্ম। খাযারগণ যেহেতু এই গোত্রের বাইরের তাই এদেরকে অ-ইয়াহুদী ইয়াহুদী বলা হয়। বনী ইসরাঈলের ১২ গোত্রের বাইরে বলে তাদেরকে The Thirteenth Tribe নামেও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। ইউরোপে এদের আদি বাস বলে এদেরকে ইউরো-ইয়াহুদী বলেও কোথাও কোথায় অভিহিত করা হয়। সুতরাং খাযার জাতি থেকে ধর্মান্তরিত এই ইউরো-ইয়াহুদীগণই "আশকেনাযিম ইয়াহুদী" "ইউরো-ইয়াহুদী" "খাযার বংশীয় ইয়াহুদী" "অ-ইয়াহুদী ইয়াহুদী" "১৩তম গোত্র" ইত্যাকার বিচিত্র নামে পরিচিত। আমেরিকান Corporate-দের অধিকাংশই এই আশ্‌কেনাযিম ইয়াহুদী। অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও ছল-চাতুরিতে এরা বহুকাল ধরে সকলের শীর্ষে অবস্থান করছে।

ইউরোপের জাগরণকালে খৃষ্টান-ধর্মবাদী ইউরোপকে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন সমাজ রাষ্ট্রের প্রবক্তা বানাতে; প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জাপান-জার্মান জোটের বিরুদ্ধে বৃটেন-ফ্রান্স জোট গঠনে; ১৯৪৪ সনে ব্রেটন উড্‌স্‌-এ বাণিজ্যিক লেন-দেন-এর একমুখী নীতি এবং আন্তর্জাতিক শোষণের হাতিয়ার IMF, WB গঠনে; বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইসরাঈল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে বৃটিশদের পক্ষে আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগ দেয়াতে বাধ্য করানোতে; ১৯৪৮ সনে কার্যত ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে; ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময়ে আরবদের প্রতি দুনিয়াজোড়া ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে ইউ. এস. লিবার্টি নামক বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস করণ ও পরবর্তীতে তার সমগ্র দায়ভার আরবদের কাঁধে চাপাতে এদের সক্রিয় ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান আমেরিকান সম্পদের সিংহভাগ এদের দখলে। সম্পূর্ণ **প্রচার মিডিয়া** এবং **অস্ত্র ব্যবসা** এদের দখলে। Printing Media, Electronic Media–সহ সকল প্রচার মাধ্যমে এদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। এদের সিদ্ধান্তেই নির্দ্ধারিত হয় কোন খবরকে বিশ্বের কোন এলাকায় কিভাবে উপস্থাপন করা হবে, কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হবে, কিংবা কিভাবে লুকাতে হবে বা ধামাচাপা দিতে হবে। তাই একই CNN News আমেরিকানদের জন্য একভাবে পরিবেশিত হয়, অপরদিকে এশিয়ানদের জন্য হয় অন্যভাবে। Time পত্রিকার European Version কিংবা Asian Version কখনই American Version-এর অনুরূপ

নয়। সত্যকে Twist করে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে, অর্ধ গোপন করে অর্ধ প্রকাশ করে এরা নিজদেরকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেই সকল ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। ধর্মবাদী আমেরিকান খৃষ্টানদের ধর্মহীন করার যে চক্রান্ত করে তার সম্পর্কে "ফ্রি আমেরিকান" নামক ম্যাগাজিন বলে-

"প্রথম থেকেই তারা জানত যে, আমাদেরকে তাদের দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ করতে তাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমেরিকাকে খৃষ্টবাদ মুক্ত করা। প্রথম থেকেই আমাদের জাতির নৈতিক ভিত্তিতে খৃষ্টবাদ এবং বাইবেলকে উচ্ছেদ করতে তারা সক্ষম হয়। ফেডারেল কোর্টকে ব্যবহার করে (যা তারা আগ থেকেই তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্ররূপে বানিয়ে নিয়েছে) আমাদের স্কুলের শিক্ষাক্রম থেকে খৃষ্টবাদ এবং বাইবেল অধ্যয়নকে বিতাড়িত করেছে। এমনকি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানেই তারা তাই করেছে। এটাই তাদের পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল যে তারা আমাদের পরিবারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গবে এবং অনৈতিকতার সয়লাব বহাবে। এ ক্ষেত্রে তারা অত্যধিক সফলতা লাভ করে। কিভাবে তারা এটি করলো? তারাই হলিউড্‌কে প্রায় পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। টেলিভিশনসহ সকল প্রকাশনা সংস্থা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় তারা তাদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের জাতি সত্তার খৃষ্টীয় নৈতিকতা ধ্বংসের লক্ষ্যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রমাগত অশ্লীল ছবি, যৌন সুড়সুড়িপূর্ণ টেলিভিশন শো এবং পর্ণোগ্রাফিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। American Civil Liberties Union সংক্ষেপে ACLU-কে তারা আমাদের সমাজের সকল ক্ষেত্র থেকে স্রষ্টা ও খৃষ্টত্ববাদের সকল স্পর্শমুক্ত করতে ব্যবহার করে।"

ঐ একই "ফ্রি আমেরিকান" ম্যাগাজিনে ডক্টর আলবার্ট ডি. পাস্তোর-এর STRANGER THAN FICTION নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় পার্ল হারবার আক্রমণে জাপানি পরিকল্পনার কথা তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন জানত, কিন্তু ইয়াহুদীদের স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে যুক্তিযুক্ত করতে তারা ঘটনাটা ঘটতে দেয় এবং তাতে কোন বাধা দেবার চেষ্টা থেকে তারা বিরত থাকে। ডক্টর আলবার্ট ডি. পাস্তোর-এর ভাষায় বিষয়টি নিম্নরূপ-

In the United States, the Zionist Mafia again went to work on a US president. The names of the players had changed but the game was still the same. It was Franklim

Delano Roosevelts turn to deliver the US into another European war. Patriotic Americans such as famed aviator Charles Lindbergh saw this and tried to warn the American people that Zionist media influence was intending to drive us into another world war, said-bindbergh :

"I am not attacking the Jewish people. But I am saying that the leaders of both the British and Jewish races, for reasons which are as understandable from their view point as they are inadvisable from ours for reasons which are not American, wish to involve us in the war."

Because of strong public Anti war sentiment, FDR and his Zionist allies had a hard time dragging the US into the European war. Then another "incedent" came along at Parl Harbor in 1941. Japan and Germany was bound to a mutual defense agreement which meant that war with Japan would automatically mean war with Germany. FDR embergoed Japan's oil supply in the hopes of forciny Japan to attack Parl Herbor. Overwhealming evidence from Government documents clearly shows that FDR had advance knowledge of the Japanese attack and allowed it to happen so that he could drag the US into World war II.[১]

এভাবে বিগত এক শতাব্দী ধরে দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ করে ইসরাঈল রাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ-আমেরিকার সকল বড় বড় পরিবর্তনে এই আশ্কেনাযিম যায়নবাদী ইয়াহুদীদের কাল হাত থাকার প্রমাণপঞ্জি এখন যত্রতত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

এরা নিজেরা ইয়াহুদী ধর্ম বিশ্বাসে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সবচাইতে প্রিয় বান্দাহ্ মনে করে। অন্যদেরকে Sub-Human মনে করে। এরা অন্তরের অন্তঃস্থলে তাদের ছাড়া বাকী বিশ্বের লোকদের প্রতি যে আচরণই হোক, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদেরকে কোন জওয়াবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না বলে বিশ্বাস করে। তাদের নিজেদের ছাড়া বাকী বিশ্বের সব মানুষকে তাদের

১. STRANGER THAN FICTION- An independent Investigation of 9-11 and the war on terrorism- Dr. Albert D. Pastor. PhD.

প্রয়োজনে তারা যেভাবে চাইবে ঠিক সেভাবে ব্যবহার করবে। **বাঘ যেমন বনের অন্য প্রাণীকে খায় এবং এতে বাঘের মনে যেমন কোন প্রকার অনৈতিকতার বোধ উদিত হয় না তেমনি ইয়াহুদীগণও মানবজাতির অপর কোন গোষ্ঠির প্রতি যথেচ্ছ আচরণ করেও কোন অনুতাপ বোধ করে না।**

মুসলিম বিশ্বের প্রতি যায়নবাদী প্রচারের কয়েকটি সাধারণ সূত্র ঃ

Institute for the Strategic and Development Studies এর একজন সফল গবেষক হিসাবে জনাব মূসা সেলিম The Muslims and the New World Order নামে একটি সাড়া জাগানো বই লেখেন। বইটি ISDS World Order এর লন্ডন অফিস থেকে প্রকাশিত হয়। এই বই-এর Catalogue record ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে পাওয়া সম্ভব।

উক্ত বইতে জনাব মূসা সেলিম New World Order এর পেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের করণীয় সম্পর্কে বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি Techniques and tactics used in propaganda against Islam শিরোনামে যে লেখাটি লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নিম্নে দেয়া হলো-

ইসলাম ও মুসলিমদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস করার জন্য যায়নবাদীরা USA UK এবং ইসরাঈলে ১৩০ টির বেশি Think Tank প্রতিষ্ঠিত করেছে। এগুলো একযোগে কাজ করে। সারা দুনিয়াতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে এবং তার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামের ধ্বংস কামনার্থে তিনটি বিশেষ টেক্নিক অবলম্বন করে। টেকনিক তিনটি হলো ঃ

ক. ZORO Techniques
খ. BATNA principle
গ. TURTLE Techniques

জুরু টেকটিকস ঃ

এ পদ্ধতি যে দেশ বা যে জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় সে দেশকে “কারিগরি” ও “বৈজ্ঞানিক গবেষণার” দিক থেকে উন্নত বলে প্রচার দেয়া হয়। ঐ দেশ যদি একনায়ক শাসক দ্বারা শাসিত হয় তা হলে এই টেকনিক খুব উপযোগী হয়। পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশন ভাষ্যে সেই দেশের উন্নতি, সামরিক শক্তি,

সম্ভাব্য আণবিক বোমা, রাসায়নিক বোমা ইত্যাদি সম্পর্কে মিথ্যা গল্প ফাঁদা হয়। পাশ্চাত্যের দেশসমূহ এবং ঐ বিশেষ দেশটির আশপাশের সকল দেশের প্রতি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়। ঐ বিশেষ দেশটির গবেট শাসক এবং তার ততোধিক গবেট পরামর্শকরা নিজেদের কৃতিত্ব অনুধাবন করে উৎসাহের সাথে পাশ্চাত্যের ঐ সব মিথ্যা গল্পকে নিজেদের দেশেও প্রচার করে। এই ফাঁকে জাতীয় সম্পদের ব্যাপক লুটপাটের সুযোগ তারা গ্রহণ করে। এই সম্পদ সাধারণতঃ সুইস ব্যাঙ্কের কোন কোন বিশেষ এ্যাকাউন্টে চলে যায়। পাশ্চাত্যের সম্প্রচার কেন্দ্রগুলোর অবিরত প্রচারণা এবং মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্যগুলো এক সময় ঐ দেশের বোকা শাসক নিজে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং অহমিকতা ও বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়।

ঠিক এই স্তরে ঐ বিশেষ শাসককে পাশ্চাত্য এমন কিছু প্রস্তাব দেয় যেগুলো প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তার থাকে না, কিংবা এমন বিষয় যা ঐ শাসক চাচ্ছে কিন্তু তার সম্পর্কে এমন ধারণা দেয়া হয় যে, পাশ্চাত্যের সাহায্য ছাড়া ঐ শাসক তা অর্জন করতে পারে না। একনায়ক শাসকদের দিয়ে এসব করানো পাশ্চাত্যের জন্য খুবই সহজ। যখনই ঐ বিশেষ শাসক পাশ্চাত্যের নির্ধারিত ফাঁদে পা দেয় তখনই এর শেষ দৃশ্যের অবতারণা হয়। আর তখনই শুরু করে ঐ বোকা শাসকের দুর্নাম প্রচার এবং ব্যর্থতার করুণ কাহিনী বর্ণনা।

পাশ্চাত্য আগ থেকেই তাকে খারাপ জানত। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে তাকে প্রথমে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার দ্বারা কতগুলো ভুল কাজ করাতে বাধ্য করে, পরে একযোগে তার বিরুদ্ধে দলিল প্রমাণ পেশ করতে শুরু করে তাকে ঐ দেশের জনগণের চোখেত বটেই সারা বিশ্বের নিকট ঘৃণিত করে তোলে।

এই টেকনিকটাই তারা অবলম্বন করেছে সাদ্দাম-এর মত নেতাদের জন্য। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমই এক সময় সাদ্দামকে মধ্যপ্রাচ্যের হিরো বানিয়েছে, তারাই তাকে দিয়ে ইরান আক্রমণ করিয়েছে, তাকে গোপনে আশ্বাস দিয়েছে যে কুয়েত আক্রমণ করলে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য নীরব থাকবে। কিন্তু তার পরবর্তী ফলাফল সকলেরই জানা। উপসাগরীয় যুদ্ধে পাশ্চাত্য এবং আমেরিকা কামিয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, সাদ্দাম নিক্ষিপ্ত হয়েছে আস্তাকুঁড়ে, ইরান-ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ দিয়েছে জান-মালের মাশুল। এই বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থের একটা বিরাট অংশ ইসরাঈলের খেদমতে গিয়েছে তাদের নিপুণ সেবা দক্ষতার জন্য।

বাতনা নীতি ঃ

এটি অপেক্ষাকৃত সহজ টেকনিক। যদি একাধিক রাষ্ট্রের ঐক্য পাশ্চাত্যের প্রতি বিশেষ করে ইসরাঈলের প্রতি হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তারা এই নীতি ব্যবহার করে। এর জন্য তাদের নিজেকে একটি বুলেটও ব্যবহার করতে হয় না। তারা শুধু ঐ একাধিক দেশের মধ্যে কোনটি অধিকতর শক্তিশালী এবং কোন কোনটি অধিকতর দুর্বল এটুকু ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করে। তারপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রশাসককে এই ধারণা দেয়া হয় যে, সে বর্তমানে তার প্রতিবেশিদের মাঝে যে সম্মান ও সুযোগ পাচ্ছে তার তারচাইতেও অনেক বেশি পাওয়ার কথা। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের মাঝে একটা শক্তিশালী প্রতিবেশির পক্ষ থেকে অনিরাপত্তাজনিত কিছু ঘটার আশঙ্কা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর খেলা খুব সহজ। তারপর অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের একজনকে সম্ভাব্য নেতৃত্বের আসনে প্রলোভিত করে ঐ শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে। উপসাগরীয় দেশগুলোতে ইরানের ব্যাপারে এমন একটা নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি করে সাদ্দামকে ভুয়া হিরো বানিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া এবং ইরানকেও তার শক্তিমত্তার ব্যাপারে অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মিডিয়া জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত ইরাক-ইরান যুদ্ধে দীর্ঘ নয় বছর মাতিয়ে রাখার একক কৃতিত্ব ঐ কথিত থিঙ্কট্যাঙ্কসমূহের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যায়নবাদী প্রচার মিডিয়ার। ফলাফল ঐ একই। ইরাক-ইরানের জনগণ এত রক্ত দিল যে, শেষ পর্যন্ত জমীন সেই রক্ত শোষণের ক্ষমতা হারালো। পাশ্চাত্যের ঘুনে ধরা অস্ত্র নগদ চড়া দামে বিক্রি হলো উভয় পক্ষে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লাভ হলো ইসরাঈল ও পাশ্চাত্যের।

টার্টল নীতি ঃ

এটি খুব উন্নত মানের এবং জটিল নীতি। ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় এবং ফিলিস্তিনিদের বঞ্চিত করার কলা-কৌশলে ইসরাঈল এ নীতি উদ্ভাবন করেছে। কথিত থিঙ্কট্যাঙ্কগুলো এ ব্যাপারে একযোগে একই লক্ষ্যে কাজ করেছে। এটি এমনই বিষাক্ত নীতি যে, পৃথিবীর ধুরন্ধরতমরাও এতে হার মানতে বাধ্য।

প্রথমতঃ প্রচার মাধ্যমে এমন সব বাগাড়ম্বরপূর্ণ তথ্য দেয়া হয় যাকে দুনিয়ার সাধা-রণ মানুষ মনে করে যে ইসরাঈল এবং তাদের পাশ্চাত্য বন্ধুবর্গ আলোচনার

টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করে তা কার্যে পরিণত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে। এমন একটা প্রচারণা যখন তারা করে তখন নিজেরা নিজেদের মধ্যে গোপনে সুস্থ মস্তিষ্কে ঐকমত্য হয় যে, সম্ভাব্য আলোচনার টেবিলে কোন বিষয়েই একমত হবে না। এর মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ এবং প্রতিপক্ষের চিহ্নিত বুদ্ধিজীবি এবং নেতৃগোষ্ঠের লোকদের সন্ত্রাসী চিহ্নিত করে নানা অজুহাতে গোপন হত্যা কিংবা প্রকাশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হবে। প্রচার মাধ্যমে নিজদের নিরপেক্ষতার ভাব তুলে ধরা, সকল বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার বার বার মিথ্যা অঙ্গীকার করা, জাতিসংঘের মেন্ডেটকে ভেটো ক্ষমতার মাধ্যমে নস্যাৎ করা, সকল প্রকার ধূর্ত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা এই নীতির অংশ।

এত গেল কোন রাষ্ট্র বা দেশকে ধ্বংস করার নীতি কথা। তা ছাড়া আরও অনেক টেকনিক তারা অবলম্বন করে যার মধ্যে Devide and rule তাদের শতাব্দীর পুরনো নীতি। বর্তমানে Radio-Tv সম্প্রচার ছাড়াও Internet এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের যুব-মানসকে ২৪ ঘন্টা অশ্লীলতায় ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা তারা করেছে। নানা রূপ ভোগ্য পণ্য উৎপাদন এবং তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে মিথ্যা ভুয়া চটকদার বুলি সংযোজনের সাথে সাথে নগ্ন অর্ধ উলঙ্গ নারী দেহের বিভিন্ন কসরত দেখিয়ে চরম ভোগবাদের প্রতি উৎসাহিত করে দান, সৎকর্ম, উন্নয়ন, জ্ঞান, গবেষণা ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

এই যায়নবাদী আশ্কেনাযিম ইয়াহুদীরাই বর্তমান এক মেরু বিশ্বের সফল রূপকার। **এরা এখন ইসলাম ও খাঁটি ঈমানদানদেরকেই তাদের একমাত্র শত্রু বলে চিহ্নিত করছে।** মুসলিম শাসকদের অধিকাংশকেই তারা বশ করেছে। আরব দেশসমূহের সরকারসমূহকে তাদের কেনা গোলামে পরিণত করেছে। মুসলিম জনগণের একাংশ যারা তাদের ষড়যন্ত্রকে বুঝে, চিহ্নিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে, যুদ্ধ করে, শহীদ হয় তাদেরকে তারা উগ্রপন্থী **মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক** এবং **সন্ত্রাসীরূপে চিহ্নিত করে।**

অতি সম্প্রতি তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের নীল নকশা হিসাবে বুশ-ব্লেয়ার চক্রকে ব্যবহার করে সেপ্টেম্বর/১১ কে অজুহাত করে আফগানিস্তানের উপর হামলা করিয়েছে। ইরাক ধ্বংস করেছে। এখন যৌন হয়রানি করেছে। এর পরবর্তী লক্ষ্য নীল নদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত Greater Israel রাষ্ট্র কায়েম করে সমগ্র আরব তথা মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে পৃথিবীর Ruling State-এ পরিণত হওয়া।

এদেরই মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা হচ্ছে Novus Ordo Seclorum বা নব্য বৈশ্বিক নিয়ম বা বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়নের দ্বিতীয় মূল বক্তব্যটি হল **মানবাধিকার**। জীবন ধারণের অধিকার, কথা বলার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, উপার্জনের অধিকার, আরোপিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার অধিকার, নারী–সমানাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে তারা মানবাধিকার শ্লোগানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। প্রতিটি মানুষের বিবেকেই এ সব অধিকারের আবেদন থাকায় বাকি বিশ্বের প্রায় সকলে শ্লোগানগুলো লুফে নেয়। এখানেই ঘটে বিপত্তি। **অশ্লীলতা বেহায়াপনাকে তারা চারুশিল্প নামে উপস্থাপন করে। বিবাহ বিহীন একত্রবাস, সমকামিতা, যৌন অনাচার, সমকামি বিবাহ, অজাচার, মদ, জুয়া, নেশা, বেশ্যালয় ইত্যাদি সকল বিষয়ে মানুষের স্বাধীন অধিকার রয়েছে বলে তারা মনে করে এবং মানুষের এসব অধিকারকে নিশ্চিত করতেই তারা তাদের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগায়।** জাতিসংঘ নামক বিশ্ব সংস্থার সকল কার্যক্রম তাদের পরিকল্পনার আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়। [এসব বিষয়ে অন্য নাগরিকের অসুবিধা যাতে না হয় এমন একটা বিধি-নিষেধই কেবলমাত্র এদের নিকট ধর্তব্য।] ভোগের সর্বোচ্চ স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে Consumerism-এর ষোলকলা বিকশিত রূপ প্রচার করে মানুষের মধ্যে চরম স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ সৃষ্টি করে। Information Super High Way-তে অশ্লীলতার যাবতীয় উপকরণ ছড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের যুব-মানসকে **চরম ঘৃণিত অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে,** যে সব দেশ বা জাতি তাদের এ মানবতা বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রে অংশ নিতে অনীহা প্রকাশ করে তাদের উপর অর্থনৈতিক বয়কট, অবরোধ, বাণিজ্য সংকট, যুদ্ধ ইত্যাদি চাপিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য মুসলিম বিশ্ব তাদের এই ঘৃণ্য আক্রমণের নিকৃষ্ট শিকার। একদিকে তারা Cluster বোমা ফেলে একটা জাতির সকল নগর ধ্বংস করে। আবার প্লেন থেকে খাদ্যের প্যাকেট ফেলে নির্যাতিতদের উপহাস করে। তারা জেনেভা সনদের কথা বলে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বেলায় সনদ বাস্তবায়নে বিরত থাকে। **মানবতা উদ্ধারের অঁজুহাতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চাকচিক্য শ্লোগানে তারা যখন তখন যে কোন সময় যে কোন দেশ, অঞ্চল কিংবা জাতির উপর চড়াও হয়ে সেই দেশ, অঞ্চল বা জাতিকে নিশ্চিহ্ন কিংবা লুণ্ঠন করে।** বর্তমান আফগানিস্তান ও ইরাক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটিই হল তাদের Human Rights-এর বাস্তব অবস্থা।

মুক্তবাজার অর্থনীতি

এটিও তাদের ছল-চাতুরিপূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক শ্লোগান যা বাহ্যতঃ অনুন্নত স্বল্পোন্নত বিশ্বের মানুষের নিকট তাদেরকে সহায়তা দানের কথা বলে। মূলতঃ এর মাধ্যমে **তারা অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠন করার, তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যস্ত করার এবং তাদের সামাজিক জীবন কলুষিত করার বিষ-চক্র প্রতিষ্ঠিত করে**। এ বিষয়টিকে ট্রিম বিসেল এবং রবার্ট ওয়াইজম্যান এভাবে বলেন–

"বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ যখন দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে সহযোগিতা করতে আসে, তখন দুটো জিনিস ঘটে। **এক.** বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠে; **দুই.** দেশের মানুষ ও পরিবেশের দুর্দশা বাড়তে থাকে।[১]

তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি হল–

"বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সব সময়ই অর্থের একটা অংশ থাকে ধনী দেশগুলো থেকে বিশেষভাবে নিয়োগ এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি দফতরের কর্মকর্তারা এক হিসাবে দেখিয়েছেন যে, **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংকে ১ মার্কিন ডলার অনুদানের বিনিময়ে ঐ সব ব্যাংক অর্থায়নে যে কোন প্রকল্প থেকে মার্কিন রফতানিকারকরা ২ ডলারেরও বেশি লাভ করেন।**" [২]

মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল ষড়যন্ত্রমূলক নীল নকশা রচিত হয় ১৯৪৪ সালে **ব্রেটন উড্স**-এর বৈঠকে। এখানেই জন্ম হয় IMF এবং World Bank. পরবর্তীতে এ ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় **উরুগুয়ে রাউন্ড টেবিল আলোচনা** যার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয় World Trade Organization (WTO)।

IMF (International Monetary Fund); WB (World Bank) এবং WTO

১. কার লাভ কার ক্ষতি, অরূপ রাহী, লোকজ ইনিস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৩।
২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২০।

(World Trade Organization) এ তিনটি সংস্থা বাহ্যতঃ আলাদা হলেও তিনটি সংগঠনই কর্পোরেট আমেরিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত। **কাকে কোথায় কোন শর্তে কি ঋণ দেয়া হবে, কিভাবে সেই ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে আদায় করা হবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন রুটে কিভাবে চলবে, কোথায় কিভাবে শুল্ক নির্দ্ধারিত হবে, কিভাবে এক জায়গায় বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের প্রতিশোধ অন্য জায়গা থেকে নেয়া হবে তার সকল নীল নকশা প্রণয়নে এই তিন সংস্থা এবং অদৃশ্য কর্পোরেট আমেরিকা একাত্ম**। অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত বিশ্বের সেখানে কোন হাত নেই। সম্পদের কেবল **একমুখী স্রোত সৃষ্টির** যাবতীয় কূটকৌশল তৈরীতেই ব্যস্ত GATT (General Agreement on Tariff and Trade)।[৩] এদের ক্ষুদ্র পরিচিতি এবং লুণ্ঠনের নীল নক্শার কিঞ্চিত পরিচয় তুলে ধরার জন্য লোকজ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'কার লাভ কার ক্ষতি বই' এর ২১ থেকে ২৪ পৃষ্ঠার অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে উরুগুয়ে রাউণ্ড আলোচনা শেষ হয়। এই আলোচনার ফলাফলের পক্ষে ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল বিভিন্ন দেশের সরকার সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর করেন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা সংক্ষেপে ডবিউটিও উরুগুয়ে রাউণ্ড আলোচনার ফল এবং গ্যাটের উত্তরাধিকারী সংস্থা। ডব্লিউটিও-র প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত।

গ্যাট কি?

গ্যাট General Agreement on Tariff and Trade (GATT) কথাটার বাংলা করলে দাঁড়ায় "শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতা।"। পণ্যের দুনিয়াজোড়া আদান-প্রদান, বেচা-কেনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত বিষয় এই সমঝোতার আওতাতেই গত চার দশক ধরে চলেছে।

৩. সুতরাং Free Market Economy এর Slogan কেবলমাত্র Corporate American দের স্বার্থই রক্ষা করে, দুনিয়ার বাকী অংশকে শোষণে জর্জরিত করে, পরিবেশ বিনষ্ট করে মানবতাকে চরিত্রহীন অনৈতিক স্বার্থপর ভোগবাদী কীটে পরিণত করে।

গ্যাট জাতিসংঘের অংশ নয়। **এই সমঝোতা গড়ে ওঠে ১৯৪৪ সালে, ব্রেটন উডস কনফারেন্সে। 'ব্রেটন উডস' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট শহর।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক অর্থ, মুদ্রা ও বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ এই কনফারেন্সে নেয়া হয়। এই কনফারেন্সেই যুদ্ধোত্তর **বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের** কাজে বিশ্বব্যাংক (World Bank), মুদ্রা **বাজারের স্থিতিশীলতা** রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ (International Monetary Fund (IMF) আর **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য** ঠিকঠাক রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় গ্যাট (GATT)। সেই হিসাবে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং গ্যাট– এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে **ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন হিসাবে** অনেক সময় একসঙ্গে আখ্যায়িত করা হয়। এদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা ভেবে অনেকে **এদের 'ব্রেটন উডের দানব' বলেও ডাকে**। অর্থনীতিবিদ লর্ড মেয়নার্ড কীনস ব্রেটন উডস কনফারেন্সের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পেছনে বড়ো একটা ভূমিকা রাখেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর গ্যাট আর পুরনো গ্যাট নেই। বাণিজ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমঝোতার আওতায় আগে যে এলাকা ছিল, তা বেড়ে নতুন নতুন ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা আর পুরনো শিথিল সমঝোতা নয়, একটা বিশ্ব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ধারণা করা হয়েছিল যে, **এটা সারা দুনিয়ার বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিচালনা ও শাসনের সর্দার। অর্থাৎ মর্মের দিক থেকে দুনিয়ার উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগের ওপর খবরদারির প্রতিষ্ঠান। সেই হিসাবে এক ধরনের বিশ্ব সরকার।** গত চার বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এটা তাই হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সকল সদস্য দেশই যেন **বাণিজ্যের নিয়ম যথাযথ পালন করে সেটা দেখাশোনা করা এবং কেউ 'নিয়ম' অমান্য করলে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা এর হাতে**। তারা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এতদিন আমরা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-কে বেশি চিনতাম। এখন এদের পাশাপাশি উচ্চারিত হচ্ছে ডব্লিউটিও।

গ্যাটকে একটা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থা (Multilateral Trade Organization) হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব প্রথমে এসেছিল ইউরোপীয় জোটের দেশগুলোর কাছ থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রসঙ্গে তাদের পাল্টা প্রস্তাব প্রদান করে। তারা চেয়েছিল GATT-2 নামক একটি সংস্থা গড়ে উঠুক। দুটো প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ডব্লিউটিও-র সদস্য

গ্যাটের যারা সদস্য তারা আপনাআপনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়েছে। সেই হিসাবে গ্যাট অন্তর্ভুক্ত ১৫২টি দেশের মধ্যে প্রথম দিনেই সদস্য হয়েছে ৭৬টি দেশ। বাকি ৫০টি দেশ পর্যায়ক্রমে সদস্যপদ নিয়েছে। কারণ গ্যাট থেকে বিধিবদ্ধভাবে সরে এসে ডব্লিউটিও-র সদস্য হতে হয়। ফলে এই প্রক্রিয়ার জন্যে কিছু সময় ব্যয় হয়। ১৯৯৪ সালের শেষে এসে এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ১২৮টি। **কেউ যদি সদস্য না হতে চায় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চুক্তি মোতাবেক যে সব সুযোগ-সুবিধা পাবার কথা, সেটা দেয়া হবে না।** ফলে সদস্য না হলে বিশ্ব বাণিজ্যের মধ্যে অংশগ্রহণ মুশকিল হয়ে পড়ে।

ডব্লিউটিও-র কাজ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে তা হচ্ছে ঃ

- বহুপাক্ষিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্যে চুক্তি করা
- বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করা
- দেশে দেশে বাণিজ্য সংঘাত মেটানোর দায়িত্ব নেয়া
- জাতীয় পর্যায়ে বাণিজ্য নীতির খবরদারি করা
- অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে কাজ করা।

ডব্লিউটিও-র কাঠামো

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন বা Ministerial Conference। এই সম্মেলন প্রতি দুই বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয় এবং সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। তারা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির অধীনে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পর থেকে কয়েকটি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি ছিল সিঙ্গাপুরে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, দ্বিতীয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে ১৯৯৮ সালের মে মাসে এবং তৃতীয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল শহরে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রাত্যহিক কাজের বিভাগ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ বা General Council রয়েছে। এরই পাশাপাশি আর দুটি বিভাগ

হচ্ছে, মামলা মীমাংসার বিভাগ বা Dispute Settlement Body এবং বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা বিভাগ বা Trade Policy Review Body।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে বাণিজ্য সংঘাত মেটানোর দায়িত্ব পালন করা। এটা যে পদ্ধতিতে করা হবে সেটাও উরুগুয়ে রাউণ্ডের আলোচনার বিষয় ছিল। এই পদ্ধতির নাম হলো Integrated Dispute Settlement System (IDSS) বা **মামলা মীমাংসার সমন্বিত বিধি। এই বিধির মধ্যেই এক খাতের অপরাধের জন্য অন্য খাতে শাস্তি দেবার বা প্রতিশোধ নেবার বিধান রাখা হয়েছে, যাকে বলা হয়** Cross Retaliation।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিওটিও-র হাতে আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে Trade Policy Review Mechanism (TPRM) বা বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনার মানদণ্ড। পর্যালোচনা করবার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যুক্ত থাকবে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সংযুক্তি নিয়ে প্রবল আপত্তি উঠেছে। কিন্তু সেটা শোনা হয় নি। শুধু এতটুকু কাগজে-কলমে মানা হয়েছে যে উন্নয়নের টাকা বা ঋণ দিতে গিয়ে এই দুটি সংস্থা যে শর্তগুলো আরোপ করে সেই ধরনের কোন শর্ত আরোপ থেকে বিরত থাকতে হবে বা কোন নতুন শর্ত দেয়া হবে না। এটা কাগজে কলমের ফাঁকা ঘোষণার অধিক কিছু নয়। বাস্তবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন নীতি গ্রহণযোগ্য না হলে উন্নয়নের অর্থ বা ঋণ পাওয়ার ব্যাপারটিও শেষ পর্যন্ত শর্তাধীন হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিগুলোর মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো TRIPS, TRIMS এবং ATC/MFA এবং GATS। ট্রিপস হল Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights বা বাণিজ্য সম্পর্কিত বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক চুক্তি। এর মাধ্যমে **যে কোন আবিষ্কার, পদ্ধতি বা উৎপাদন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য, জ্ঞান বা প্রযুক্তি পেটেন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ** করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে উত্তরের ধনী দেশগুলো গরীব দেশগুলোতে প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও মুনাফার একচেটিয়া শাসন আরো তীব্র ও স্থায়ী করতে চাইছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দেশের কৃষি ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব হবে অপরিমেয়। **সার-বিষ-কীটনাশক এবং বীজ উৎপাদনকারী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর জীবন ও পরিবেশ বিধ্বংসী প্রযুক্তি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার যে ধারা চলছে, তা আরও ব্যাপক হবে**। ফলে কৃষি ও কৃষক ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যাবে। প্রতিবেশ ও পরিবেশ হবে প্রাণ ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এক পর্যায়ে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। খাদ্যসহ সকল প্রয়োজনে বহুজাতিক কোম্পানী তথা ধনী দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা চিরস্থায়ী হবে। এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক–রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

ট্রিমস (Trade Related Investment Measures) হলো **বাণিজ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি**। এর মাধ্যমে ধনীদেশগুলো এবং তাদের মালিকানাধীন **বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বাণিজ্য ও মুনাফা, নিরঙ্কুশ ও একচেটিয়া করতে চাইছে। যেমন, যে কোন কোম্পানী যে কোন দেশে যে কোন সময়ে বিনিয়োগ করতে বা বিনিয়োগ তুলে নিতে পারবে। সকল অবস্থায় তাদেরকে সাধারণ নাগরিকের সমান সুবিধা ও ব্যবস্থা দিতে বাধ্য থাকবে রাষ্ট্রগুলো। মুনাফা বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত থাকবে কোম্পানীর**। এই চুক্তি কার্যত রাষ্ট্রের বা জনগণের সার্বভৌমত্ব বহুজাতিকের হাতে তুলে দেয়ার শামিল।

GATS হল General Agreement on Trade in Services বা সেবা খাতে বাণিজ্য বিষয়ক চুক্তি। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী বা স্যাপ–এর মাধ্যমে দেশে দেশে বেসরকারীকরণের ডামাডোল চলছে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে। তার আওতায় সেবা খাত যথা– যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিং, শিক্ষা ইত্যাদিকেও বাণিজ্যের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। **অর্থাৎ সেবা এখন 'পণ্য'**। ডব্লিওটিও-তে **এই ব্যবস্থার বৈশ্বিকীকরণ ঘটল**। এখন অন্য যে কোন খাতের মত সেবা খাতেও বিনিয়োগ ও বাণিজ্য হবে। যে কোন বহুজাতিক, যে কোন স্থানে ও সময়ে সুবিধামত বিনিয়োগ ও বাণিজ্য করতে পারবে। এসব চলবে সংস্থার অন্যান্য চুক্তি (TRIPS, TRIMS)-র সব সুবিধা নিয়েই। **ফলে গরীব জনগণ এতদিন রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে প্রাথমিক ও মৌলিক সেবাগুলো ন্যূনতম পরিমাণে হলেও পেত, চুক্তি কার্যকর হলে সেই সুবিধা থেকে জনগণ বঞ্চিত হবে। বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হবে না**।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেক্সটাইল সংক্রান্ত চুক্তি (Agreement on Textile and Clothing) MFA বা **মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ**। কারণ

এই চুক্তি অনুসারে তথাকথিত অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুক্তবাজারের নামে ২০০৫ সালের পর গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানীর ক্ষেত্রে সব রকম কোটা পদ্ধতি তুলে দেয়া হবে। যেহেতু বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের ভিত্তিমূল শিল্প (Backward Linkage) গড়ে তোলা হয়নি (এটাও হয়নি বিশ্বব্যাংকের পরামর্শেই, যেমন তারা বরাবরই বিরোধিতা করে এসেছে একটা সমন্বিত ও সুষম ভূমি ও কৃষি সংস্কারের, যা শিল্প বিকাশের ভিত্তি হতে পারে)। ফলে এ দেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। সবচে' বড় কথা, ধনী দেশগুলো নিজেদের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময়, সুবিধা ও পদক্ষেপ নিয়ে দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে, [এখন গরীব দেশগুলোকে খালি পায়েই কাচ-পাথরের ওপর দৌড়ানোর জন্য Ready-Set-Go-বলার 'দায়িত্ব' নিয়েছে।] চলমান বিশ্বায়ন এই ক্ষমতা-আধিপত্য বজায় রাখার প্রক্রিয়া।

তাগুত ঃ পবিত্র কোরআনে

এক কথায় যারা কোরআন ও সুন্নাহ্র আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইনে দেশ চালায় তারাই তাগুত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক طَاغُوْتَ শব্দটিকে মোট আট জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ২টি আয়াতের কথা ইতোপূর্বে ভূমিকাতেই আলোচনা করেছি। বাকী আয়াতগুলো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. সূরা আল-যুমার-এর ১৭ নং আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا

وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى

যারা তাগুতের দাসত্ব করা থেকে দূরে থাকে
এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়
তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

সুতরাং বোঝা গেল, "তাগুত" এমন একটি শক্তি যার প্রতি কিছু লোক আনুগত্য প্রকাশ করে, যার দাসত্ব করে, যার পূজা-অর্চনা করে। আর তাগুতের এই দাসত্ব থেকে যারা দূরে থাকবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র মোকাবেলায় কোন শক্তির দাসত্ব করা বা পূজা করার অপর নাম শরীয়তের পরিভাষায় **"গায়রুল্লাহর ইবাদত"** যা সম্পূর্ণ হারাম। **যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের মোকাবেলায় অন্য কারো আনুগত্য গ্রহণ করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে।** [১]

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج

---

১. মা'রিফুল কোরআনের [মুফতি শফি (র.) বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর, বাদশাহ্ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৪৪ পৃষ্ঠা।

وَمَا أُمِرُوا الاَّ لِيَعْبُدُوا اِلٰهًاوَّاحِداً

لَاۤاِلٰهَ اِلاَّهُوَ ط

سُبْحٰنَه عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তারা আল্লাহ্ ব্যতীত
তাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার বৈরাগীগণকে তাদের আরবাব (প্রতিপালক)
রূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও।
কিন্তু তারা এক ইলাহ্র ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট ছিল।
তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই
তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কোরআনে মাওলানা মওদূদী (র.) বলেন, "হাদীসে বলা হয়েছে,আদী ইবনে হাতিম (রা.)- যিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন – যখন নবী করিম (স.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে দ্বীন ইসলাম কবুল করলেন, তখন তিনি নবী করিম (স.)-কে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই ছিলো যে, কোরআনের এ আয়াতে আমরা আমাদের আলেম ও দরবেশদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিলাম বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে এর তাৎপর্য কি ? জবাবে রাসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি সত্য নয় যে, এই **পন্ডিত-পুরোহিত** লোকেরা যে জিনিসকেই **হারাম** বলতো, তোমরাও তাকে **হারাম** মনে করতে? আর যা কিছু তারা **হালাল** ঘোষণা করতো, তাকেই তোমরা **হালাল** মেনে নিতে ? হযরত আদী নিবেদন করলেন, হ্যাঁ এ রূপ অবশ্যই আমরা করতাম। ------ তারপর রাসূল করিম (স.) বললেন, "তা করলেই তো তাদের **"রব"** (প্রতিপালক) বানিয়ে দেয়া হল। রব বানানো বলতে আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে। এরপর তাফসীরকারক বলেন, **"এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র কিতাবের দলীল-প্রমাণ ব্যতীত যারাই মানব জীবনের জন্য বৈধ-অবৈধ, জায়েজ-নাজায়েজ ইত্যাদির সীমা নির্ধারণ করে, আসলে তারা নিজেদের ধারণা মতে নিজেরাই "রব"-এর মর্যাদা দখল করে বসে। আর যারাই তাদেরকে এ রূপ আইন-বিধান রচনার অধিকার দেয় বা অধিকার আছে বলে মনে করে তারাই তাদেরকে রব বানায়।"** [৩]

২. সূরা তওবা, আয়াত নং ৩১।
৩. তাফহীমুল কোরআন, ২য় জিলদ, আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

এই বিশেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় মা'রিফুল কোরআনের গ্রন্থকার **মুফতি শফি (র.)** বলেন, ইয়াহুদী-খৃষ্টানগণ তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও মা'বুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিস্কার। তবে আলেম ও যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হলো তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মা'বুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দাহ্র প্রতি আল্লাহ্র রয়েছে, তারা সে হককে যাজক শ্রেণীর জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যতই বরখেলাপ হোক না কেন। বলা বাহুল্য, **পুরোহিতগণের কিতাব ও সুন্নাহ্র মতবিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদের মা'বুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর**। আর এটি হলো **প্রকাশ্য কুফরি**।[৪]

সুতরাং কোন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তার প্রণীত আইনকে নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় বলে নির্ধারণ করাকেই সেই শক্তির দাসত্ব বা ইবাদত বলে।

ইসলাম اِسْلَامْ : سَلِمَ শব্দের بَابُ اِفْعَال এর مَصْدَر হওয়ায় এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল নিজের নফসকে আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেয়া। সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র কাছে সমর্পিত ব্যক্তি তাই গায়রুল্লাহ্র তথা طَاغُوْت-এর ইবাদত করতে পারে না। কারণ তা হবে নির্ঘাত শিরক। সুতরাং এই আয়াত থেকে বোঝা যায় طَاغُوْت হল এমন একটি غَيْرُ اللهِ যার عِبَادَت করা হয়, অর্থাৎ যার দাসত্ব করা হয় এবং যা হারাম।

২. সূরা আন্ নিসা-এর ৫১ নং আয়াত ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ

يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৪. মা'রিফুল কোরআন [মুফতি শফি (র.)]. বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, বাদশাহ্ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১২৪৪ পৃষ্ঠা।

هٰؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا
اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط
وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا

তুমি কি তাদের দেখনি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে,
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে (মান্য করে) "প্রতিমা" ও "তাগুতকে"
এবং কাফিরদেরকে বলে যে, তারা মু'মিনদের তুলনায় অধিকতর
সরল-সঠিক পথে রয়েছে। এরা
হল সে সব লোক যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং।
বস্তুত আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেছেন
তুমি কখনও তার সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

এখানে সরাসরি রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। 'তাদের' বলতে এখানে মদীনার **ইয়াহুদীদের** বলা হচ্ছে। 'কিতাবের কিয়দংশ' বলতে ইয়াহুদীদের হাতে রক্ষিত আল্লাহ্র কিতাবের **অবিকৃত অংশবিশেষকেই** বোঝানো হচ্ছে। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ইয়াহুদীরা আল্লাহ্র কিতাবধারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভুল আচার-আচরণে ও বিশ্বাসে প্রতিমা ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, **যেমন বর্তমানকালে আমরাও আল্লাহর কিতাব অবিকৃত অবস্থায় ধারণ করা সত্ত্বেও আমাদের ভুল আচার-আচরণের মাধ্যমে তাগুতের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে চলছি।**

এ জন্য আল্লাহ্ পাক তাদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং طَاغُوْت হল সেই শক্তি যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয় এবং যাকে মান্য করা হয়।

৩. সূরা নিসা ৬০ নং আয়াত ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا
بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ
وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ

আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবী করে যে,
যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে
এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতিও বিশ্বাস করে।
তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়
অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে তারা তাগুতকে অস্বীকার করে।

এখানে দেখা যায়, মুখে ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও একদল লোক তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা দাবী করে অথচ আল্লাহ্র আইনে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে সংবিধানসম্মত যে আইনে আমরা আমাদের বিচার-ফয়সালা চাই তা আল্লাহ্র আইন না হওয়ায় আমরাও এই আয়াতের বর্ণনার আওতায় পড়ি। কারণ আমরাও অনেকেই মনে করি যে, আমরা ঈমানদার, তা সত্ত্বেও আমরা তাগুতের কাছে তাদের প্রচলিত বিধানানুযায়ী বিচার প্রার্থনা করি অহরহ। **এমন কি আমরা তা করতে বাধ্য**। নতুবা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। **তাগুত হল সেই শক্তি যে বা যারা আল্লাহ্র বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য বিধান বানায়, অতঃপর অন্যকে তা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে কিংবা বাধ্য করে।**

৪. সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াত ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْۤا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ

যারা ঈমানদার তারা প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে।
পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পক্ষে।
সুতরাং তোমরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে থাক
শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে।

এখানে দেখা যায় যে যারা তাগুত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনা করে তারা **কাফির**, অপরদিকে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা **আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব** প্রতিষ্ঠার জন্য

প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে এবং শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করার জন্য মু'মিনগণ আদিষ্ট। যারা তাগুত প্রতিষ্ঠায় শ্রম ব্যয় করেছে তারা এই আয়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ কুফরিতে লিপ্ত। **এমন কি যে সব ইসলামি দল ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে দেখতে এবং বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও এ আয়াতের দৃষ্টিতে কুফরিতে লিপ্ত রয়েছেন !** বাকী যে দু'টি আয়াতে তাগুত সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা হয়েছে তার আলোচনায় আমরা পরে আসব।

আলোচিত চারটি আয়াতে طَاغُوْت-এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

ক. তাগুত হল সেই غَيْرُ الله **যার ইবাদত করা হয়ে থাকে,** যাকে মান্য করা হয়, এবং যার একনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়, অথচ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ। এ জন্য সূরা যুমার-এর ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

খ. তাগুত হল এমন غَيْرُ الله **যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।** সূরা নিসার ৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

গ. তাগুত হল এমন غَيْرُ الله **যার নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়।** সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ঘ. তাগুত হল এমন غَيْرُ الله **যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে।** সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে তাগুত হল সেই غَيْرُ الله শক্তি যার **ইবাদত করা হয়, যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় এবং যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, আর যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা হয়। একমাত্র কাফিররাই তাগুতের ইবাদত করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কাছে বিচার-ফয়সালা চায় এবং তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে। আর মু'মিনদেরকে তাগুতের ইবাদত করতে, তাগুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে, তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালা চাইতে ও তাগুতের প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।**

তাগুতের ব্যাখ্যায় আরো কতিপয় দলিল

হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, 'জিব্‌ত' অর্থ 'যাদু' এবং 'তাগুত' অর্থ 'শয়তান'। হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয় সে সবই তাগুতরূপে অভিহিত। ইমাম কুরতুবী বলেন, মালিক ইবনে আনাস (রা.)-এর বক্তব্যটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট আসলে, ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্‌কে তারা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে। কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। [৫]

আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মুফতি শফি (র.) বলেন মহানবী (স.) রসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী (স.) শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রাসূল,

৫ সূরা আন নীসা, আয়াত নং ৬৪ এবং ৬৫।

রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটে। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, **কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রসূলে মকবুল (স.)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।**

কোরআনের তফসীরকারগণ বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (স.)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হলো তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর শরীয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ

প্রথম ঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রসূল করীম (স.)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারুকে আযম (রা.) **সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (স.)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হয়নি** এবং পুনরায় বিষয়টি ফারুকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসবর্গ রসূলে করীম (স.)-এর আদালতে হযরত ওমর ফারুকের (রা.) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুযুরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ عُمَرُ يَجْتَرِئُ عَلَى الْقَتْلِ رَجُلَ مُؤْمِنِ (অর্থাৎ আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে)। এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি কোন অধঃস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (স.) হযরত ওমরের মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় ঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, فِيْمَا شَجَرَ বাক্যটি **শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয় ; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও এটি কার্যকর** (বাহ্‌রে মুহীত)। অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রসূলে করীম (স.)-এর নিকট এবং **তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয় নিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।**[৬]

৬. মা'রিফুল কোরআন (সংক্ষেপিত) হারামাইন শরীফাইন প্রকাশিত : পৃষ্ঠাঃ ২৬২।
সূরা নিসা এর ৬৪-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত পুরো অংশটি মা'রিফুল কোরআনের উপরোক্ত গ্রন্থের ২৬১, ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

তাগুত ঃ আভিধানিক অর্থ

উপরের আলোচনায় আমরা তাগুতের স্বরূপ সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য জানতে পারলাম। এখন আমরা طَاغُوتْ শব্দের **আভিধানিক** দিক আলোচনা করব। কোরআন-হাদিসকে বোঝার জন্য যে আরবী অভিধানের উপর সর্বাধিক নির্ভর করা হয় তার নাম **'লিসানুল আরাব'** (لِسَانُ الْعَرَب)। এই গ্রন্থে তাগুত সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ্লেষণ রয়েছে। আমাদের আলোচনা সহজ করার স্বার্থে নিম্নের কথাগুলো সেখান থেকেই উদ্ধৃত করছি ঃ

قَالَ اللَّيْثُ : الطَّاغُوْتُ تَاؤُهَا زَائِدَةٌ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِّنْ طَغٰى- وَقَالَ اَبُواسْحَاقٍ : كُلُّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ جِبْت وَّطَاغُوْت - قَالَ اَهْلُ اللُّغَةِ : لِاَنَّهُمْ اِذَا اتَّبَعُوا اَمْرَهُمَا فَقَدْ اَطْغَوْهُمَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

বৈয়াকরণিক লাইছু বলেন, طَاغُوْت শব্দের ت বর্ণটি অতিরিক্ত এবং শব্দটি طَغٰى বা সীমালংঘন করা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আবু ইসহাক বলেন, মহাসম্মানিত ও পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য সব মাবুদকেই جِبْت এবং طَاغُوت বলে। **শব্দ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যখন কেউ উপরোক্ত جِبْت ও طَاغُوْت-এর অনুসরণ করে তখনই তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাগুতের অনুসারী হয় এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের সীমালংঘন করে।**

طَغٰى শব্দটি ক্রিয়া। এর مَصْدَر (ক্রিয়ার মূল) হল طُغْيَان; আর طَغْيَان শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন। নদীর পানি প্রবাহ নদীর দুই তীর দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাই নিয়ম। কিন্তু পানি যখনই তার তীরের সীমালংঘন করে উপচে উঠে দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখনই আরবরা বলে طَاغَتِ الْمَاءُ (পানি সীমালঙ্ঘন করেছে)। তদ্রূপ মানুষ কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁরই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁর আইন মেনে চলবে– এটিই আল্লাহ্‌র দ্বীনে স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ মানুষ যখন আল্লাহ্‌র দ্বীনের এই স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে ভাঙ্গবে এবং অন্য শক্তি বা শক্তিসমূহের অনুসরণ করবে,

বিশ্বাস করবে তখনই সে সীমালংঘন করবে। তাই لِسَانُ الْعَرَب-এ বলা হয়েছে كُلُّ مُجَاوِزٍ حَدَّهُ فِى الْعِصْيَانِ طَاغٍ-অর্থাৎ, **যে বা যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে তারাই তাগুত**। সুতরাং যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র আইন ভিন্ন অন্য আইনের প্রণয়ন ও অনুসরণ তাগুত হওয়ার সীমানা।

ঐ একই গ্রন্থে তাগুত সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে –

اَلطَّاغُوْتُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ

অর্থাৎ তাগুত একবচন হতে পারে এবং বহুবচন হতে পারে, পুরুষও হতে পারে মহিলাও হতে পারে। সুতরাং **পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীগণ** যারা এদেশে পূর্বেও ক্ষমতাসীন ছিলো এবং এখনো আছে তারা সকলেই তাগুত। প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে তাগুত। **যে কোন ব্যক্তি বা দল চাই তা পুরুষ হোক কিংবা নারী, তা একক হোক কিংবা দল, যদি তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছেড়ে অন্য কোন কিছুর আনুগত্য করে, কিংবা বিশ্বাস করে তারা তাগুতের অনুসারি এবং যে বা যারা অন্যদেরকে সেই গায়রুল্লাহ্‌র আনুগত্যে বাধ্য করে সে বা তারা তাগুত।**

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক সূরা বাকারাহ্‌-এর ২৫৭ নং আয়াত-এ এরশাদ করেছেন –

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ

যারা কাফির তাদের বন্ধু হলো তাগুত
এবং ঐ তাগুত তাদেরকে হেদায়েতের আলো থেকে সরিয়ে
গোমরাহীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

এখানে طَاغُوْت এবং ظُلُمَات-কে বহুবচনে উল্লেখ করার মধ্যে এই রহস্য নিহিত যে, **গোমরাহীর পথ অসংখ্য**। পক্ষান্তরে এর পূর্বের আয়াতেই আল্লাহ্‌ নিজেকে মু'মিনদের বন্ধু বলেছেন এবং তিনিই মু'মিনদেরকে "নূর"-এর দিকে নিয়ে যান। অর্থাৎ, একমাত্র হেদায়েতের রাস্তার দিকে নিয়ে যান।[১]

১. সূরা বাকারাহ্‌, আয়াত নং ২৫৬।

(اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাগুত যেমন অসংখ্য তার পথও অসংখ্য, অথচ আল্লাহ্ এক তাঁর পথও এক। অর্থাৎ, একমাত্র ইসলামই হেদায়েত, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রসহ বাকী সব মত-পথই গোমরাহী।

সূরা মায়িদার ৬০নং আয়াতে বলা হয়েছে –

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ

বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি, কাদের জন্য মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানরে ও শূকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং যারা তাগুতের আরাধনা করেছে তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকে অনেক দূরে।

এই আয়াতের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত তারা, যারা আল্লাহ্র অভিসম্পাতে অভিশপ্ত হয়েছে, যারা আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হয়েছে, যাদের কতককে বানরে ও শূকরে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং যারা তাগুতের আরাধনা করেছে।

সুতরাং আমরা যদি তাগুতকে স্বীকার করে নেই, তার অনুসরণ করি এবং তার নিয়ম মেনে চলি, আমরা আল্লাহ্র দরবারে নিকৃষ্টতম প্রমাণিত হব এবং সৎপথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত হব।

আমরা যাদের কাছে এ বক্ষ্যমাণ আলোচনা পেশ করছি তাদের অনেকে 'তাগুত' সম্পর্কে অসচেতন এবং এই অসচেতনতা যে তাদের ভ্রম তা প্রমাণ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে এও লক্ষ্য করছি যে, আমাদের অনেকেই অসচেতনভাবে **পাশ্চাত্য গণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সহায়ক মনে করছি– যা কোরআন পাকের প্রত্যক্ষ ঘোষণায় নাকচ হয়ে আছে। এই গণতন্ত্র কেন ইসলামি নয় এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয় তার আলোচনায় ইন্‌শাআল্লাহ্ পরে আসবো। ইতোপূর্বে আমরা পবিত্র কোরআন ও

আরবী অভিধানের দৃষ্টিতে তাগুত কি তা চিহ্নিত করেছি। এখন এর বর্তমান ও বাস্তব রূপ চিহ্নিত করবো।

সার্বভৌম ক্ষমতা

এ এমন এক ক্ষমতা যা সত্যিকারের মুসলমানদের দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহ্র প্রাপ্য। কারণ **এই ক্ষমতার অধিকারীকে প্রশ্ন করা যায় না** এবং **এই ক্ষমতার অধিকারীকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে ধরা হয়**। এই ক্ষমতা যার বা যে সংস্থার কেবল সে বা তারাই পারে আইন প্রণয়ন করতে, প্রণীত আইন কেবল ঐ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীই সংশোধন করতে পারে।

অপরাপর সকলে এই সার্বভৌমত্বের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পিত হয়ে থাকে। আমরা বর্তমানে বাংলাদেশের যে সংবিধানের অধীনে জীবন যাপন করছি সে সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্টকে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। চোর ধরা পড়লে চোরের যে শাস্তির বিধান, যিনাকারির শাস্তির বিধান, মদখোরের শাস্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ্র আইনকে বাদ দিয়ে গায়রুল্লাহ্র আইন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছি, অর্থাৎ কার্যতঃ আমরা তাগুতকে মান্য করছি। আমাদের লেন-দেন, কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবই কোরআন-সুন্নাহ্ বর্জিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত।

বর্তমান বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়ে এখানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জিন্দেগী যাপন করে, লেন-দেন, আচার-আচরণ ও আইন-আদালতের সাথে জড়িত থেকে আমরা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্থলে জনগণকে সার্বভৌম বলে কার্যত মেনে নিচ্ছি। **অর্থাৎ আমরা তাগুতেরই ইবাদত করছি।**

তাগুত ঃ মুক্তি কোন পথে

১. সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে গভীর বনে-জঙ্গলে ফল-মূল খেয়ে লতা-পাতা পরিধান করে আল্লাহ্‌র তাস্‌বিহ্‌-তাহ্‌লীল করে জীবন কাটানো এবং সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ বিষয়ে প্রকৃত দলীল ও প্রমাণের জন্যে এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'হযরত ঈসা (আ.) ঃ নবুয়্যতপূর্ব জীবন' শিরোনামের অংশ দ্রষ্টব্য।

২. এই সমাজ-সংসারে থেকে সমাজের জন-মানুষকে সংগঠিত করে সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করার সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সার্বভৌমত্বের সঠিক ব্যখ্যায় আলোচনা পেশ করবো।

৩. হিজরাত ঃ পাপ এবং অন্যায় থেকে পুণ্য এবং ন্যায়ের দিকে হিজরাতের বিষয়টি এখন تَزْكِيَةُ النَّفْسِ এর মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। তবে দ্বীন কায়েমের জন্য কিংবা পালনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বৈরী পরিবেশের দিকে স্থানান্তর এখন দুঃসাধ্য। কারণ তাগুত-এর কর্তৃত্ব এখন সর্বত্র খুব প্রকটভাবে প্রতিষ্ঠিত।

উপরোক্ত তিন অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় আমাদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত, পরকাল নষ্ট এবং জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনে পোড়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। আমরা যারা আল্লাহ্‌র অশেষ নেয়ামতের উপভোগকারী, তাঁরই দয়ায় আমরা যারা "ইলম" অর্জন করেছি তাদের এ মুহূর্তেই ভাবা দরকার আমরা তাগুতের ইবাদত করছি, না আল্লাহ্‌র ইবাদত করছি। যদি আমরা খালেস আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকি তাহলে এই সংকটময় মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক। **আমাদের সমাজের এক বিরাট সংখ্যক লোক অশিক্ষিত**, শিক্ষিত নামের যে শ্রেণী আছে তারাও **কুশিক্ষায় দীক্ষিত** হয়ে তাগুতী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, অশ্লীলতার প্রসারসহ নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনাচার ও অবিচার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত এবং খাঁটি আল্লাহ্‌র বান্দাদের জীবন-যাপন অতিষ্ঠ করে তুলতে তৎপর। সমাজের **অশিক্ষিত অংশ** যারা (সমাজের ৬০%-এর বেশি) অন্তরে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে অতি কষ্টে নিগৃহীত জীবন যাপন করছে। এরাই শহরের বস্তিতে, রাস্তার

ফুটপাতে এবং গ্রামের কুঁড়ে ঘরে তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কোন সত্যিকার দ্বীনি আন্দোলন হলে এরা অবশ্যই সত্যের পক্ষে আসবে। **শিক্ষিতদের ৯০% ভাগ** এমন যারা **তাকওয়াভিত্তিক** জীবনের কোন শিক্ষাই পায়নি। ফলে তাদের আচার-আচরণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটছে না। প্রকৃত দ্বীনের আন্দোলন গড়ে উঠলে এদের এক বিরাট অংশ সত্যের বিরোধিতায় প্রাণাতিপাত করবে এবং কম সংখ্যক সত্যের পক্ষে আসবে। **শিক্ষিতদের বাকী ১০% ভাগ** আল্লাহ্‌র বিধান এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে **অল্প-বিস্তর** জ্ঞান রাখেন। কিন্তু তাঁদের কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞানী। এখানে স্মরণ করা দরকার مَعْرِفَة (**বা আল্লাহ্‌র পরিচিতি**); تَقْوٰى (বা **আল্লাহ্‌ অনুভূতি**), عِلْم وعَمَل-এর অবিচ্ছেদ্যতা (**জ্ঞান ও কর্মের অবিচ্ছেদ্যতা**) ছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ প্রকৃত জ্ঞানীর সংখ্যা কম হলেও এদের উপস্থিতি এ সমাজে আছে।

আমাদের বিশ্বাস এরূপ প্রকৃত আলেমদের নেতৃত্বে **তাগুত হটানোর** কোন আন্দোলন হলে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ্‌, তাঁর নিযুক্ত ফেরেশতাগণ, মু'মিনগণ এবং শোষিত-বঞ্চিত জনগণ। তাঁদের **শত্রু হবে শয়তান,** তার সহচর তাগুত, কাফির, মুশরিক এবং জালিমগণ। **এই অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের** পরিণতিতে মানবতা মুক্তি পাবে তাগুতের গোলামী থেকে। দূর **হবে শোষণ-বঞ্চনা** আর **বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্‌র আইন**। জগত-সংসার একযোগে ঘোষণা করবে,

كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا

আল্লাহর আদেশ সবার উর্দ্ধে

তাগুত ঃ মুসলিম সমাজে

তাগুত মোট পাঁচ প্রকার ঃ

ক. স্বীয় নফস ঃ আপন **প্রবৃত্তি, মনের খাহেশাত, হাওয়ায়ে নফস** ইত্যাকার নামে পরিচিত। আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশকে বাদ দিয়ে যখন মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়া হয় তখন এই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা তাগুতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ বলেন–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

আপনি কি তাকে দেখেছেন
যে তার স্বীয় নফস্ ও হাওয়াকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে [১]

খ. পিতা-প্রপিতামহ থেকে চলে আসা নিয়ম-কানুনের অন্ধ অনুসরণ ঃ বিশেষতঃ যে সব নিয়ম-কানুনের পিছনে কোরআন ও সুন্নাহ্র কোন দলিল-প্রমাণ নেই। আল্লাহ্ বলেন–

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ـ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ط قَالُوْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ

এভাবে আপনার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন **সতর্ককারী (রাসূল)** প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এ পথের পথিকরূপে পেয়েছি, আমরা তো তাদেরই পথের অনুসারী। রাসূলগণ বললেন, তোমাদের পিতা-প্রপিতামহগণ যে পথে ছিলেন তার চাইতে অধিক সৎপথের প্রতি যদি আমরা পথ দেখাই তবুও কি তোমরা সেই পথেই চলবে? তারা সমস্বরে বলেছিল, (হে রাসূলগণ!) আমরা সে সব বিষয় অস্বীকার করছি যা নিয়ে তোমরা এসেছ। [২]

১. সূরা আল ফোরকান এর ৪৩ নং আয়াত এবং সূরা আল জাসিয়ার ২৩ নং আয়াত।

২. সূরা আল যুখরুফ, আয়াত নং ২৩ এবং ২৪, অনুরূপ আয়াত ২ ঃ ১৭০, ৫ ঃ ১০৪, ৭ ঃ ২৮, ১০ ঃ ৭৮, ২৬ ঃ ৭৪, ৩১ ঃ ২১, ৪৩ ঃ ২২ ইত্যাদি।

গ. মূর্তি, কবর, স্মৃতিস্তম্ভ বা কাল্পনিক কোন শক্তি ঃ এগুলো অতীত ইতিহাসের কোন মহান ব্যক্তিত্ব, জ্বিন বা শয়তানের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এগুলোর সামনে মানুষ (বিশেষ করে এগুলোর ভক্তবৃন্দ) ভক্তি গদগদ হয়ে মাথা নত করে, ফুল দেয় এবং প্রেরণা লাভ করে। **ওদ্দা শুয়া ইয়াউকা ইয়াগুছা, লাত-মানাত উজ্জা** থেকে শুরু করে যাবতীয় মূর্তি তথা **শিব, কালী, দুর্গা; দরগা বা মাজার, কবরগাহ বা শহীদ মিনার** এসব প্রতিটির সামনে এদের ভক্তবৃন্দ ভক্তি গদগদ হয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে ফুল দেয়, মাথা নত করে। এ বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্র দলিল এত বেশি যে আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি লোক এরূপ কাজকে শিরক বলে চিহ্নিত করতে পারে।

ঘ. আলেম-মুজতাহিদ, পন্ডিত-বুদ্ধিজীবী, গণক-ভবিষ্যক্তা, নেতা-নেত্রীঃ যাদেরকে **কোরআন ও সুন্নাহ্র দেয়া সীমার** বাইরে অনুসরণ করা হয়, যাদের কথা বা কাজকে **কোরআন-সুন্নাহ্র দলিলের মত** মনে করা হয় তারাও তাগুত এবং তাদের অনুসরণও **শিরক**।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন-

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা তাদের আলেম পন্ডিত **রাহিবদেরকে রব** বানিয়ে নিয়েছে।
আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে [৩]

ঙ. সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-বিধান ঃ

উপরে যে **চার** ধরনের তাগুতের কথা উল্লেখ করেছি তাদের অনুসরণ যে শিরক এ বিষয়ে কোরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে যিনিই জ্ঞান রাখেন তিনিই একমত। এটা ঠিক এগুলোকে সরাসরি طَاغُوْت বলে খুব কম ব্যাখ্যাকারই উল্লেখ করেছেন। তবে ইতোপূর্বে আমরা طَاغُوْت সম্পর্কে কোরআন-হাদিস ও শব্দকোষ-এর ব্যাখ্যায় যা বুঝেছি তা হল **গাইরুল্লাহ্র অনুসরণই হল তাগুতের অনুসরণ, আর সব গাইরুল্লাহ্-ই হল তাগুত**। সুতরাং এ চার ধরনের গাইরুল্লাহ্কে অনুসরণ করা

৩. সূরা আত্ তওবাহ্, আয়াত নং ৩১।

যে নিষিদ্ধ শিরক এ বিষয়ে উম্মতের সকল সচেতন ব্যক্তিই একমত। এ চার ধরনের طاغوت ছাড়া **পঞ্চম প্রকার তাগুত** রয়েছে। তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াতে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মদীনাহ মনাওয়ারাহ্তে বরকতময় ইসলামি খিলাফাহ্ কায়েমের পর থেকে ১৯২৪ সনের তুর্কী খিলাফত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় তাগুতের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি মুসলিম সমাজ কখনো দেখেনি। **এই পঞ্চম প্রকারের তাগুত হল সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-বিধান, বিচারালয় যেখানে কোরআন-সুন্নাহ্কে বাদ দিয়ে আইন তৈরী হয় এবং যে আইনে বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালাসহ চুরি, যিনা, হত্যা, মদ-নেশা ইত্যাদি বিষয়ে শাস্তি বর্ণিত হয় এবং লোকেরা ঐ আদালতে মোকদ্দমা পেশ করে এবং ঐ ফয়সালা শিরোধার্য করতে বাধ্য হয়**। এই পঞ্চম প্রকার طاغوت **বর্তমানে পুরো বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত** এবং **মুসলিম নামধারী শাসকরা** জেনে-বুঝে হোক আর না জেনে হোক এই **বিশ্বতাগুতের প্রতিনিধি** হিসাবে তাদের দেয়া বিধানানুযায়ী কোরআন-সুন্নাহ্র আইনের বিপরীত আইন দিয়ে মুসলিম জনগণকে শাসন করছে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র আইনে এবং সুন্নাহ্র ইতিহাসে অনুসরণ ও অনুকরণ, পূজা-উপাসনা, ইবাদত-বন্দেগী, বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য ডাকা, শ্রদ্ধা-বিগলিত হয়ে আত্মসমর্পণ করা কিংবা বিচার-ফয়সালা চাওয়ার বিষয়গুলিকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ সবের কোন একটির ক্ষেত্রে মানুষ যখন আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কোন সত্তা যেমন স্বীয় নফস; পিতা-প্রপিতামহ থেকে চলে আসা নিয়ম-কানুন, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-কানুন, বা মূর্তি-কবর-স্মৃতিসৌধ-জ্বিন-শয়তান, কাল্পনিক অপর কোন শক্তি কিংবা সমাজের জীবিত ও মৃত আলেম-পন্ডিত-বুদ্ধিজীবি-নেতা-নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য আরোপ করে তখন সে **তাগুত-এর অনুসারী** হয় এবং এর সব কয়টাই **শিরক** এবং জেনে-বুঝে এই সবক'টা থেকেই নিজ ঈমান ও আমলকে দূরে রাখতে হবে। নতুবা সব আমল ধ্বংস হবে, জাহান্নাম ওয়াজিব হবে, আল্লাহ্র ক্রোধ ও গজবে পরিবেষ্টিত হতে হবে। এ সব বিষয় বোঝার ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের সাধ্যমত চেষ্টা করা দরকার। যে সব জ্ঞানকে আল্লাহ্ পাক ফরজ করেছেন তার মধ্যে এ বিষয়ের জ্ঞান **সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ**।

মুসলিম সমাজে নবীর শিক্ষার সর্বাংশেই এই তাগুত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয় লক্ষ্য করা যায়। আমরা নবীর শিক্ষা বলতে কোরআন **(কিতাবুল্লাহ্)** ও **নবীর সুন্নাহ্** দুটোকেই একত্রে বুঝি; কারণ এর একটি অপরটির পরিপূরক এবং একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছেদ্য।

স্বীয় নফস, বাপ-দাদা থেকে চলে আসা নিয়ম-কানুন, মূর্তি-কবর-স্মৃতিসৌধ, জ্বীন-শয়তান কিংবা কাল্পনিক শক্তি ইত্যাদি যে তাগুত বা গাইরুল্লাহ হয় বা হতে পারে এবং এগুলির মাধ্যমে শিরক হয় এ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা বর্তমান প্রচলিত বই-পুস্তকে **সচরাচর দেখা যায়**। সমাজের জীবিত কিংবা মৃত আলেম-পন্ডিত, নেতা-নেত্রী, পীর-ফকিররাও যে তাগুতের স্থান দখল করতে পারে এ বিষয়ের আলোচনাও **বিরল নয়**। তবে দুঃখের বিষয় এ বিষয়গুলো আমাদের প্রচলিত ওয়াজের মাহফিলগুলিতে **অবহেলিত**। এ ব্যাপারে **সবচাইতে কম আলোচিত** হয় সমাজ-রাষ্ট্রের আইন-বিধান-এর বিষয়টি। এর মূল কারণ অনুসন্ধান করা দরকার।

বস্তুতঃ মদিনায় নবী নেতৃত্বাধীন ইসলামি খিলাফাহ্, তৎপরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদা এবং এরও পর আব্বাসী-উমাইয়া শাসন থেকে শুরু করে **১৯২৪ সন পর্যন্ত** মুসলিম বিশ্বের কোথাও শরিয়াহ্বিহীন আইন-কানুনের কিংবা বিচারালয়ের কিংবা লেন-দেনের নিয়ম-পদ্ধতির উপস্থিতি ছিলনা। সুতরাং এসব বিষয় যে তাগুত হয়ে দাঁড়াতে পারে এ আশঙ্কা মুসলিম সমাজে ছিলনা বললেই চলে। তাই ঐ সময়কার আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণও এ বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। মুসলিম রাজা-বাদশাহরা নিজেদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে মারামারি করেছেন, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে জুলুম করেছেন, শোষণ-শাসন করেছেন, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে নিজেরা অন্যায় ও পাপের সাথে জড়িয়েছেন, বিলাসিতা ও প্রাচুর্যে ডুবেছেন কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তাঁরা **শরিয়াহ্র আইনের** বিন্দুমাত্র রদ-বদল করতে চাননি। **গাইর শরিয়াহ্** সমাজ-রাষ্ট্রের কোথাও স্বেচ্ছায় প্রচলন করেননি। আইন-বিচারালয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর প্রাধান্য দেননি। লেন-দেন কাজ-কারবারের কোন একটি ক্ষেত্রেও কোরআন ও সুন্নাহ্র দেয়া সীমাকে অতিক্রম করেননি। **সুদী লেন-দেন** হতে পারে এমন কোন ব্যবস্থার প্রচলন হতে দেননি। ফলশ্রুতিতে এই গোটা ইতিহাসে মুসলিম বিশ্বের কোথাও মুদ্রাস্ফীতি যেমন হয়নি

তেমনি শরিয়াহ্‌র আইন চালু থাকার কারণে চুরি-ডাকাতি, হত্যা-খুন, ধর্ষণ, মদ-নেশা-জুয়া ইত্যাকার সামাজিক ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দেয়নি। আমাদের সম্মানিত আলেম-পন্ডিতগণ তৎকালীন রাজা-বাদশাহ্‌দের,পাপ-গাফলতি-বিলাসিতা, জুলুম-শোষণের **কঠোর সমালোচনা করেছেন; কিন্তু কাউকে তাগুত বলে চিহ্নিত করেননি**। আদর্শ খিলাফাহ্‌ ব্যবস্থার পর বাকী বিস্তীর্ণ সময় রাজা-বাদশাহ্‌রা রাজনৈতিক ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ভোগ করতেন আর এই ক্ষমতা কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হতে পারে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে **নির্মূল করতেন**। সমকর্তৃত্বের দাবীদারদের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ করতেন**। যাবতীয় **নিষ্ঠুরতার** পরিচয় দিতেন। ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশে গা ভাসাতেন। কিন্তু কস্মিনকালেও নিজদেরকে খলিফাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন **"কায়সার-কিস্‌রাহ্‌"** ভাবতেন না। এবং **আইন প্রণয়ন করার** কোন অধিকার তো দূরে থাকুক **আইনের ব্যাখ্যা করার** যোগ্যতা তাদের আছে তাও তাঁরা ভাবতেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা সবসময় দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম-পন্ডিতদের উপর নির্ভর করতেন। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ্‌ তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, লেনদেনে, ঝগড়া-ফ্যাসাদে; প্রয়োজনে কাজীদের দরবারে কিংবা দ্বীনি মাসআলার ফতোয়ার ব্যাপারে আলেমদের শরণাপন্ন হতেন। জনগণ এ সব ব্যাপারে বাদশাহ্‌দেরকে কখনও যোগ্য মনে করত না।

যে সব আলেম মুফতি **রাজ-দরবারে** আসা যাওয়া করত কিংবা তাদের থেকে **উপঢৌকন গ্রহণ করত** তাদেরকে জনগণ **ভাল চোখে দেখতনা**। অর্থ-বিত্তওয়ালা ক্ষমতার আশ-পাশে ঘুরাঘুরি করা আলেমদের-মুফতিদের সাথে **সমাজের বৃহদাংশের যোগাযোগ খুব কমই ছিল**। আলেম মুজতাহিদ্‌দের কারও মধ্যে রাজা-বাদশাহ্‌র সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এর ঘটনাকে সাধারণ জনগণ **তাকওয়া পরিপন্থী দুনিয়া পরস্তি** মনে করত। এ দীর্ঘ সময়ে **(হিজরি প্রথম দশক থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষ অব্দি)** মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে চলতে পারে, এমন উদ্ভট ধারণা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের কেউ কখনও মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করেনি। তাতারিদের হামলায় যখন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বাংশ তাদের করতলগত হল এবং তাতারিরা যখন ক্ষমতার আসনে বসল, তখন এ বিরাট অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য **ইয়াহুদী-খৃষ্টান-মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থের সংমিশ্রণে আইন প্রণয়নের** উদ্যোগ নিল। তখন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ এক যোগে তা প্রত্যাখান করল। বর্বর তাতারিরা যে আইন বানিয়েছিল ইতিহাসে

তা **'ইয়াসার আইন'** নামে খ্যাত। এই আইন প্রণয়ন এবং কার্যকরকরণের উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের ওলামা সম্প্রদায় ফতোয়া দিলেন– **"এ আইন মানা তো দূরের কথা, এ আইন শিখতে যাওয়াও কুফরি।"** মুসলিম বিশ্বের জনগণ আলেমদের এই ফত্‌ওয়াকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। উপায়ান্তর না দেখে তাদের ক্ষমতা বৃত্তের সাথে জড়িত তাতারিগণ এ অঞ্চল শাসনের স্বার্থে মুসলিম আইন ও আইনের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে অধ্যয়ন করতে বাধ্য হল। কারণ, তাদের কাছে তাদের নিজেদের এমন কোন আইন-কানুন-শৃঙ্খলা-সভ্যতা ছিল না, যা দিয়ে তারা দেশ পরিচালনা করতে পারে। **এই আইন বিধান অধ্যয়ন করতে গিয়েই পরবর্তীতে নিজেরা মুসলিম হয়ে যায়**। ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্য এরাই পরিচালনা করে।

পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে ক্রমান্বয়ে অধঃপতন ঘটতে থাকে। শিক্ষা, জ্ঞান, গবেষণা বিশেষতঃ বিজ্ঞানের রাজ্যে তাদের গতি শ্লথ হতে শ্লথতর হতে থাকে। ইত্যবসরে **মধ্যযুগীয় বর্বর অবস্থার ঘোর অন্ধকার** কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয় **ইউরোপ**। তাদের গীর্জা ও রাজাদের **সমন্বিত শোষণ-শাসনের** যাঁতাকল থেকে তাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ বের হয়ে আসতে সমর্থ হয়। তারা জ্ঞান-গবেষণা, অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী ও চালনার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। দ্রুত শিল্পায়নের কাঁচামাল ও কাঁচা শ্রম সংগ্রহে তাদেরকে **উপনিবেশ** গড়ায় উৎসাহিত করে। শিক্ষা, কারিগরি জ্ঞান, অস্ত্র-শস্ত্রের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে তারা একে একে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে এবং **এক সময়ে গোটা মুসলিম বিশ্বকে তারা গ্রাস করে**। যে সব এলাকায় তারা উপনিবেশ গড়তে সক্ষম হলো সে সব এলাকার **সম্পদ লুট করলো**। সেখানকার **স্বকীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে** তারা তাদের নিজদের স্বার্থে ঢেলে সাজাতে শুরু করল। তাদের কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং লুন্ঠনের পথে মুসলিম সমাজের **আলেমগণ বিভিন্ন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু করল**। তাই তারা বেছে বেছে আলেমদের হত্যা-নির্যাতন-দ্বীপান্তর করণের মাধ্যমে **নিশ্চিহ্ন করল**। তিউনিশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই তারা এ কাজ করল। এতে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌ যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করার লোকদের সংখ্যা **হ্রাস পেতে পেতে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছল**। ইত্যবসরে ঔপনিবেশিক শক্তি মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের **ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি (যেগুলোর আয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো চলত)**

বাজেয়াপ্ত করল। এতে একে একে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা রইলনা যেখানে মুসলিমগণ প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় উজ্জীবিত হতে পারে।

দীর্ঘদিন এভাবে অতিবাহিত হবার পর ঔপনিবেশিক শক্তি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে **আরও মারাত্মক ষড়যন্ত্র করল**। তারা ঔপনিবেশিক মুসলিম এলাকায় **দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করল**। এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার নাম ছিল ইংরেজী শিক্ষা। এতে তারা বস্তুগত শিক্ষা এবং সমাজ-সংসার সংগঠনের পরিচালনার জন্য দুনিয়াবী যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরীর ব্যবস্থা করল। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা তাদের জাতীয় ইতিহাসের বীর, শিক্ষাবিদ, আইনবিদদের উদাহরণ পেশ করল। মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিষয়গুলোকে হয় গোপন করল নতুবা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করল। এতে যে সব মুসলিম সন্তান এ শিক্ষা গ্রহণ করল তারা তাদের স্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য না জেনে ইংরেজ সভ্যতার আদর্শকে **ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিরূপে আত্মস্থ করল**। অপরদিকে দ্বীনি শিক্ষার নামে অপর এক বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম দিল। এতে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা তৌহিদ, শিরক, তাগুত ইত্যাদি বিষয় পুরো পাশকাটিয়ে কেবলমাত্র দ্বীনের কিছু খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষা জীবন শেষ করার ব্যবস্থা করল। তারা নিজেরাই পাঠ্যাংশ নির্ধারণ করল, তারা নিজেরাই কারা পাঠ দিবে তাদের প্রশিক্ষণ দিল। তাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তাদের ডিজাইন অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য তারা নিজেরাই তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকল। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতা আলীয়ার প্রতিষ্ঠা তারাই করেছিল। **ঐ আলীয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্রমাগত ৭৭ বছর তাদের ২৭ জন পাদ্রী এর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রিন্সিপ্যাল-এর দায়িত্ব পালন করল**। মুসলিম বিশ্বের অন্যত্রও এই একই নক্শা তথা **আলিম হত্যা ও নিশ্চিহ্নকরণ, ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিহ্নকরণ**, তদস্থলে নিজদের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করার কূট উদ্দেশ্য ভরা নয়া **দ্বিমুখী শিক্ষার প্রচলন করল**।

গোটা মুসলিম বিশ্বের কাঁচামাল এবং সম্পদ তারা জোর করে সস্তায় কিনে তাদের শিল্পোৎপাদিত পণ্যকে জোর করে চড়া দামে বিক্রি করে তাদের শিল্প বিপ্লবকে উত্তরোত্তর বিকশিত করল। অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নতিতে প্রভূত যোগ্যতা অর্জন করল। বিজ্ঞান তথা বস্তুগত জ্ঞানে দিনের পর দিন তারা উন্নতির পথে যেতে লাগল। পক্ষান্তরে মুসলিমরা প্রথমতঃ তাদের নিজেদের জড়তা, আরাম-আয়েশপ্রিয়তার

কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় এমনিতে পিছে পড়া ছিল। তদুপরি ঔপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্রে প্রথমে তা একেবারে বন্ধ হল। এতে মুসলিম জনগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবল। এরপর এদেরকে উদ্ধারের নামে ইংরেজেরা **ষড়যন্ত্রমূলক নকল দ্বিমুখী শিক্ষা দান করল**। ফলে অক্ষর জ্ঞান হল ঠিকই, কিন্তু এক দিকে সৃষ্টি হল নিজ ইতিহাস-ঐতিহ্য ভোলা নিজ ধর্ম ও কৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা **বৈরী ভাবাপন্ন** ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল; অপর দিকে গড়ে উঠল হতদরিদ্র, **দুনিয়া-বেখবর পরকালের নকল ছবির স্বপ্নে** বিভোর মাদ্রাসা শিক্ষিতের দল। **একদল "মিস্টার" অপর দল "মোল্লা"**। কোন দলের নিকটই প্রকৃত জ্ঞান নেই এবং কোন দলই স্বাধীনভাবে নিজেদের গড়তে শিখছে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই মিস্টারগণ আকার-আকৃতিতে মুসলিম থাকলেও মন-মগজে পুরো ইউরোপিয়ান হয়ে বড় হল, ইউরোপীয় স্বপ্ন দেখল, ইউরোপীয় জীবন যাপন করল। অপর দিকে দ্বীনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তর্ক-বাহাস করে, মসজিদের ইমামতি করে, মাদ্রাসায় তালিম দিতে ব্যস্ত থাকল মোল্লার দল। নব্বই শতাংশের বেশি জনতা গুরুত্বপূর্ণ সকল শিক্ষার স্পর্শ থেকেই বঞ্চিত রইল। ফলে বাপ-দাদা থেকে **শ্রুত** হয়ে কিংবা **বিস্মৃত** হয়ে কল্পনার কল্পকথা যুক্ত করে দ্বীনের এক **প্রাণহীন অবয়ব মাত্র** টিকিয়ে রাখল। ইত্যবসরে ঔপনিবেশিক শক্তি আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে মুসলিম বিশ্বের গোটা আইন ব্যবস্থায় **ইসলামী শরিয়াহ্র আইনকে বাদ দিল**, সে স্থলে তাদের নিজেদের গড়া আইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করল। **লেন-দেনে সর্বত্র সুদের প্রচলন করল**।

একদিকে মুসলিম সমাজের ক্রমাবনতি অপরদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির ক্রম অভ্যুত্থানে কখন যে মুসলিম বিশ্বের গোটা আইন-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, লেনদেন ইত্যাদিতে কোরআন-সুন্নাহ্র নিয়ম পদ্ধতি বহির্ভূত বস্তুবাদী সভ্যতার উপাদান প্রতিস্থাপিত হল তার খেয়ালই কেউ রাখল না। **মোটামুটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে ১৯২৪ সনের তুর্কি খিলাফাহ্ ব্যবস্থা বিলোপের পর থেকে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রকৃত طاغوت তার আইন বিধানদাতা অর্থে সমাজ ও এলাকায় আসন গেড়ে বসল**। এই ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য যখন মুসলিম বিশ্ব গ্রাস করল তখন মুসলমানদের অবস্থা এত শোচনীয় হল যে তারা

এদফায় আর তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি সভ্যতা-তমুদ্দুন হেফাজত করতে ব্যর্থ হল। নামমাত্র মুস্‌লিম থেকে ইউরোপীয় জীবনাচরণকে তারা **উৎসাহভরে** নিজদের মনের অজান্তেই গ্রহণ করল। অবস্থা এমন হল যে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যখন প্রত্যক্ষ উপনিবেশগুলি তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করল তখনও তারা তাদের ইউরোপীয় প্রভুদের জীবনাচরণ শিক্ষা-দীক্ষা ভুলতে পারল না। সুতরাং **পঞ্চম প্রকার طَاغُوْت তথা সমাজ রাষ্ট্রের আইন-বিধান দাতা হিসাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত** হল। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরও মুসলিম বিশ্বের জনগণ ও ইংরেজী শিক্ষিতের দল তো দূরে থাকুক, আলেমদের ৮০ শতাংশের বেশিও এই طَاغُوْت কে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হল। **রাষ্ট্র শাসন-সংবিধান গাইরুল্লাহ্‌র আইনে চলবে, লেন-দেনে সুদী অর্থনীতি থাকবে এরপরও নিজদেরকে মুসলিম নামে আল্লাহ্‌র পেয়ারা বান্দাহ্ বলা হবে** এমন উদ্ভট বিষয় পর্যন্ত অনুধাবন করার ক্ষমতা হারাল মুসলিম শাসক, শিক্ষিত জন এমনকি আলেম নামে পরিচিত জনরাও।

তাই আমাদের বর্তমান এ দুরবস্থার জন্য আমাদের জনগণকে সরাসরি দায়ী করা এবং এর কারণে ত্বরিৎ কাফির-মুশরিক ফতোয়া দেয়া এবং তাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকা কতখানি সঠিক হবে ভেবে দেখা দরকার। ফতওয়ার কিতাব ঘেঁটে, কোরআনের আয়াত ও হাদিস-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ শাসন ব্যবস্থা যারা মেনে নিয়েছে, এরূপ শাসন ব্যবস্থার ধারক-বাহকরূপে যে সব মুসলিম নামধারী আছে তাদের কতককে স্বয়ং طَاغُوْت এবং কতককে طَاغُوْت এর অনুসারী প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়। **কিন্তু এটাই কার্যকর সমাধানের পথ কিনা তা ভাবার সময় এখন অবশ্যই উপস্থিত।**

কুফ্‌র ও কাফির-এর পার্থক্য

এ বিষয়ে অতীতের ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে কোন মুসলিমকে তার পাপের কারণে কাফির ফতওয়া দেয়া ঠিক নয়। বাহ্যতঃ একজন মুসলিমের কর্মকান্ড যতই পাপপূর্ণ হোক তাকে কাফির বললে তার সংশোধনের আশা প্রায় তিরোহিত হয়। অবশ্য **যারা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, সরাসরি দ্বীনকে অস্বীকার করে, যারা নিজদেরকে ভিন্ন আদর্শের ধারক-বাহক বলে গর্ব অনুভব করে তাদের কথা আলাদা।** তারা যে কাফির মুশরিক মুরতাদ এতে কারোও সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করেনা, সলাত-সিয়াম, হজ্জ-যাকাত নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত আদায় করে, কোরআন-সুন্নাহ্‌কে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসে, পাপ কাজ পুণ্য কাজ উভয়টিই করে, কিন্তু মুসলিমদের জন্য ভালবাসা অনুভব করে, দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে কোন মুসলিমের কষ্ট শুনলে তার বুকে কষ্ট অনুভব করে, সময় সময় উম্মাহ্‌র বর্তমান দুর্বিষহ যাতনার কথা চিন্তা করে হৃদয়ে জ্বালা অনুভব করে, তস্‌বিহ তাহলীল করে, কোন না কোন দ্বীনি সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখে, কিংবা রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে হাত তুলে কাঁদে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে **পাপী মুসলিম ছাড়া আর কি বলা যায়!**

বস্তুতঃ বর্তমান দুনিয়ার সোয়াশ' কোটি মুসলিমের বিরাট অংশের অবস্থা তাই যা উপরে বর্ণিত হল। এদের প্রায় ৯০ ভাগই সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-বিধান যে কোরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী না হলে গাইরুল্লাহ্ তথা طَاغُوْت এর শাসন হয় এবং তার অনুসরণ করলে যে **শিরক** হয় এ কথাই জানে না। এমতাবস্থায় এদেরকে কাফির মুশরিক বলে এদের থেকে দূরে থাকলে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কতখানি সুবিচার হবে তা ভাবা দরকার নয় কি?

এর মানে এই নয় যে, যে সব নামধারী ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মী তাগুতি সরকারের আইন পরিষদে যোগ দিয়ে "জনগণ সার্বভৌম" রূপ বাক্যকে শিরোধার্য করে শপথ করছেন তাদের বিষয়টি আমরা ভুলে যাচ্ছি। **কোন কাজকে "কুফরি" বলা আর কোন ব্যক্তিকে "কাফির" বলা এক নয়। মুসলিম নামধারী কেউ**

উপরোক্ত শাসন পদ্ধতিতে নিজেকে জড়ালে আমরা তার এই কাজকে বর্তমান পরিস্থিতিতে কুফরি বলবো, তাকে কাফির বলবো না। কারণ দ্বীন ক্বায়েম অবস্থায় বর্তমান দুনিয়ায় কোন ভূখন্ড নেই। দ্বীন কায়েম হয়ে গেলে উপরোক্ত কর্মের লোকদের নির্দ্বিধায় কাফির বলা যাবে। এমতাবস্থায় দ্বীন কায়েমই হবে আমাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বৃহত্তর ঐক্যই আমাদের কাম্য। কোন ব্যক্তিকে "কাফির" ফতওয়া দিলে তাতে দ্বীনি আন্দোলনের তেমন লাভ হয় কি? বরং সংশোধনের নিমিত্তে যে দাওয়াত নিয়ে তার কাছে যাওয়া যেত তার পথ আগ বাড়িয়ে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা হয়। **আমাদের আরও বড় শত্রু আছে**। তালিকার সর্বোচ্চে অবস্থান করছে **শয়তান, কাফির, মুশরিক**, ইয়াহুদী-খৃষ্টান এবং **বিশ্ব তাগুত দাজ্জালের প্রতিভূ** Novus Ordo Seclorum এর ধারক-বাহকগণ। তাদের বহুবিধ ষড়যন্ত্রে উম্মাহ্ আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় উম্মাহ্র ভিতরকার ত্রুটিপূর্ণ ইস্লামের জন্য ফতওয়া নয়, নসীহতের রাস্তাই অধিকতর ফলপ্রসূ।

যারা ইসলামি আন্দোলনের নামে তাগুতি শাসকদের আইন পরিষদে যোগ দিচ্ছেন তাদেরকে আমরা তাদের কৃতকর্মের কুফল তুলে ধরি। তাদেরকে ফিরে এসে তওবাহ্ করার আহ্বান জানাই। এটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। কাফির-মুশরিক ফতওয়া দিলে সমস্যার সমাধানে কোন অগ্রগতি হবে আশা করা যায় না, তদুপরি আমরা যেহেতু ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা জানিনা, আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা ঠিক নয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগে এ ধরনের রায় দেয়ার বৈধ অধিকারি কে হতে পারে? তাদেরকে আমরা বলবো, "আপনাদের এহেন অপকর্ম যাকে আপনারা **হিকমত** বলে চালিয়ে দিচ্ছেন তা আমাদের অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনগণকে বিভ্রান্তিতে ফেলছে। আপনাদের এহেন কাজে طَاغُوْت শক্তিশালী হচ্ছে, দ্বীন কায়েমের লক্ষ্য দূরে সরে যাচ্ছে। আপনারা সংশোধন হলে আপনাদেরই লাভ। নতুবা দ্বীন আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোনীতদের মাধ্যমে ক্বায়েম করবেনই।" **এক্ষেত্রে যারা যত্রতত্র কাফির-মুশরিক ফতওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, "এ কাজ করে যদি আপনারা আনন্দ অনুভব করে থাকেন তাহলে আপনারা মারাত্মক বিভ্রান্তিতে আছেন। আর যদি সংশোধনের আশায় এমন কথা বলে থাকেন তবে বলবো এটা অনুত্তম।"**

কাফির ফতোয়া

পবিত্র কালামে এমন অনেক আয়াত আছে এবং তেমনি অনেক হাদিস আছে যার কোন একটি একক অর্থ ধরলে এবং এর সাথে আমাদের কার্যক্রম বিচার করলে নিজদেরকে কাফির-মুশরিক মনে হয়। বিষয়টা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আত্ম-সমালোচনার উদ্দেশ্যে ঐ আয়াত বারবার পাঠ করলে আর নিজের দিকে তাকালে নিজের আত্মিক উন্নতি তথা আমলের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতে বর্তমান **পরিস্থিতির চাপ** নাকি স্বীয় **প্রবৃত্তির খাহেশাত** আমাকে উক্ত অবস্থানে পৌছিয়েছে তার আন্দাজ করা সহজতর হয়, কিভাবে আয়াত কিংবা হাদিসের দাবী অনুযায়ী **তাকওয়ার নিকটবর্তী** তথা তাস্‌লিমের নিকটবর্তী হওয়া যায় তার রাস্তা অনুসন্ধান সহজ হয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা রয়েছে তিনি আমাদেরকে পথ দেখাবেন। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, অর্থাৎ যারা আমার রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা সংগ্রাম করে আমি অবশ্য অবশ্য তাদের জন্য পথসমূহ দেখাবো।[৪] এর পর আল্লাহ্ বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ। নিশ্চিতই আল্লাহ্ পাক মোহসীনদের সাথেই রয়েছেন।[৫] ঐ একই আয়াত বা হাদিসকে অন্য মুসলিম ভাইয়ের উপর প্রয়োগ করে তাকে "কাফির," "মুশরিক" ঘোষণা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কারণ-

ক. আল্লাহ্র রাসূলের ঘোষণা অনুযায়ী **প্রতিটি আমলের বিচার হবে নিয়্যাত বা অন্তরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী** (اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ)। অন্তর যেহেতু দেখা যায় না তাই তার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অন্যদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা ঐ ভাইকে বাধ্য করছে ঐ বিশেষ কুফরি বা শিরকে আচরণ করতে যা আপনি আমি বাইরে থেকে বুঝতে পারছি না। এমনও হতে পারে আমার ঐ ভাই/বোন ঐ বিশেষ কাজটি যে কুফরি তা আদৌ জানেনই না। এমতাবস্থায় তাকে "কাফির," "মুশরিক" ফতওয়া দিলে সে আমার কথা শুনতেই আগ্রহী হবে না। আর শুনলেও শুনবে ক্ষোভ ও ক্রোধ সহকারে, পরিণতিতে সে সঠিক কথা বুঝবে

৪. সূরা আল আনকাবুত, আয়াত নং ৬৯
৫. প্রাগুক্ত আয়াত।

না। এতে আমার যে উদ্দেশ্য- তাঁর মধ্য থেকে উল্লিখিত আচরণের সংশোধন তা সুদূর পরাহত হবে।

খ. বর্তমান সময়ে বিশ্ব-তাগুত আল্লাহ্‌র জমিনে তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সে তার Novus Ordo Seclorum এর আওতায় সারা দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্র-নায়ক ও রাজনীতিবিদদের তার দেয়া নিয়মের প্রতি বাধ্য করে রেখেছে। এক্ষেত্রে **যে একটু বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে তাকেই সরাসরি** সে কিংবা তার চেলাচামুন্ডা তথা তার আঞ্চলিক প্রতিনিধি অর্থাৎ আমাদের মুসলিম নামধারী শাসকরা **নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে**। বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সে একমাত্র খাঁটি আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দেরকেই তার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করছে। হুজুর পাক (স.)-এর সময় মক্কায় আবু জেহেল, আবু লাহাবরা যেমন হুজুর পাক ও তাঁর সাথীদের প্রতি বৈরীতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল এখনকার Novus Ordo Seclorum এর ধারক-বাহক তথা আমেরিকা[৬] ইসলামের খাঁটি অনুসারী ও তাঁদের মত যারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রকৃত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি খড়গহস্ত হচ্ছে এবং নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সকল কর্মসূচী নিচ্ছে। **এজন্য কেউ চাইলেও শিরকমুক্ত পরিবেশে হারামমুক্ত হালাল রিজিক ভক্ষণ করে চলতে পারে না**। শরিয়তের পরিভাষায় যাকে প্রকৃত **"অনন্যোপায় অবস্থা"** বলে, এখন ঠিক তাই।

১৯২৪ সনে তুর্কী খিলাফাহ্ ধ্বংস হওয়ার পর মুসলিম বিশ্ব প্রকৃত তাগুতি শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। এরপর থেকে অবস্থার ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। আমাদের সামষ্টিক এবং ব্যক্তিগত জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্র বিশ্বতাগুত এবং তাদের স্থানীয় দালালদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এমতাবস্থায় কেউ শিরক কিংবা হারাম উপার্জন এড়াতে সক্ষম নন। অনন্যোপায়ের **এ অবস্থাকে হুজুর পাক (স.)-এর মক্কী জীবনের সাথে তুলনা করলেও কিছুটা কম বলা হবে**। কারণ আবু জেহেল, আবু লাহাবরা তখন মক্কার সাধারণ লোকদের উপর যেরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা Information Technology এর

৬. একথা অনস্বীকার্য সত্য যে, আমেরিকা বর্তমানে Ruling State of the World. অবস্থা যেরূপ হচ্ছে অচিরেই Israel সে স্থান দখল করবে। তখনই বাস্তব দজ্জাল তার পরিপূর্ণ রূপে অস্তিত্ব লাভ করবে। আমেরিকার পূর্বে Britain এ অবস্থানে ছিল তবে এতটা ব্যাপকতর কর্তৃত্ব তার ছিল না।

বিস্ময়কর উন্নতির কারণে এবং বর্তমান ঐ Information Technology ও মিডিয়া সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে বর্তমান আবু জেহেল-আবু লাহাব তথা বুশ-ব্লেয়ার চক্র ও তাদের সেবাদাস ফাহাদ-মোবারাক গাদ্দাফি-মোশাররফ গং সহ সকল মুসলিম নামধারী শাসক তার চাইতে সহস্রগুণ বেশি নিয়ন্ত্রণ লাভ করছে। **তখন এমন অনেক গিরি গুহা, বন-জঙ্গল, মরুভূমি ছিল যেখানে হিজরত করে শিরকমুক্ত পরিবেশ এবং হারামমুক্ত রিযিক সন্ধান করা যেত। এখন জমীনের বুকে কি জলে কি স্থলে কোথাও এতটুকুন যায়গা নেই যেখানে ঈমান-এর প্রকৃত দাবী নিয়ে বাঁচা যায়।** এমতাবস্থায় আমাদের সকলকে এ অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করে প্রথম নিজেদের **"অনন্যোপায়"** অবস্থা বুঝতে হবে। এর পর কোন প্রকার **বিলাসিতা না করে কেবলমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানোর জন্য জীবিকা গ্রহণ করে বাকী সকল শক্তি, সকল মেধা, সকল শ্রম, সকল অর্থ এরূপ বিশ্ব তাগুত ও তাদের স্থানীয় পা-চাটাদের উৎখাতের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করতে হবে**। বর্তমান সময়ের এ মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত সকল ব্যক্তি-মুসলিম ও সামষ্টিক দলগত মুসলিম এবং ইসলামী দলকে বুঝতে হবে। **এমতাবস্থায় নিজদের মধ্যে ঐক্য সর্বাধিক কাম্য**। কাফির ফতওয়া এ ঐক্যের পথে একটি বড় বাধা। **তাই** এ ফতওয়া না দিয়ে অবস্থা ও অবস্থানের প্রকৃত ও বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণসহ কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে তুলে ধরাই হবে এ সময়ের কাজ।

গ. আল্লাহ্ বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মোহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছেন তারা কাফিরদের প্রতি কঠিন কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল।[৭]

এ আয়াতের দৃষ্টিতে অপর মুসলিম ভাই-বোনের ব্যাপারে চাই ব্যক্তি হোক কিংবা সমষ্টি হোক আমরা সহানুভূতিশীল হবো। তার বা তাদের ভুল-ত্রুটিকে বড় করে না দেখে, তার বা তাদের সংশোধন কামনা করবো, সংশোধনের জন্য সর্বোত্তম পথ ও পন্থার তালাশ করবো, আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবো, আর ভাববো তার বা তাদের যে দোষ-ত্রুটি দেখছি তার চাইতে অনেক ভাল গুণ আছে যা আমরা গায়েব না জানার কারণে জানছি না।

৭. সূরা আল ফাত্‌হ, আয়াত নং - ২৯।

অবশ্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিদ্রূপে অংশ নিচ্ছে, দ্বীনের বিষয়কে ঘৃণা করছে, কিংবা নিজেদেরকে নাস্তিক কিংবা অন্য কোন গায়র শরয়ী নামে ডাকাকে পছন্দ করছে তারা আমাদের এই সহানুভূতির আওতায় পড়বে না; যদিও তারা আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, নিকটাত্মীয় কিংবা অন্য কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের মধ্য থেকে হয়। তবে কোন কাজটি কুফরি এবং কোন কাজটি গুনাহ্ তা অনুধাবন করার জন্য নিম্নের মূলনীতি দুটি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। এ দুটি মূলনীতি হারামাইন শরীফাইনের ইমাম আবুল মআলী ইব্নুল যুআইনি (মৃত্যু ৭৫৭ হি.) তাঁর আত্তারিকু ইলাল খিলাফাহ্ (খিলাফাহ্র পথ) পুস্তকের ৪৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

প্রথম মূলনীতি ঃ দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কারও নিকট যদি এ জ্ঞান এসে থাকে যে, বিষয়টি আল্লাহ্ এবং রাসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে, এমতাবস্থায়ও যদি ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ না করে (বর্জন করে) তবে সে কাফির। কারণ, ইসলামের অর্থই হলো, আল্লাহ্র দরবারে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং যা কিছু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (নির্দেশ বা নিষেধ) আসবে তার সব কিছুকেই গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ কিন্তু যে দ্বীনের বিষয়টিকে গ্রহণ করলো অতঃপর এর আদেশ নিষেধ-এর কোন কোনটির লঙ্ঘন করলো এবং স্বীকার করলো যে, সে অন্যায় করেছে, সে কাফির নয়। সে গুনাহ্গার হলো, আল্লাহ্ চাইলে সে মাফ পাবে কিংবা সে শাস্তি পাবে।

এ দুটি মূলনীতির দৃষ্টিতে কেউ যদি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (স.)-এর একটিমাত্র নির্দেশ কিংবা একটিমাত্র নিষেধকে জেনে-বুঝে প্রত্যাখ্যান করে সে কাফির। ঐ একই পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠাতে اتَّخَذُوٓا أَحۡبَارَهُمۡ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবুল বখতারির বর্ণনায় বলা হয়, "হুজাইফা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো এ আয়াত সম্পর্কে যে, সত্যই কি ইয়াহুদীরা তাদের আলেম-পন্ডিতদের ইবাদত করতো? হুজাইফা (রা.) বললেন, না। বরং তারা তাদের আলেম-পন্ডিতগণ যে সব বিষয় হালাল ঘোষণা করতো তাকে হালাল জানতো আর যে সব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করতো তাকে হারাম জানতো।" অতঃপর আবুল বখতারী বলেন, "কিন্তু তারা তাদের আলেম-পন্ডিতদের সেজদাহ্ করতো না, এমনকি তাদেরকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের (আলেম-পন্ডিতদের) ইবাদাত করতে বললে তারা ইবাদাতও

করতো না। তারা কেবল হারাম ও হালাল করার বিষয়ে তাদের আলেমদের অনুসরণ করতো। আর এটাই ছিল আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আলেম-পন্ডিতদের "রব" হিসাবে স্বীকার করার বিষয়"। সুতরাং বৈধ অবৈধ-এর সীমা নির্ধারণে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য যে কারও অনুসরণের অর্থই হচ্ছে তাকেও "রব" মেনে নেয়া। সুতরাং যারা তাদের আইন বিধানের উৎসে কোরআন ও সুন্নাহ্কে প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত বিধানকে গ্রহণ করে নিয়েছে তারা যে প্রকৃতই কাফির এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও ঐ আইন-বিধান যারা রচনা করে তাদেরকে এরা সিজদাহ করে না কিংবা প্রচলিত অর্থে তাদের জন্য ইবাদাত অনুষ্ঠান করে না, তবুও তারা কাফির।

কিন্তু যারা আইন-বিধানের উৎস হিসাবে একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ্কেই মানে তথাপি তাদের আমল-আখলাকে এর বিপরীত কিছু প্রকাশ পায় তারা গুনাহ্গার কিন্তু কাফির নয় । এখন যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে খিলাফাহ্র দাবীকে আড়াল করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে শপথ গ্রহণ করে এবং ঐ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংবিধান রচনা করে তারা কাফির। কিন্তু যারা মনে-প্রাণে আল্লাহ্র বিধান কায়েমের চেষ্টায় সর্বস্ব ত্যাগ করা অবস্থায় গাইরুল্লাহ্র সকল আইন-বিধানকে ঘৃণা করা অবস্থায় বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধান দ্বারা শাসিত হয় তারা কাফির নয়।

কাফির-মুশরিক অবস্থা এবং গুনাহ্গার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির পর উপসংহারে আমরা বলবো, প্রকৃত শয়তান, তাগুত, কাফির -মুশরিক-ইয়াহুদি-নাসারাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটুক। মুসলিম তা নামধারী হলেও তার প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ পাক। কাফির-মুশরিক ফতওয়া দিয়ে তার বা তাদের মনে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যে ভয়-শ্রদ্ধা-ভালবাসা অবশিষ্ট আছে তা আরও নিঃশেষ করার পথ আমরাই যেন প্রশস্ত না করি। সুতরাং **আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হবে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করা এবং উম্মাহ্র সংশোধন কামনা করা। আর উম্মাহ্র মধ্যে দ্বীনের প্রকৃত বুঝ সহকারে বৃহত্তর ঐক্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করা, আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা এবং তাঁরই দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা। ইসলামি দাওয়াত ও তবলীগাতের একটি মৌলিক নীতি হল –**

أَنَا دَاعِي لَا قَاضِي

আমি আহ্বানকারী, বিচারক নই।

- সার্বভৌমত্ব
  - ইসলাম ও আধুনিকতা
  - বৈশিষ্ট্য
  - আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের ভ্রম

সার্বভৌমত্ব ঃ ইসলাম ও আধুনিকতা

রাজনৈতিক দর্শনে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই **আইনের প্রয়োজনীয়তা** স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে সকলে যে একমত তা একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট আইন-কানুনের অনুপস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় কোন সুশৃঙ্খল কল্যাণকামী মনুষ্য-সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তা অবাস্তব।

আইনের **প্রয়োজনীয়তায়** দ্বিমত না থাকলেও **আইনের উৎস,** আইন প্রণয়নকারী সত্তা বা গোষ্ঠি কিংবা বিমূর্ত সত্তার অধিকারী কে, কি বা কারা এ নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য বিদ্যমান।

যে আদর্শ আইন ব্যবস্থা মানব সমাজ স্মরণাতীত কাল থেকে কামনা করে এসেছে তার কতগুলো **সাধারণ বৈশিষ্ট্য** সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একমত। বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ।

আইন হচ্ছে

ক. **মানবতার সার্বিক কল্যাণ তথা ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক ক্রমাগত কল্যাণমুখী বিকাশের গ্যারান্টি।**

খ. **আইন পালনকারী সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য ব্যবস্থা।**

গ. **সকল মানুষের সহজাত ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ ও যথাযথ সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন বিধির নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা।**

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আইন ব্যবস্থা যদি সকল কালের সকল স্থানের সকল মানুষের জন্য হয় তাহলে তাই হবে মানবতার পরম পাওয়া মুক্তি সনদ। এমন ব্যবস্থা অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা, হতাশা-লাঞ্ছনা ইত্যাকার সকল অকল্যাণমুক্ত।

বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিংবা স্বরূপ চিহ্নিত করতে বলেছেন, **"সার্বভৌম-এর আদেশই আইন"** (অষ্টিন); **"সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন করা"** (জ্যাঁ বোদা)। বস্তুতঃ সহজাত বিবেকের রায়ও তাই যে, আইনকে নিরপেক্ষ হতে হলে ব্যক্তি, গোষ্ঠি, বর্ণ, স্থান, কাল-এর উর্ধ্বে উঠতে

হলে; দু'টি শর্ত পূরণ প্রয়োজন। **প্রথমতঃ** আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তা এবং আইন পালনকারী বা অনুসারী বলে দু'টি ভিন্ন গোষ্ঠির ধারণা। **দ্বিতীয়তঃ** আইন পালনকারী সংস্থা বা সত্তার চাইতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবদিক দিয়ে প্রমাণিত হতে হবে।

আইন প্রণয়নকারী এবং **আইন পালনকারী** যদি একই মর্যাদার একই ক্ষমতার ধরে নেয়া হয় তাহলে যারা প্রণয়ন করবে তারা তাদের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে অপারগ হতে বাধ্য। অপরদিকে সকলে মিলে একত্রে সকলের সমান স্বার্থ সংরক্ষণ করে কোথাও কোন আইন প্রণয়ন প্রায় অবাস্তব ধারণার শামিল। **এমতাবস্থায় যুক্তির খাতিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাধর, অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ আইন প্রণয়নকারী সংস্থার বিমূর্ত ধারণাই হল সার্বভৌমত্বের ধারণা। এরূপ ধারণার প্রেক্ষিতে সার্বভৌমের আদেশই আইন বা সার্বভৌমের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন।**

সার্বভৌমত্ব বৈশিষ্ট্য ঃ

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ–

ক. অষ্টিনের মতে, "চূড়ান্ত" "চরম" "অসীম" "অবাধ" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তর যোগ্যহীন" "শাস্তি প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান" এরূপ ক্ষমতা। [১]

খ. গ্রাটিয়াসের মতে, সাবভৌম হল, "চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা।"

গ. বার্জেসের মতে, "মৌলিক" " চরম" ও "অসীম" ক্ষমতা।

ঘ. টমাস হবস-এর মতে, "চরম" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তরবিহীন" ক্ষমতা।

ঙ. রুশোর মতে, "চরম" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তরযোগ্যহীন" "ঐক্যবদ্ধ" "স্থায়ী" ক্ষমতা।

চ. জাঁ-বোদার মতে, "সার্বভৌম ক্ষমতা 'চূড়ান্ত' ও 'চিরন্তন' ক্ষমতা, কোনভাবেই আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়"।

---

১. ক থেকে চ পর্যন্ত সব ক'টি কথাই "আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা" গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা "বাস্তবেই আছে কিনা, থাকলে এই ক্ষমতা কার বা কিসের, সেই তর্কে না গিয়েও আপাততঃ এ কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা সম্ভব যে,"সার্বজনীন, দেশ-কাল-বর্ণ নিরপেক্ষ সকলের সকল স্থানের সকল মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সহজাত কল্যাণমুখী গুণাবলীর ক্রমাগত বিকাশ সাধনের আইন কেবল উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিংবা তার চাইতে উচ্চতর ও মহান গুণাবলী সংবলিত সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষেই সম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত আইন-প্রণয়নে সক্ষম হওয়ার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার আরও কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণের দরকার। যেমন ঃ

ক. সেই **"সার্বভৌম ক্ষমতাকে"** অবশ্যই **"সর্বজ্ঞ"** হতে হবে। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতাকে সকলের সার্বিক প্রয়োজন ও স্বার্থকে তার স্থান-কাল-বয়সের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে। এসব স্বার্থ ও প্রয়োজন পূরণের সকল সামগ্রী প্রয়োজনানুপাতে সদা সর্বদা সর্বত্র সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে।

খ. **স্থান-কাল-পাত্রসহ বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি, বিকাশ, পরিচালন, সংরক্ষণ, ধ্বংস-লয়** ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ক্ষমতাবান হতে হবে। কিন্তু নিজে এসবের দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হবেনা এবং এসবের কোন কিছুর প্রয়োজন তার হবে না। অর্থাৎ সার্বভৌম হবে অমুখাপেক্ষী।

গ. **সেই সত্তার অবশ্যই কোন দোষ-ত্রুটি থাকবেনা** এবং কোন প্রকার দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করবে না।

ঘ. তিনি সর্বাবস্থায় সকলের উপর **পূর্ণ ক্ষমতাবান** থাকবেন।

ঙ. **আইন প্রণয়নই শুধু নয়, বরং প্রণীত আইন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালিত হচ্ছে কিনা তার তদারক করার ক্ষমতা,** পালিত না হলে তার জওয়াবদিহি গ্রহণের ক্ষমতা, এ সব ক্ষেত্রে কার শিথিলতা, গোঁড়ামী, অবহেলা, অবাধ্যতা কতখানি তার বিচার ব্যবস্থার জন্য মানব বংশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে একত্রে এক ময়দানে একই সময়ে হাজির করার ক্ষমতাও উল্লিখিত সার্বভৌম ক্ষমতার থাকতে হবে।

চ. অপরদিকে যারা যতখানি নিষ্ঠার সাথে আন্তরিকতার সাথে প্রণীত আইনের কম-বেশী ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশ পালন করেছে তাদের প্রচেষ্টা ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠতার

আলোকে তাদের **যথাযথ পুরস্কার দিতেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে সক্ষম হতে হবে**। এছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা আমরা এ মুহূর্তে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

বস্তুতঃ ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস কোরআন ও সুন্নাহ্ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কল্পিত সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের কোনটাকেই বাদ না দিয়ে বরং তার সাথে আমরা ক-থেকে চ-পর্যন্ত যে ছয় ধরনের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি তাকেও যোগ করে। এবং আল্লাহ্ পাককেই সেই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র চূড়ান্ত অধিকারী বলে ঘোষণা করে। ইহাই ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদবাদের মূল ও মর্মকথা।

এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অতুলনীয়, পূর্ণাঙ্গ, একক অনাদি-অনন্ত, সর্বাধিক গোপন, সর্বাধিক প্রকাশিত বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর কোন অংশের সমকক্ষ কাউকে কল্পনা করা, মান্য করা ইসলামের দৃষ্টিতে **শিরক বা অংশীবাদরূপে** আখ্যায়িত করা হয়। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ সর্বত্রই এই শিরক বা অংশীবাদের তীব্র সমালোচনামুখর, এটি নিষিদ্ধ ও বাতিল ঘোষিত। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ সার্বভৌম আল্লাহরই কেবল আইন প্রণয়ন করার অধিকার আছে। এরূপ ক্ষমতা অন্য কারও আংশিক বা পূর্ণভাবে আছে এরূপ বিশ্বাস ঈমানের পরিপন্থী, এরূপ মান্য করা ইসলামের পরিপন্থী।

প্রসঙ্গতঃ এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, **ইসলামে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে তুলনা করলে Secular State এর সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত নগণ্য, অস্পষ্ট ও গোলমেলে মনে হয়**। অনুরূপভাবে ইসলামের খিলাফাহ্ ব্যবস্থাও Secular State এর ধারণা থেকে অনেক অনেক বেশী কল্যাণকর এবং মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম আল্লাহ্ পাকের যে সব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করে তা নিম্নরূপ ঃ

১. তিনি অনাদি-অনন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, (অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতির নিদর্শন, প্রমাণ সর্বাধিক এবং সর্বত্র বিরাজিত। অপরদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁকে এ যাবৎ কেউ কখনও অনুভব করেনি) এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। এর প্রমাণ হল সূরাতুল হাদীদ-এর ৩নং আয়াত।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত আবার তিনিই গুপ্ত
এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত (অভিজ্ঞ এবং জ্ঞাত)।[২]

২. তিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, তিনি জাত নহেন এবং কাউকে তিনি জন্মও দেন নি।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا اَحَدٌ ـ

বলুন [হে মোহাম্মদ (স.)]! তিনি আল্লাহ্ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী (অর্থাৎ কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রয়োজন থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত), তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, আবার তিনি নিজে জাতও নহেন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[৩]

৩. لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

কোন কিছুই তাঁর মত নয় এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[৪]

৪. لَا شَرِيْكَ لَهٗ

তাঁর কোন অংশীদার নেই।[৫]

সর্ব ব্যাপারেই তিনি একক কৃতিত্বের অধিকারী। সকল কাজ তাঁর নির্দেশেই হয়। এ ব্যাপারে কারও কোন অংশ নেই, দাবী নেই, তাঁর সকল গুণই পূর্ণাঙ্গ।

৫. سُبْحَانَ اللّٰهِ

পবিত্র মহান, সকল দোষ ত্রুটি-অপূর্ণাঙ্গতা মুক্ত, মহান সত্তা হলেন আল্লাহ্।[৬]

---

২. সূরাতুল হাদীদ, আয়াত নং ৩।
৩. সূরাতুল ইখলাস, সম্পূর্ণ অংশ।
৪. সূরাতুশ্ শূরা, আয়াত নং ১১।
৫. সূরাতুল ফোরকান, আয়াত নং ২।
৬. সূরাতুল ইউসুফ, আয়াত নং ১২।

৬. সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ্‌র গুণাবলী সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ

আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

তিনি **চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী**।

(অনন্ত-অসীম সত্তা, সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্য যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, অথচ সর্ব সত্তার তিনি ধারক তাকেই কাইয়্যুম বলে।)

لاَ تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা।

(অন্য কথায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতিকে যদি তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে তবে তাঁর এই দুর্বল মুহূর্তে তাঁর আইন পালিত বা রক্ষিত হচ্ছে কিনা অথবা কোথাও কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সার্বভৌম ক্ষমতা গাফেল হতে বাধ্য হবে। এমন দোষ-ত্রুটি বা এরূপ আরও অসংখ্য অগণিত দোষ-ত্রুটি যা সমগ্র মানুষ কল্পনা করতে পারে তার থেকে তিনি মহান আল্লাহ্‌ একেবারেই মুক্ত।)

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর।

(অর্থাৎ যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিংবা আমাদের অনুভূতির জগতে বিদ্যমান সে সবের একচ্ছত্র মালিক অধিপতি এই আল্লাহ্‌। এমনকি যা আমাদের ধারণা কল্পনা অনুভূতির অগম্য তারও মালিক তিনি।)

مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ

কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

(তিনি এমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর নিকট সুপারিশ করতে হলেও

সুপারিশকারীকে কার ব্যাপারে কি সুপারিশ, কতখানি সুপারিশ করা হবে তার যেমন অনুমোদন নিতে হবে তেমনি সুপারিশকারীর নিজের সুপারিশ করার যোগ্যতা সম্পর্কেও সেই মহান আল্লাহ্‌ সার্বভৌম সত্তার পূর্ব অনুমোদন আবশ্যক।)

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত।

(অর্থাৎ তিনি এমন সর্বজ্ঞাত, অবহিত যে শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার আগ-পিছুসহ পরিপূর্ণ পরম্পরা তাঁর নখদর্পণে। সত্যিই এমন ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে সার্বভৌম হওয়া অসম্ভব।)

وَلاَ یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلاَّ بِمَا شَآءَ

তিনি (মহান আল্লাহ্‌) যা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে অক্ষম।

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

তাঁর আরশ (আসন, অবস্থান) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।

(আসমান ও যমীনে কোথাও কোন বিন্দুমাত্র স্থান নেই এবং কালের স্রোতে এমন কোন কাল নেই যেখানে যে সময়ে তাঁর মহামহিম উপস্থিতির অভাব অনুভূত হয়েছে কিংবা হবে। বস্তুতঃ এমন সর্ব ব্যাপক সার্বভৌম সত্তার বর্ণনাই আল্লাহ্‌ পাক কোরআনে আমাদেরকে জানাচ্ছেন।)

وَلاَ یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

এতদুভয় (অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সকলের) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত হন না।

(এই সার্বভৌম সত্তা শ্রান্তি-ক্লান্তি-অবসাদ-জড়তা ইত্যাকার দোষ-ত্রুটির উর্ধে। বস্তুতঃ সার্বভৌম সত্তার এসব দোষ-ত্রুটি থাকলে তাঁর এই দুর্বল মুহূর্তে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, বিকাশ সব কিছুই বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।)

وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

তিনিই মহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

(এখানে عَلِيّ এবং عَظِيْمٌ শব্দের পূর্বে اَلْ ব্যবহার করার কারণে এর পরিপূর্ণ ভাবার্থ হলো একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ এবং একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং এ ব্যাপারেও তাঁর কোন তুলনীয় বা অংশীদার নেই।)

৭ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

তিনি তাঁর সকল বান্দাহ্‌র উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। [৭]

(অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ কোথাও কখনও নেই, ছিলনা এবং হবেও না।)

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

তিনি প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞাত। [৮]

(এখানেও حَكِيْم এবং خَبِيْر শব্দ اَلْ যোগে আসায় তার অর্থ হচ্ছে একমাত্র তিনিই প্রজ্ঞাময় এবং একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞাতা। এ ব্যাপারেও কারও কোন অংশ নেই। তিনি সকলের জওয়াবদিহীতা করতে পারেন, অথচ তাঁকে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই, তিনি সকলকে পাকড়াও করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, পুরস্কৃত করতে পারেন। অর্থাৎ সর্ববিষয়েই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর এই ক্ষমতার ব্যবহার তিনি পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারে ন্যায়ানুগভাবে করেন।)

৮. সূরা হাশরের শেষে মহান রব্বুল আলামীন স্বীয় সার্বভৌম সত্তার পরিচয় দিচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ (উপাস্য, আরাধ্য, স্তুতি পাওয়ার যোগ্য, আইনদাতা, শাসনদাতা) নেই।

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ

তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি।

---

৭. সূরাতুল আনআম, আয়াত নং ১৮।
৮. প্রাগুক্ত আয়াত।

اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক। তিনিই একমাত্র পরাক্রমশীল, তিনিই একমাত্র প্রবল, তিনি একাই অতীব মহিমান্বিত।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তারা (ভ্রমবশতঃ) তাঁর সাথে আর যে বা যাদের অংশীদার সাব্যস্ত করে মহান মহিমান্বিত আল্লাহ্ তার বা তাদের থেকে অতীব পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, (অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী সত্তা) ; উদ্ভাবনকর্তা ; (পরিপূর্ণ) রূপদাতা ;

(অর্থাৎ যে সবের কোন প্রকার অস্তিত্বই ছিলনা তার সবের পরিকল্পনাকারী, রূপদাতা, অস্তিত্বে আনয়নকারী মহান নিপুণ ত্রুটিহীন সত্তা তিনিই আল্লাহ্।)

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

সকল উত্তম নাম তাঁরই

(অর্থাৎ তাঁর নামগুলো, তাঁর গুণাবলী যথাযথ, পরিপূর্ণ সর্বাধিক সৌন্দর্যমন্ডিত।)

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৯. তিনি আরও বলেন وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا

সকল কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সকল কিছুর যথাযথ পরিমাণ এবং নিয়ম-বিধান তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। [৯] (তাঁর নির্ধারিত পরিমাণ ও পরিমাপের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই।)

---

৯. সূরাতুল ফোরকান, আয়াত নং ২।

১০. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ

يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ্ ছাড়া এমন স্রষ্টা কি আছেন, যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক (তথা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ)-এর ব্যবস্থা করেন।[১০]

১১. এতদসত্বেও তিনি বলেন,

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوا الْعَرْشِ الْمَزِيْدُ

তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় ; আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।[১১] (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার বাধা হওয়ার সাধ্য কারও কষ্মিনকালেও নেই বা থাকতে পারেনা।)

১২. সূরা ফাতিহাতে তিনি এরশাদ করেন,

رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক;

অতীব দয়ালু ও করুণাময় এবং

শেষ বিচার দিনের অধিপতি।

বস্তুতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে পৃথিবীর সকল জ্ঞানীগণ যতগুলো গুণ বৈশিষ্ট্য কল্পনা করতে পেরেছেন তার চাইতে অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে আল্লাহ্র স্বীয় সত্তা মহিমান্বিত। তাঁর গুণাবলী যে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না তার বর্ণনাও তিনি আমাদের জানাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়, **বলুন (হে মুহাম্মদ)! আমার প্রতিপালকের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে**

১০. সূরাতুল ফাতির, আয়াত নং ৩।
১১. সূরাতুল বুরুয, আয়াত নং ১৪।

আমার প্রতিপালকের গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও এর (অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করার কালির প্রয়োজনে) অনুরূপ আরও সমুদ্র পরিমাণ (কালি) সংযোগ করা হয়।[১২] আমরা পবিত্র কালামে পাক থেকে অল্প কয়টা মাত্র উদ্ধৃতির মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম, পবিত্র কোরআনে এরূপ আরও শত শত বর্ণনা রয়েছে। **এই উপরোক্ত গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার একমাত্র মালিক ঘোষণা করেন**

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

জেনে রাখ, সৃষ্টি যাঁর, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, আইন-বিধান, আদেশ-নিষেধ তার জন্যই নির্দিষ্ট। মহিমময় আল্লাহ্ই জগতসমূহের প্রতিপালক।[১৩]

بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا

বরং আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট সকল 'আমর' বা আদেশ, নির্দেশ, কর্তৃত্ব। (আম্‌র করার অধিকার আর কারও নেই)।[১৪]

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ফয়সালা দেওয়ার অধিকার নেই।[১৫]

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْئٍ

قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ

লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, শাসন কর্তৃত্বের ব্যাপারে, আইন-বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে, আদেশ-নির্দেশ দানের ব্যাপারে (তাদের) আমাদের কোন করণীয় আছে কিনা। বলুন (হে মুহাম্মদ)! আইন-বিধান, শাসন-কর্তৃত্ব, আদেশ-নির্দেশ নামে যা আছে তার সবই আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট (এ বিষয়ে তোমাদের কোনই অধিকার নেই)।[১৬]

১২. সূরাতুল কাহাফ, আয়াত নং ১০৯।
১৩. সূরাতুল আ'রাফ, আয়াত নং ৪৫।
১৪. সূরাতুর রা'দ, আয়াত নং ৩১।
১৫. সূরাতুল আনআম, আয়াত নং ৫৭।
১৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৫৪।

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

শাসন-কর্তৃত্বের অধিকার আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত- শুরুতে এবং শেষেও।[১৭]

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ اِلٰهٌ

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

তিনিই আসমানের ইলাহ্, আর তিনি যমীনেও ইলাহ্।[১৮] (অর্থাৎ আসমান যমীন সর্বত্র তিনিই সার্বভৌম। তাঁর বিধানই মান্য হয়। তিনিই আইন বিধানের একক উৎস এবং তিনি বিচক্ষণ জ্ঞানী)।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْأَرْضِ

আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন।[১৯]

বস্তুতঃ মানুষের কি প্রয়োজন, কিসে তার কল্যাণ, কিসে তার অকল্যাণ, কোন নিয়ম-বিধানে তার পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব, কোন বিধানে তার সফলতা সুনিশ্চিত এ বিষয়ে যেই সত্তা সর্বাধিক জ্ঞাত; তিনিই কেবল অধিকার রাখেন আইন প্রণয়নের। যিনি সার্বভৌম সত্তা হবেন তিনি কোন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হতে পারবেন না। যদি তিনি প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হন তাহলে তিনি সে প্রয়োজনের নিকট বাধ্য থাকবেন। সুতরাং এটি সার্বভৌমত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেয়। তাই اَلصَّمَدُ (বা সর্বপ্রকার প্রয়োজনের অমুখাপেক্ষী) আল্লাহ্ সার্বভৌমত্বের সকল বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত হয়ে ঘোষণা করছেন ঃ

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

তিনিই কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন ! বরং তিনিতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে খবর রাখেন।[২০]

জাঁ বোদা, অষ্টিনসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঠিকই বলেছেন যে সার্বভৌমত্বের আদেশই আইন এবং সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন করা। পবিত্র

১৭. সূরা আর রুম, আয়াত নং ৪।
১৮. সূরাতুল যুখরুফ, আয়াত নং ৮৩।
১৯. সূরাতুস্ সিজদাহ্, আয়াত নং ৫।
২০. সূরাতুল মুলক, আয়াত নং ১৪।

কোরআনও তাই আল্লাহ্‌কে সার্বভৌমত্বের সকল বিশেষণে বিশেষায়িত করে তাঁর জন্যই সকল "আমর" বা শাসন-কর্তৃত্ব, আদেশ-নিষেধের অধিকার এবং যাবতীয় আইন-বিধান প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিকারী ঘোষণা করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার সকল বিবেকবান যে সার্বজনীন কল্যাণমুখী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, অষ্টিন, জাঁবোদাসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক প্রণীত আইনের আকাঙ্ক্ষা করেছেন তার বাস্তব ও পরিপূর্ণ চিত্র পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে চিত্রায়িত হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ্ এই আইনের নিকট **আত্মসমর্পণ** না করাকে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অনুসরণকে ধিক্কার জানিয়েছে। এই আইন ছাড়া অন্য আইনের শাসনকে তাগুতের শাসন বলে প্রত্যাখান করেছে। এই আইনের সাথে অন্য আইনের মিশ্রণকে **শিরক** বলেছে। এ আইন মানা না মানার মাঝামাঝি অবস্থানকে যথাযথ **কুফরি** বলেছে। **কোরআন আরও দাবী করছে এ আত্মসমর্পণের ঘোষণা মানবজাতির যমীনে বিচরণের শুরু থেকেই চলে আসছে এবং কিয়ামত (শেষ প্রলয়) দিবস পর্যন্ত এ ঘোষণা বলবৎ থাকবে। তার প্রমাণ -**

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

আমরা সকল জাতি-গোষ্ঠির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি (যাতে তারা নির্দেশ দেয় যে) তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক ।[২১]

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সকল আদেশ-কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট।[২২]

এমনকি আদম (আঃ)-কে দুনিয়াতে পাঠানোর মুহূর্তেই বলা হচ্ছে,

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ

২১. সূরা আন নাহ্‌ল, আয়াত নং ৩৬।
২২. সূরাতুর রুম, আয়াত নং ৪।

فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমি এই নির্দেশ দিলাম এখান থেকে (বেহেশ্ত থেকে) তোমরা সকলে বের হয়ে যাও। অতঃপর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট যে পথ ও পন্থা আসবে তার অনুসরণ করলে তোমাদের জন্য চিন্তা ও ভয়ের কারণ থাকবেনা।[২৩]

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের ভ্রম

আমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছাড়া বাকী সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, নেতা ও আইন-বিধান প্রবর্তক তিনটি প্রধান ভুল করেছেন।

তারা **প্রথমতঃ** সার্বভৌমত্বের অপূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** তারা এ সার্বভৌম ক্ষমতাকে কখনও রাজা বা শাসকের খাম-খেয়ালীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমনটি করেছেন টমাস হবস-এর ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। আবার কখনও তাকে ন্যস্ত করেছেন "রাষ্ট্র" নামক বিমূর্ত ধারণার উপর যেমনটি করেছেন জাঁ বোদা এবং অষ্টিন। রাজকীয় স্বেচ্ছাচার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অসংগত ব্যবহার যখন সমাজে অন্যায়, অনাচার, জুলুম, অশান্তির কারণরূপে প্রতিভাত হলো তখনই শোনা গেল **জন লকের "সীমিত সার্বভৌমত্ব"** এবং **রুশোর "জনগণের সার্বভৌমত্বের"** কথা। তাতেও যখন সমস্যার সমাধান করা গেলনা তখন জেরেমী **বেন্থাম আসলেন সর্বাধিক কল্যাণ সম্ভাব্য সর্বজনের জন্য এমন সামজিক চুক্তির তত্ত্ব নিয়ে।** এদিকে বেচারা ল্যাস্কি সার্বভৌম তত্ত্বের প্রতি শেষ পর্যন্ত চরম বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন, **"সার্বভৌমত্বের আইনসঙ্গত তত্ত্ব রাজনৈতিক দর্শনের উপযোগী নয়। আন্তর্জাতিক দিক থেকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা মানব জাতির কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিলোপ সাধন ব্যতীত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন যাপন সম্ভব নয়।"** [২৪]

---

২৩. সূরাতুল বাকারাহ, আয়াত নং ৩৮।

২৪. আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভূমিকা ঃ অধ্যাপক নির্মল কান্তি ঘোষ, পৃষ্ঠা নং ১৮৩ । আসলে "সার্বভৌমত্ব" সম্পর্কে আলোচনায় প্রায় সকল রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বই-ই কম বেশি উপরোক্ত বইটির ন্যায়ই আলোচনা উপস্থাপন করে। তাদের সীমাহীন অজ্ঞতার তুলনায় কোরআন ও সুন্নাহ্ যে সর্বাধিক আলোকিত আইন শাস্ত্র উপহার দিয়েছে তার সম্পর্কে কোন আলোচনাই তারা করেন না।

তৃতীয় ঃ মারাত্মক ভুল হলো এ সব মহাবিখ্যাত রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মানব সমাজের আইন, আইনের উৎস সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে অসচেতনতা। তারা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলেন ১৫৭৬ সনে জাঁ বোদাই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। অথচ পবিত্র কোরআনে সার্বভৌমত্বের ধারণা কত ব্যাপকভাবে কত সুষ্ঠুভাবে কত যুক্তি সহকারে খৃষ্টীয় ৬১০ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক সময়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা আমরা দেখেছি। আমরা ইস্সেনীদের ইতিহাস জানি যারা খৃষ্টপূর্ব কয়েক সহস্র বছর ব্যাপী সময় ধরে একমাত্র জিহোভাকেই আইনের উৎস মনে করত এবং ঐ আইন ছাড়া অন্য আইন মানাকে ধ্বংস হওয়ার সমতুল্য মনে করত। তাঁদের সম্পর্কে এই বইয়ের পরিশিষ্টে 'হযরত ঈসা (আ.) ঃ নবুওয়্যাতপূর্ব জীবন' শিরোনামে একান্ত নির্ভরযোগ্য আলোচনা উপস্থিত করা গেল। তাছাড়া চার্চের কর্তৃত্ব যে সার্বভৌম স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের বিকৃত ব্যবহার তাও তারা এড়িয়ে গেলেন। আসলে এ সব স্রষ্টা-বিমুখ, তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ কিংবা ধর্ম অস্বীকারকারী পন্ডিতবর্গ এক যোগে অনেক মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

তাদের সমবেত মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হয়ে মুসলিম নামধারী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীও কোরআন ও সুন্নাহ্ যে সার্বভৌম সত্তা ও তার দেয় আইনের বিস্তৃত উপস্থাপন করেছে তা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে বসেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত আলেমদের গাফিলতিও কিছুমাত্র কম দায়ী নয়। আমাদের আলেমদের বর্তমান অপ্রস্তুতির একটা যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। সে বিষয়ে ইতোপূর্বে কুফর ও কাফির এর আলোচনা আশা করি কিঞ্চিত ইশারা করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত অংশ (যেখানে আমাদের মেধাবীদের ৯০% এর বেশি উপস্থিত তাঁরা) বিষয়টিকে যদি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন ইন্শাআল্লাহ্ অচিরেই আমাদের সমাজের চিন্তা-চেতনার যাবতীয় জড়তা কেটে যাবে।

তৌহিদের নির্মল ঝর্ণায় আজ শিরক, নিফাক ও কুফরের যে আগাছা জন্মাচ্ছে, বাড়ছে এবং পথ রুদ্ধ করছে তার মূল কারণ পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক উপস্থাপিত আইন শাস্ত্র, আইনের উৎস সার্বভৌম আল্লাহ্ এবং সৃষ্টির ইতিহাসে এই আইন শাস্ত্রের সরব উপস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ মনোযোগ না দেয়া।

বস্তুতঃ কোরআনে উপস্থাপিত সার্বভৌম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার করেই তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্র, সরকার, পার্লামেন্ট ও আইন সভাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এর সাথে সহযোগিতা কিংবা আরও অগ্রসর হয়ে যারা ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করছেন তারা তৌহিদের পাদমূলে কুঠারাঘাত করেই তা করছেন। তারা বুঝেন বা না বুঝেন, তারা শুনেন বা না শুনেন তাতে কিছুই যায় আসেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বর্তমান ভূমিকা ত্যাগ করে তওবা করে আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে না আসছেন ততক্ষণ তারা যে শিরক, কুফর ও নিফাক-এর পঙ্কিলতায় ডুবে রয়েছেন তা নিশ্চিত চিত্তেই বলা যায়।

- ❑ নবী আদর্শের খিলাফাহ্
    - মানুষ ঃ প্রকৃত অবস্থান
    - খিলাফাহ্
    - খিলাফাতু রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য
        - নির্বাচনী খিলাফাত
        - শূরাভিত্তিক সরকার
        - বায়তুলমাল একটি আমানত
        - রাষ্ট্রের ধারণা
        - আইনের প্রাধান্য
        - বংশ-গোত্রের পক্ষপাতমুক্ত শাসন
        - গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

নবী আদর্শের খিলাফাহ্

আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে কিছু ভাই ভ্রমবশত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণের সোপান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত কম দোষের সাব্যস্ত করেছেন এবং ইসলামে গণতন্ত্র আছে, এরূপ বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য কোরআন-হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এ অধ্যায়ে আমরা তাঁদের ভুল অপনোদনের জন্য প্রথমতঃ খিলাফাহ্ এবং শূ'রা বাইনাহুম-এর পরিচয় তুলে ধরবো।

মানুষ ঃ প্রকৃত অবস্থান

এ বিশ্বে মানুষের অবস্থান কি, তার পরিচয় কি, কোন উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি; ইত্যাকার চিরন্তন প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সব দর্শনে এবং সব দ্বীন-ধর্মে। দর্শন নিরেট বিজ্ঞান এবং যুক্তিনির্ভর, অন্যদিকে দ্বীন-ধর্ম আবেগ নির্ভর। তবে উভয়ের সীমানা একদম আলাদারূপে চিহ্নিত নেই। দ্বীন-ধর্ম ও দর্শনের বিচার্য বিষয়সমূহের মধ্যে মানুষের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাতে সন্দেহ নেই।

ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত দীন। এখানে মানুষের এ দুনিয়াতে অবস্থানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। যুক্তি-বিচার-অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করলে পবিত্র কোরআনে মানুষ সম্পর্কে যে সব ঘোষণা রয়েছে এবং আল্লাহ্র রাসূল (স.) যা বলেছেন তাতে মানবীয় মর্যাদার এমন এক সুউচ্চ অবস্থান পরিলক্ষিত হয় যা বস্তুবাদী দর্শন তো দূরে থাকুক অন্য কোন দীন-ধর্মও তার সমপর্যায়ের কিংবা তুলনীয় পর্যায়ের ধারণা উপস্থাপন করতে অক্ষম।

আসমান জমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুর উপরেই মানুষের স্থান। সব কিছুকে নিজ সুবিধামত কিংবা ইচ্ছামত ব্যবহার করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে মানুষকে এবং তার জন্য সে অধিকার লিখিতভাবে ঘোষিত হয়ে আছে। এ বিশ্বে মানুষ কেবল আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ দাস, আর সব কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করার শর্তেই তাকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। দাসত্ব না

করলেও বর্তমান জীবনে মানুষ তা ব্যবহার করতে পারবে, তবে তা হবে অবাধ্য অবস্থা। এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হবে না। অপর দিকে দাসত্ব কবুল করে নিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পুরস্কার লাভের ঘোষণা রয়েছে পাক কোরআনে এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ্‌তে। এ বিষয়ে প্রমাণপঞ্জি নিম্নরূপে ঃ

খিলাফাহ্

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

(সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে অবশ্যই আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।[১]

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক মানব সৃষ্টির বৃত্তান্ত পেশ করার জন্য যে শব্দ চয়ন করেছেন তাতে তিনি মানুষকে তাঁর خَلِيْفَة বলে অভিহিত করেছেন। খলিফাহ্ শব্দের বাংলা অর্থ প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের সাথে সম্পর্ক নিয়মতান্ত্রিকভাবে রক্ষা করার জন্য সেখানে তাদের গভর্নর বা প্রতিনিধি পাঠায়। এখানে গভর্নর শব্দটি যে ধারণা পেশ করে উপরোক্ত আয়াতে কারীমাহ্‌তে خَلِيْفَة শব্দটি ঐ একই ধারণা পেশ করে। خَلِيْفَة-র মর্যাদা এবং গুরুত্ব নির্ভর করে তিনি কার খলিফাহ্ তার উপর। যেমন বাংলাদেশের একজন গভর্নর এবং জাপানের একজন গভর্নরের গুরুত্ব ও মর্যাদায় দুনিয়ার দৃষ্টিতে অবশ্যই পার্থক্য আছে। মহান স্রষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক তাঁর পক্ষ থেকে যিনি গভর্নর বা খলিফাহ্ তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্ব কতখানি তা আন্দাজ-অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। যিনি যত বড় মর্যাদাবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তিনি তত বেশি দায়িত্ববান এবং যত্নশীল। সুতরাং এই বিশ্ব চরাচরে মানুষকে আল্লাহ্ পাক সবচাইতে মর্যাদাশীল এবং দায়িত্ববান করে পাঠিয়েছেন। মানুষ আল্লাহ্‌র যমীনে শুধু নয় বরং সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে। গভর্নরের প্রতিটি কথা ও কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তা ও কর্মকে প্রতিফলিত করতে বাধ্য। যদি কোন অবাধ্য গভর্নর তার সরকারের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হন তার প্রতি তার সরকার যেমন অসন্তুষ্ট হন,

১. সূরাতুল বাকারাহ্ আয়াত নং ৩০।

তেমনি আল্লাহ্‌পাকও তাঁর অবাধ্য খলিফার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অপরদিকে যে গভর্নর যত বেশি যত্ন সহকারে কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তা ও দর্শনকে প্রদেশের জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে পারে তার পুরস্কারও তার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সন্তুষ্টি তত বেশি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌পাকও তাঁর অনুগত খলিফাহ্‌কে পুরস্কৃত করেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। খলিফার পদটির নাম خِلَافَة বা খিলাফাহ্।

যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌পাক মানুষকে যমীনে পাঠিয়েছেন সে উদ্দেশ্যের পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় তখন, যখন মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফাহ্ হিসাবে যমীনে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (স.) যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে দশ বছর তার দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হচ্ছে নবী আদর্শের খিলাফাহ্। কোন আন্দোলন কেবল তখনই ইসলামি আন্দোলন নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য যখন তা এই নবী আদর্শের খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত করে, তা পরিচালনা করে এবং খিলাফাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

প্রতিটি সরকার তার গভর্নরকে সরকারের ভূমিকা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, যাতে প্রতিনিধি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। আল্লাহ্ পাকও মানুষকে স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুকে তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন করা হল। নিশ্চিতই চিন্তাশীল লোকদের জন্য এখানে অনেকগুলো নিদর্শন রয়েছে।[২]

আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ের উপরেই যে মানুষের কল্যাণ লাভের অধিকার দিয়েছেন এবং মানুষকে মর্যাদাবান করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে কথা বোঝানোর জন্য مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর পর جَمِيْعًا مِّنْهُ কথাটা যোগ করে দিয়েছেন। এর অর্থ আস্‌মান যমীনে যা আছে তার সবকিছুর উপরই মানুষের ক্ষমতা কর্তৃত্বের ও স্বেচ্ছা ব্যবহারের অধিকার ঘোষিত হওয়া, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে

২. সূরা আল জাসিয়া, আয়াত নং ১৩।

এমন সম্ভাবনা দেয়া হয়েছে যে, সে সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে বৃহৎ হতে বৃহত্তর সব কিছুই তার কল্যাণে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে। একটু কল্পনা করুন, ইসলাম মানুষকে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে দুনিয়ায় অন্য কোন চিন্তা, মতাদর্শ, দীন-ধর্ম তার নিকটেও যেতে পারেনি। যে আল্লাহ্ মানুষকে এ মর্যাদা দিয়েছেন তিনিই মানুষকে কেবল তাঁর মুখাপেক্ষী করেছেন এবং কেবল তাঁর দাসত্ব স্বীকার করতে বলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ

হে মানবমন্ডলী, তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব করো।[৩]

তিনি আরও বলেন-

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার দাসত্ব করা ছাড়া অন্য কোন কাজে সৃষ্টি করিনি।[৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় এ বিশ্ব চরাচরে মানুষ কেবল আল্লাহ্‌রই মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই গোলাম, এ ছাড়া সৃষ্টির আর সব কিছু তার প্রয়োজন পূরণের জন্য, তার ব্যবহারের আওতায়। এটি মহান রব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া এবং রহমত মানবজাতির উপর।

সুতরাং এই রবের দাসত্ব করাই এই আবদ্-এর একমাত্র কর্তব্য। অর্থাৎ যমীনের বুকে যমীনের স্রষ্টা খলিফারূপী যে মানুষকে পাঠিয়েছেন তার ন্যূনতম কর্তব্যবোধের দায়িত্ব হচ্ছে এই যমীনে রবের খিলাফাহ্ কায়েম করা। ইসলাম এই খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার কথাই বলে। ইসলামের খাঁটি অনুসারীরা যমীনে আল্লাহ্‌র খিলাফাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব কায়েম করে। প্রতিনিধির দায়িত্ব হলো প্রথমে সে যার প্রতিনিধি হয়ে এসেছে তার সঠিক পরিচয় তুলে ধরা। তাই মানুষের দায়িত্ব হলো যমীনে আল্লাহ্‌র পরিচয় তুলে ধরা, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে ঘোষণা করা।

আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ

৩. সূরাতুল বাকারাহ্, আয়াত নং ২১।
৪. সূরা আল জারিয়াত, আয়াত নং ৫৬।

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

(এ ঈমানদারদের অবস্থা এমন যে)
আমি যদি তাদেরকে যমিনে প্রতিষ্ঠিত করি
তারা সলাত কায়েম করে
যাকাত ব্যবস্থার প্রচলন করে
সৎ কাজের আদেশ করে অসৎ কার্য নিষেধ করে
আর সকল আদেশ কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট।[৫]

সলাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বান্দাহ্ আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের নিকট তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং জগদ্বাসীর নিকট এই চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের দাওয়াত পেশ করে। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে বঞ্চিত ও অক্ষমদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবানীর বাস্তব নিদর্শন তুলে ধরে। সৎ কার্যের আদেশের মাধ্যমে যমীনে সকল কল্যাণমূলক কাজের প্রসার ঘটায়। অসৎকাজের প্রতি বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন দূর করে। এসব ক্ষেত্রেই আদেশ ও কর্তৃত্বের মালিক যে আল্লাহ্ সে কথা ঘোষণা করে। **মানব জাতির সকলেই আল্লাহ্‌র খলিফাহ্। যারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছে তারা সকলে বৈধ খলিফাহ্। যেহেতু তাদের মর্যাদা খলিফাহ্ হিসাবে একই, তাই তারা পরস্পরে পরামর্শ করে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত করে।** এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সম্পর্কে যার সচেতনতা যত বেশি তাকে তত বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি সচেতনগণ পরামর্শের মাধ্যমে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন তার বর্ণনাই নিম্নে দেয়া হলোঃ

আল্লাহ বলেন–

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

এবং তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে তাদের কার্য সম্পাদন করে।[৬]

৫. সূরাতুল হজ্জ্ব, আয়াত নং ৪১।
৬. সূরা আশ্ শুআরা, আয়াত নং ৩৮

وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الْاَمْرِ

এবং কাজে-কর্মে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।[৭]

আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) বলেছেন,

رُوِىَ اِبْنِ مَرْدُوِيَّةُ مِنْ عَلِى ابْنِ اَبِىْ طَالِبِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْمِ قَالَ مُشَاوَرَةُ اَهْلُ الرَّاىِ ثُمَّ اِتِّبَاعَهُمْ

ইবনে মারদুইয়্যা থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো "আযম" (সিদ্ধান্ত গ্রহণ) সম্পর্কে। তিনি বললেন "আহ্‌লুররাই"দের (অর্থাৎ যারা বিচক্ষণ এবং বর্ণিত বিষয়ে কার্যকর মত প্রকাশে সক্ষম এমন লোকদের) সাথে পরামর্শ গ্রহণ কর এবং তাদের অনুসরণ কর।[৮]

২. বায়হাকীতে উল্লেখ আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়াত করেন।

৩. ইমাম বোখারী আল-আদাবুল মোফ্‌ররাদাতে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন–

مَاتَشَاوُرُ قَوْمٌ قَطُّ اِلَّاهُدُوْا لِاِرْشَادِ اَمْرِهِمْ

যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে
তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথ-নির্দেশ দান করা হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاكَانَ اُمَرَاءُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سَمْحَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنُكُمْ فَظَهْرِ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنَ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا

৭. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নং ১৫৯।

৮. তফসীরুল কুরআনুল আজীম; হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর; ১ম খন্ড; পৃষ্ঠা ৪২০; দারত্তোরাস আল আরাবী; কায়রো।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে ততদিন ভূপৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে তোমাদের শাসকবর্গ যখন তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজ-কর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।[৯]

হাদিস-এর প্রথম অংশে যেখানে আল্লাহর রাসূল (স.) আমাদের জীবিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন, সে সময় ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ; **খোলাফায়ে রাশেদার যুগ**। আর যে অংশে আল্লাহর রাসূল (স.) আমাদের কবরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সে সময় **আমাদের বর্তমান সময়**। কি আশ্চর্য ঐ খোলাফায়ে রাশেদার যুগে সাহাবীগণ শাহাদাত লাভের জন্য উদগ্রীব ছিলেন এবং মতান্তরে দেখা যায় ৯০% সাহাবী শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন, আর বর্তমানে আমাদের ক'জনের অন্তরে শাহাদাত লাভের অদম্য আগ্রহ আছে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অথচ **এই হাদিসের বক্তব্যানুযায়ী এখন শাহাদাতের অদম্য আগ্রহ থাকাটাই আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পরামর্শ**।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেছেন لَا خِلَافَةَ اِلَّا عَنْ مَشْوَرَةٍ অর্থাৎ পরামর্শকরণ ব্যতীত খেলাফত হতে পারে না। (কানযুল উম্মাল)

উপরোল্লিখিত কোরআনের আয়াত, হাদিস এবং সাহাবীদের বক্তব্যে **গণতন্ত্রের সমপর্যায়ের** কোন শব্দ উল্লিখিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে **شُوْرٰى (পরামর্শ সভা)** শব্দ উল্লেখ হয়েছে।

প্রথমে উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনদের গুণাবলী হিসেবে বলা হয়েছে তারা যেন তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। অপর আয়াতে পরামর্শ করার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (রা.)-এর থেকে বর্ণিত হাদিসে **"বিচক্ষণ ও বর্ণিত বিষয়ে কার্যকর মত প্রকাশে সক্ষম এমন লোকদের পরামর্শ মত কাজ করার"** মাধ্যমে উম্মতের **"সবার"** নয়; বরং **"আহ্‌লুর**

৯. ইমাম তিরমিযী এটাকে সহী সনদে তাঁর মুসরাদে উল্লেখ করেছেন।

রাইদের" জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। **গণতন্ত্র** যেখানে শিক্ষিত-মূর্খ, চরিত্রবান-চরিত্রহীন, আমানতদার-খেয়ানতকারী নির্বিশেষে সবার মাথাপিছু এক ভোট হিসাব করে; মিথ্যা প্রচারণার অপকৌশলের দ্বার উন্মুক্ত করে; অস্ত্রবল, বাহুবল, হুমকি প্রতারণার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে; তথাকথিত জন-রায়ের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে, **তার সাথে شُوْرٰى কিংবা مَجْلِسُ شُوْرٰى এর ন্যূনতম কোন তুলনাই হয় না।**

ইসলামে শূ'রা-এর অবস্থান কি তা ইতোপূর্বে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেখানে কোরআনের ফয়সালা নেই, রাসূল (স.)-এর নির্দেশনা নেই, কেবল সেই ক্ষেত্রেই শূ'রা হবে এবং তা কেবল আহ্লুর রাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। **চরিত্রহীন, অশিক্ষিত, মূর্খ, বাহুবল প্রদর্শনকারী, লম্পট, প্রতারণাকারীদের রায় দেয়ার কোন অধিকারই ইসলামি ব্যবস্থায় নেই।** কোরআন-হাদিস যে ফয়সালা দিয়েছে, সে ব্যাপারে শূ'রা-এর কিছুই করণীয় নেই। শূ'রা ঐ সব ফয়সালার বাস্তবায়ন পদ্ধতি আলোচনা করে মাত্র। অর্থাৎ **ইসলাম شُوْرٰى -কে কখনই সার্বভৌম করেনি** এবং **شُوْرٰى গঠনে সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করেনি।** গণতন্ত্রে নির্বাচিত পার্লামেন্ট যে আইন প্রণয়ন করে তা যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বান্দাহদের নিয়ন্ত্রণ করার দাবী করে তা আল্লাহ পাকের ঘোষণাসমূহের মাধ্যমে নাকচ হয়ে গেছে। যেখানে বলা হয়েছে–

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْئٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

লোকেরা বলে শাসন-কর্তৃত্বের ব্যাপারে আমাদের কোন অংশ আছে কি? বলুন, শাসন-কর্তৃত্বের সর্বাংশই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।[১০]

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

সাবধান! সৃষ্টি যার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব তার।[১১]

উপরোক্ত দু'টি ঘোষণা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর ঘোষণার সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যশীল। শাসন-কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কিংবা সংস্থাকে ইসলাম কোন অধিকার দেয় না। সেখানে এক আল্লাহ সার্বভৌম, জনগণ নয়।

১০. সূরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৫৪।
১১. সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ৫৪।

সুতরাং **শাসনতন্ত্র প্রণয়নের** ক্ষেত্রে শূ'রা-এর কোন ভূমিকা নেই। আল্লাহ্র নবী (স.) আমাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর আদর্শ **খিলাফাহ্** ব্যবস্থায় ক্ষমতা যেভাবে হস্তান্তর হয় এবং আদর্শ খলিফাহ্গণ এই ক্ষমতার চর্চাকে যেভাবে দেখেছেন তার বর্ণনা দেয়া যাচ্ছে।

খিলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য

এ বিষয়ে আমরা মাওলানা মওদূদী (র.)-এর 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র' বই এর 'খেলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য' অধ্যায় পরিপূর্ণ সংযোজন করছি। আমাদের দৃষ্টিতে দলিল প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে মাওলানার এ লেখা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে হযরত (স.) কোন ফায়সালা না দিয়ে গেলেও **ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক খেলাফত দাবী করে**– মুসলিম সমাজের সদস্যরা এ কথা অবগত ছিল। তাই সেখানে কোন বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। খেলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা-তদবীর করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগণ তাদের স্বাধীন মর্জিমতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাতও এ খেলাফতকে **খিলাফতে রাশেদা (সত্যাশ্রয়ী খিলাফত)** বলে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিল খেলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি।

এক ঃ নির্বাচনী খিলাফত

নবী করীম (স.)-এর স্থলভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর (রা.) হযরত আবুবকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। মদীনার সকলেই **(বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশে প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন)** কোন প্রকার চাপ-প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে পছন্দ করেন তাঁর হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করেন।

হযরত আবুবকর (রা.) তাঁর ওফাতকালে হযরত ওমর (রা.)-এর সম্পর্কে ওসিয়াত লিখান, অতঃপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেনঃ

"আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার ওপর সন্তুষ্ট? আল্লাহর শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার

কোন আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।" সবাই সমস্বরে বলে ওঠে ঃ আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[১২]

হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের শেষ বছর হজ্জের সময় এক ব্যক্তি বললো ঃ ওমর (রা.) মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বায়আত করবো। কারণ, আবু বকর (রা.)-এর বায়আতও তো হঠাৎই হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছেন।[১৩] হযরত ওমর (রা.) এ সম্পর্কে জানতে পেরে বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমি এক ভাষণ দেবো। জনগণের ওপর যারা জোরপূর্বক নিজদেরকে চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তাদের সম্পর্কে আমি জনগণকে সতর্ক করে দেবো। মদিনায় পৌছে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাকীফায়ে বনী-সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হযরত আবুবকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করে আমি তাঁর হাতে বায়আত করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ তখন যদি এ রকম না করতাম এবং খেলাফতের মীমাংসা না করেই আমরা মজলিস ছেড়ে উঠে আসতাম, তবে রাতারাতি লোকদের কোন ভুল সিদ্ধান্ত করে বসার আশংকা ছিল। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং তা পরিবর্তন করা - উভয়ই আমাদের জন্য কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্যমন্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য একে নজীর হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আবুবকর (রা.)-এর মত উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? **এখন কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বায়আত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বায়আত করা হবে– উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।**[১৪] তাঁর

১২. আত্তাবারী - তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা–৬১৮। আল-মাতবাআতুল ইস্তেকামা, কায়রো ১৯৩৯।

১৩. তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সাকীফায়ে বনী-সায়েদার মজলিসে হযরত ওমর (রা.) হঠাৎ দাঁড়িয়ে হযরত আবুবকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁর হাতে বায়আত করেছেন। তাঁকে খলীফা করার ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোন পরামর্শ করেননি।

১৪. বুখারী, কিতাবুল মোহারেবীন, অধ্যায়–১৬। মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর -৩৯১। তৃতীয় সংস্করণ, দারুল মাআরেফ, মিসর ১৯৪৯। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.)-এর শব্দগুলো ছিল এই ঃ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোন আমীরের হাতে বায়আত করে, তার কোন বায়আত নেই।' অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.)-এর এ বাক্যও দেখা যায়– পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে এমারাত দেয়া হলে তা কবুল করা তার জন্য হালাল নয়।– (ইবনে হাযার, ফতহুলবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা -১২৫, আল-মাতবায়াতুল খাইরিয়া, কায়রো, ১৩২৫ হিজরী)।

নিজের ব্যাখ্যা করা এ পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) খেলাফতের ফায়সালা করার জন্য তাঁর ওফাতকালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেন ঃ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো। খেলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খেলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন।[১৫] **ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়।** হযরত ওমর (রা.)-এর মতে এরা ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে **প্রভাবশালী** এবং **জনপ্রিয়**।

কমিটির সদস্য আবদুর রহমান (রা.) ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলিফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত ওসমান (রা.)-এর পক্ষে।[১৬] তাই তাকেই খেলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তার বায়আত হয়।

হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ **"এমন করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা তো শূরার সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ।** তারা যাঁকে খলিফা করতে চান, তিনিই খলিফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবো।"[১৭] তাবারী হযরত আলী (রা.)-এর যে বক্তব্য উদ্বৃত্ত করেছে, তা হচ্ছে ঃ "গোপনে আমার বায়আত অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জি অনুযায়ী।"[১৮]

১৫. আত্তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ২৯২। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫। ইদারাতুত তিবআতিল মুনীরিয়া, মিসর, ১৩৫৬ হিজরী। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৩৪৪, বৈরুত সংস্করণ। ১৯৫৭ ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা – ৪৯।

১৬. আত্তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ২৯৬। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৩৬। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা–১৪৬।

১৭. ইবনে কোতায়বা, আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা–৪১।

১৮. আত্তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৪৫০।

হযরত আলী (রা.)-এর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হযরত হাসান (রা.)-এর হাতে বায়আত করবো? জবাবে তিনি বলেন, "আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছি না, নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালোভাবে বিবেচনা করতে পারো।" [১৯] তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসিয়াত করেছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, 'আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন'? জবাবে তিনি বলেন ঃ "আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"[২০]

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খেলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূলল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খেলাফত একটা পরামর্শভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খেলাফত নয়, বরং তা **বাদশাহী– রাজতন্ত্র।** খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কেরামগণ পোষণ করতেন, **হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ**

اِنَّ الْاِمَارَةَ مَا اُوْتُمِرَ فِيْهَا وَاِنَّ الْمُلْكَ مَا غُلِبَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ـ

এমারাত (অর্থাৎ খেলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র। [২১]

দুই ঃ শূরাভিত্তিক সরকার

এ চারজন খলিফা সরকারের কার্যনির্বাহ এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কাজ করতেন না।

১৯. আত্‌তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা– ১১২। আল-মাসউদী, মরুজুয্ যাহাব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা– ৪৬। আল-মাতবাআতুল বাহিয়্যা, মিসর, ২৪৬ হিজরী।
২০. ইবনে কাসীর, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা –১৩-১৪ মাতবাআতুস সাআদাত, মিসর। আল-মাউদি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা –৪৬।
২১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা– ১১৩।

সুনানে দারামীতে হযরত মায়মুন ইবনে মাহরানের একটি বর্ণনা আছে যে, **হযরত আবু বকর (রা.)-এর নীতি ছিল, তাঁর সামনে কোন বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহর কেতাব কি বলে। সেখানে কোন নির্দেশ না পেলে এ ধরনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) কি ফায়সালা দিয়েছেন, তা জানতে চেষ্টা করতেন। রাসূলের সুন্নাহ্‌তেও কোন নির্দেশ না পেলে জাতীয় শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরার্মশ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে মতই স্থির হতো, তদনুযায়ী ফয়সালা করতেন।**[২২] হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মনীতিও ছিল অনুরূপ।[২৩]

পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শূ'রার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার প্রদান। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খেলাফতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এইরূপে ঃ

"আমি আপনাদেরকে যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আপনাদের কার্যাদির আমানতের যে ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সঙ্গে শরীক হবেন। আমি আপনাদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন; আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনাদের যে আমার মতামতকে সমর্থন করতে হবে– এমন কোন কথা নেই এবং আমি তা চাই-ও না।"[২৪]

তিন ঃ বায়তুলমাল একটি আমানত

তাঁরা বায়তুলমালকে আল্লাহ এবং জনগণের *আমানত* মনে করতেন। বেআইনীভাবে বায়তুলমালের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা ও বেআইনীভাবে তা থেকে কিছু বের হয়ে যাওয়াকে তাঁরা জায়েয মনে করতেন না। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থে বায়তুলমাল ব্যবহার তাঁদের মতে হারাম ছিল। তাঁদের মতে খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যই ছিল এই যে, রাজা-বাদশাহরা জাতীয় ভান্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজেদের খাহেশ মত স্বাধীনভাবে তাতে

২২. সুনানে দারামী, বাবুল ফুতইয়া ওয়ামা ফিহে মিনাশ শিদ্দাতে।
২৩. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদিস– ২২৮১।
২৪. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা– ২৫।

তসরুফ করত, খলিফা তাকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানত মনে করে সত্য-ন্যায়-নীতি মোতাবেক এক একটি পাই-পয়সা উসুল করতেন, আর তা ব্যয়ও করতেন সত্য-ন্যায়-নীতি অনুসারে। **হযরত ওমর (রা.) একদা হযরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি বাদশাহ, না খলিফা?" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন ঃ "মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দেরহামও অন্যায়ভাবে উসুল এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলিফা নন বাদশাহ।"** অপর এক প্রসঙ্গে একদা হযরত ওমর (রা.) স্বীয় মজলিসে বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে, আমি বাদশাহ, না খলিফা। আমি যদি বাদশাহ হয়ে গিয়ে থাকি তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা!" এতে জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীন! এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।" হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য? তিনি বললেন ঃ **"খলিফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহণ করেন না, অন্যায়ভাবে কিছুই ব্যয়ও করেন না।** আল্লার মেহেরবানীতে আপনিও অনুরূপ। **আর বাদশাহ তো মানুষের ওপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসুল করে; আর অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।"** [২৫]

এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা হওয়ার পরদিন কাপড়ের থান কাঁধে নিয়ে বিক্রি করার জন্য বেরিয়েছেন। কারণ, খেলাফতের পূর্বে এটিই ছিল তাঁর জীবিকার অবলম্বন। পথে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা। তিনি বললেন, আপনি একি করছেন? জবাব দিলেন, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবো কোত্থেকে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে খেলাফতের কাজ চলতে পারে না। চলুন আবু ওবায়দা (বায়তুল মালের খাজাঞ্চী)-এর সাথে আলাপ করি। তাই হলো। হযরত ওমর (রা.) আবু ওবায়দার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, **একজন সাধারণ মুহাজিরের আমদানীর মান সামনে রেখে আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এ ভাতা মুহাজিরদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির সমানও নয়, আবার সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তির পর্যায়েরও নয়।** এমনিভাবে তাঁর জন্য একটা ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিল বার্ষিক চার হাজার দিরহামের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর

২৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড,পৃষ্ঠা- ৩০৬ – ৩০৭।

ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওসিয়াত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আট হাজার দিরহাম বায়তুলমালকে ফেরত দেবে। হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট তা আনা হলে তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ আবু বকর (রা.)-এর প্রতি রহমত করুন। উত্তরসূরীদেরকে তিনি মুশকিলে ফেলেছেন।" [২৬]

বায়তুলমালে **খলিফার অধিকার কতটুকু এ প্রসঙ্গে** খলিফা ওমর (রা.) একদা তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

"গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে এক জোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার-পরিজনের জন্য এছাড়া আল্লাহর সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ কিছুই নই।" [২৭]

অপর এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"এ সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমি ন্যায় মনে করি না। ন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হবে, ন্যায় মুতাবেক প্রদান করা হবে এবং বাতেল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে। এতীমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক, তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, অভাবী হলে মারুফ পন্থায় গ্রহণ করবো।" [২৮]

হযরত আলী (রা.)-ও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। তিনি পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝবরাবর পর্যন্ত উঁচু তহবন্দ পরতেন। তাও আবার ছিল তালিযুক্ত।[২৯] সারাজীবন কখনো একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার শীতের মওসুমের জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে বসে আছেন আর শীতে কাঁপছেন।[৩০] শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে দেখা গেল মাত্র ৭ শত দিরহাম। তাও তিনি এক

২৬. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২২৮০ – ২২৮৫।
২৭. ইবনে কাসীর, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, পৃষ্ঠা-১৩৪।
২৮. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭।
২৯. ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮
৩০. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩।

পয়সা এক পয়সা করে সঞ্চয় করেছেন একটা গোলাম খরিদ করার জন্য।[৩১] **আমীরুল মু'মিনীন বলে চিনতে পেরে তাঁর কাছ থেকে যাতে কম মূল্য কেউ গ্রহণ না করে -এ ভয়ে কোন পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে বাজারে কখনো কোন জিনিস কিনতেন না।**[৩২] সে সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে তাঁর সংঘর্ষ চলছিল, কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শ দেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যে রকম লোকদেরকে অঢেল দান-দক্ষিণা করে তাঁর সাথী করে নিচ্ছেন আপনিও তেমনি বায়তুলমালের ভান্ডার উজাড় করে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে সমর্থক সংগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি এই বলে তা প্রত্যাখান করলেন, "তোমরা কি চাও আমি অন্যায়ভাবে সফল হই?"[৩৩] তাঁর আপন ভাই হযরত আকীল (রা.) তাঁর কাছে টাকা দাবী করেন বায়তুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেন, "তুমি কি চাও তোমার ভাইও মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক?"[৩৪]

চার ঃ রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি ছিল, রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নিজের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করতেন, স্বীয় রাষ্ট্রে তাঁরা কোন নীতি মেনে চলতেন? খেলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসব বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মসজিদে নববীতে গণ বায়আত ও শপথের পর ***হযরত আবু বকর (রা.)*** যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। অন্যের পরিবর্তে আমি নিজে এ পদ লাভের চেষ্টাও করিনি, এ জন্য আমি কখনো আল্লাহ্‌র নিকট দোয়াও

৩১. ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮।

৩২. ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮। ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩।

৩৩. ইবনে আবিল হাদীদ, নাহজুল বালাগার ভাষ্য, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২। দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, মিসর, ১৩১৯ হিজরী।

৩৪. ইবনে কোতাইবা-আল-ইমাম ওয়াস সিয়াসা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭১। হাফেয ইবনে হাজার তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আ'কীলের কিছু ঋণ ছিল। হযরত আলী (রা.) তা পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দলে ভিড়ে ছিলেন।-আল-ইসাবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৭। মাতবাআতু মুস্তফা মুহাম্মাদ, মিসর ১৯৩৯।

করিনি। এ জন্য আমার অন্তরে কখনো লোভ সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের ফেতনার সূচনা হবে-এ আশংকায় আমি অনিচ্ছা সত্বে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ পদে আমার কোন শান্তি নেই। বরং এটা এক বিরাট বোঝা, যা আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য আল্লাহ্‌ যদি আমাকে সাহায্য করেন। আমার ইচ্ছা ছিল, অন্য কেউ এ গুরুদায়িত্ব-ভার বহন করুক। এখনও আপনারা ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে কাউকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বায়আত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবে না। আপনারা যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মানদন্ডে যাচাই করেন, তাঁর কাছে আপনারা যে আশা পোষণ করতেন, আমার কাছেও যদি সে আশা করেন, তবে সে ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, তিনি শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো।

আমি সঠিক কাজ করলে আমার সহযোগিতা করবেন, অন্যায় করলে সংশোধনী দেবেন। সততা হচ্ছে একটি আমানত– গচ্ছিত ধন। আর মিথ্যা একটি খেয়ানত– গচ্ছিত সম্পদ অপহরণ। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যতক্ষণ আমি তার অধিকার তাকে দান না করি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি তার কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে না পারি। কোন জাতি আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা ত্যাগ করার পরও আল্লাহ্‌ তার ওপর অপমান চাপিয়ে দেননি– এমনটি কখনো হয়নি। কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করার পরও আল্লাহ্‌ তাদের সাধারণ বিপদে নিপতিত করেন না এমনও হয় না। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্‌ ও রাসূল (স.)-এর অনুগত থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমি আল্লাহ্‌ ও রাসূল (স.)-এর নাফরমানী করলে আমার ওপর তোমাদের কোন আনুগত্য নেই। আমি অনুসরণকারী, কোন নতুন পথের উদ্ভাবক নই।"[৩৫]

৩৫. আত্‌তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০। ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন নববিয়্যা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১১, মাতবাআতু মুস্তফা আল-বারী, মিসর-১৯৩৬, কান্‌যুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২২৬১, ২২৬৪, ২২৬৮, ২২৭৮, ২২৯১, ২২৯৯।

হযরত ওমর (রা.) তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

"লোক সকল। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় কারোর আনুগত্য করতে হবে– নিজের সম্পর্কে এমন অধিকারের দাবী কেউ করতে পারে না। .... লোক সকল! আমার ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি। এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো। আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, খেরাজ বা আল্লাহ্‌র দেয়া 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে বা রক্তপাত ছাড়াই যে গনীমতের মাল লব্ধ হয়) থেকে বেআইনীভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবো না। আর আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে, অন্যায়ভাবে তার কোন অংশও আমি ব্যয় করবো না।"[৩৬]

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে প্রেরণ কালে হযরত আবু বকর (রা.) যে হেদায়াত দান করেন তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমর! আপন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। তাঁকে লজ্জা করে চলো। কারণ, তিনি তোমাকে এবং তোমার সকল কর্মকেই দেখতে পান।......... পরকালের জন্য কাজ করো। তোমার সকল কর্মে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখো। সঙ্গী-সাথীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে, যেন তারা তোমার সন্তান। মানুষের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়িয়ো না। বাহ্য কাজের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে আচরণ করো। নিজেকে সংযত রাখবে, তোমার প্রজা সাধারণও ঠিক থাকবে।"[৩৭]

হযরত ওমর (রা.) শাসনকর্তাদের কোন এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেন ঃ

"মানুষের দন্ড-মুন্ডের মালিক বনে বসার জন্য আমি তোমাদেরকে মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মাতের ওপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করছি না। বরং আমি তোমাদেরকে এ জন্য নিযুক্ত করছি যে, তোমরা সালাত কায়েম করবে, মানুষের মধ্যে ইনসাফের ফয়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বন্টন করবে।"[৩৮]

৩৬. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭।
৩৭. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৩১৩।
৩৮. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

বায়আতের পর **হযরত ওসমান** (রা.) প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"শোন, আমি অনুসরণকারী, নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ্ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। **এক** ঃ আমার খেলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো। **দুই** ঃ যেসব ব্যাপারে পূর্বে কোন নীতি-পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সেসব ব্যাপারে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে কল্যাণাভিসারীদের পন্থা নির্ধারণ করবো। **তিন** ঃ আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।"[৩৯]

হযরত আলী (রা.) হযরত কায়েস ইবনে সা'দকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে মিশরবাসীদের নামে যে ফরমান দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"সাবধান! আমি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ্ মুতাবিক আমল করবো। আমার ওপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অধিকার অনুযায়ী আমি তোমাদের কাজ-কারবার পরিচালনা করবো এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ্ কার্যকরী করবো। তোমাদের অগোচরেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো।"

প্রকাশ্য জনসমাবেশে এ ফরমান পাঠ করে শোনাবার পর হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ঘোষণা করেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে এভাবে আচরণ না করলে তোমাদের ওপর আমার কোন বায়আত নেই।"[৪০]

হযরত আলী (রা.) **জনৈক গভর্নরকে লিখেন ঃ**

"তোমাদের এবং জনসাধারণের মাঝে দীর্ঘ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তারা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারে না। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্য বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় ক্ষুদ্র। তাদের জন্য ভাল মন্দ হয়ে দেখা দেয়, আর মন্দ গ্রহণ করে ভালোর আকার; সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।"[৪১]

৩৯. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৬।
৪০. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৫০-৫৫১।
৪১. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮।

"হযরত আলী (রা.) কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অনুরূপ কাজও করেছেন। তিনি নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন ব্যবসায়ীরা কাজ-কারবারে প্রতারণা করছে কিনা! এ দৈনন্দিন ঘোরাঘুরির ফলে কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতো না যে, মুসলিম জাহানের খলিফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ তাঁর পোশাক থেকে বাদশাহীর কোন পরিচয় পাওয়া যেতোনা, তাঁর আগে আগে পথ করে দেয়ার জন্য কোন রক্ষী বাহিনীও দৌড়ে যেতো না।"[৪২]

একবার হযরত ওমর (রা.) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ঃ

"তোমাদেরকে পিটাবার জন্য আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমি গভর্নরদেরকে নিযুক্ত করিনি। তাদেরকে নিযুক্ত করেছি এ জন্য যে, তারা তোমাদেরকে দ্বীন এবং নবীর তরীকা-পদ্ধতি শিক্ষা দেবে। কারো সাথে এই নির্দেশ বিরোধী ব্যবহার করা হলে সে আমার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করুক। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি তার (গভর্নর) কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।"

এতে হযরত আমর ইবনুল আস (মিশরের গভর্নর) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ "কেউ যদি মুসলমানদের শাসক হয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে মারে, আপনি কি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবেন?"

হযরত ওমর (রা.) জবাব দেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবো। আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)-কে তাঁর নিজের সত্তা থেকেও প্রতিবিধান নিতে দেখেছি।"[৪৩]

আর একবার হজ্জ উপলক্ষে হযরত ওমর (রা.) সমস্ত গভর্নরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ এদের বিরুদ্ধে কারোর ওপর কোন অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো নির্দ্বিধায়। গোটা সমাবেশ থেকে মাত্র একজন লোক উঠে হযরত আমর ইবনুল আস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন

৪২. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪-৫।

৪৩. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৫। মুসনাদে আবু দাউদ আত্‌তায়ালেসী, হাদীস নং-৫৫। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০। আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

করে বলেন ঃ তিনি অন্যায়ভাবে আমাকে একশ দোররা মেরেছেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন ঃ ওঠ এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। হযরত আমর ইবনুল আস প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি গভর্নরদের বিরুদ্ধে এ পথ উন্মুক্ত করবেন না। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিজের থেকে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি। হে অভিযোগকারী, এসো তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" শেষ পর্যন্ত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দু'আশরাফী দিয়ে আপন পিঠ রক্ষা করতে হয়।[৪৪]

পাঁচ ঃ আইনের প্রাধান্য

এ খলিফারা নিজেকেও আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম যিম্মি) সমান মনে করতেন। **রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি (কাযী) নিযুক্ত করলেও খলিফাদের বিরুদ্ধে রায় দানে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন-যেমন স্বাধীন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে।** একবার হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর মধ্যে এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ (রা.) দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন। কিন্তু তিনি উবাই (রাঃ)-এর সাথে বসলেন। অতঃপর হযরত উবাই (রা.) তাঁর আর্জি পেশ করলেন, হযরত ওমর (রা.) অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ (রা.)-এর উচিত ছিল হযরত ওমরের কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন, হযরত ওমর নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেনঃ **"যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং ওমর সমান না হয়, ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারে না।"**[৪৫]

এমনি একটি ঘটনা জনৈক খৃষ্টানের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর। কুফার বাজারে হযরত আলী (রা.) দেখতে পেলেন, জনৈক খৃষ্টান তাঁর হারানো লৌহবর্ম বিক্রি

৪৪. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৬

৪৫. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬। দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়াদাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫ হিজরী।

করছে। আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেননি বরং কাজীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দান করলেন।[৪৬]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী (রাঃ) এবং জনৈক জিম্মী বাদী-বিবাদী হিসেবে কাজী শোরাইহ-এর আদালতে উপস্থিত হন। কাজী দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.)-কে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি (হযরত আলী) বলেন, "এটি আপনার প্রথম বে-ইনসাফী।"[৪৭]

ছয় ঃ বংশ-গোত্রের পক্ষপাতমুক্ত শাসন

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইসলামের নীতি এবং প্রাণশক্তি অনুযায়ী তখন বংশ-গোত্র এবং দেশের পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হতো– কারো সাথে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা হতো না।

আল্লাহ্‌র রাসূলের ওফাতের পরে আরবের গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ঝঞ্ঝার বেগে। নবুয়্যাতের দাবীদারদের অভ্যুদয় এবং ইসলাম ত্যাগের হিড়িকের মধ্যে এ উপাদান ছিল সবচেয়ে ক্রিয়াশীল। মোসায়লামার জনৈক ভক্তের উক্তি ঃ আমি জানি, মোসায়লামা মিথ্যাবাদী। কিন্তু রাবীআর মিথ্যাবাদী মোযারের সত্যবাদীর চেয়ে উত্তম।"[৪৮] মিথ্যা নবুয়্যাতের অপর এক দাবীদার তোলাইহার সমর্থনে বনু গাতফানের জনৈক সর্দার বলেনঃ "খোদার কসম, কুরাইশের নবীর অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের বন্ধুগোত্রের নবীর অনুসরণ আমার নিকট অধিক প্রিয়।"[৪৯]

মদীনায় যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়, তখন গোত্রবাদের ভিত্তিতে হযরত সাদ ইবনে ওবাদা (রা.) তাঁর খিলাফাত স্বীকার করা থেকে বিরত ছিলেন। **এমনি করে গোত্রবাদের ভিত্তিতেই হযরত আবু সুফিয়ানের নিকট তাঁর খিলাফাত ছিল অপছন্দনীয়। তিনি হযরত আলী**

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. ইবনে খাল্লেকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ১৬৮, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৪৮।

৪৮. আত্‌তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৫০৮।

৪৯. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা–৪৮৭।

(রা.) নিকট গিয়ে বলেছিলেন ঃ কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোক কি করে খলিফা হয়ে গেল? তুমি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলে আমি পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা সমগ্র উপত্যকা ভরে ফেলবো।" কিন্তু হযরত আলী (রা.) এক মোক্ষম জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন ঃ তোমার এ কথা ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমাণ করে। তুমি কোন পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী আনো, আমি তা কখনো চাই না। মুসলমানরা পরস্পরের কল্যাণকামী। তারা একে অপরকে ভালবাসে তাদের আবাস ও দৈহিক সত্তার মধ্যে যতোই ব্যবধান থাক না কেন। অবশ্য মুনাফিক একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আমরা আবু বকরকে এ পদের যোগ্য মনে করি। তিনি এ পদের যোগ্য না হলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতাম না।"[৫০]

এ পরিবেশে হযরত আবু বকর (রা.) এবং তারপর হযরত ওমর (রা.) নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে কেবল বিভিন্ন গোত্রে নয়, বরং অনারব নওমুসলিমদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং আপন বংশ-গোত্রের সাথে কোন প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এর ফলে সব রকম বংশ গোত্রবাদ বিলীন হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দাবী অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক প্রাণশক্তি ফুটে ওঠে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে আপন গোত্রের কোন লোককে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর (রা.) তাঁর গোটা শাসনকালে তাঁর গোত্রের একজন মাত্র ব্যক্তিকে যার নাম ছিল নোমান ইবনে আদী– বসরার নিকটে মাদয়ান নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহশিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই আবার এ পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।[৫১] এদিক থেকে এ দু'জন খলিফার কর্মধারা সত্যিকার আদর্শভিত্তিক ছিল।

৫০. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস-২৩৭৪। আত্‌তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৪৯। ইবনু আব্দিল বার, আল-ইস্তিআব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮৯।

৫১. হযরত নুমান ইবনে আদী (রা.) ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম। হযরত ওমর (রা.)-এরও আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে যারা মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়া চলে যান, তাঁদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর পিতা আদীও ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) যখন তাঁকে মাইসান-এর তহসিলদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে যাননি। তিনি সেখানে স্ত্রীর বিরহে কিছু কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতায় কেবল মদের বিষয় উল্লেখ ছিল।

হযরত ওমর (রা.) জীবনের শেষ অধ্যায়ে আশংকাবোধ করলেন, তাঁর পরে আরবের গোত্রবাদ (ইসলামি আন্দোলনের বিরাট বিপ্লবী প্রভাবের ফলেও যা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি) পুনরায় যেন মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে এবং তার ফলে ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়ে যায়। একদা তাঁর সম্ভাব্য উওরসূরীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রা.)-কে হযরত ওসমান (রা.)-এর ব্যাপারে বলেন ঃ

'আমি তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলে তিনি বনী আবিমুয়াইত (বনী উমাইয়্যা)-কে লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। আর তারা লোকদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী করে বেড়াবে। আল্লাহর কসম, আমি ওসমানকে স্থলাভিষিক্ত করলে সে তাই করবে। আর ওসমান তাই করলে তারা অবশ্যই পাপাচার করবে। এক্ষেত্রে জনগণ বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করবে।[৫২] ওফাতকালেও এ বিষয়টি তাঁর স্মরণ ছিল। শেষ সময়ে তিনি হযরত আলী (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর প্রত্যেককে ডেকে বলেন ঃ আমার

এতে হযরত ওমর (রা.) তাকে পদচ্যুত করেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাকে কোন পদ না দেয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। ইবনে আব্দুল বার, আলইস্তীআব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬। দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত হামাবী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠ–২৪২– ২৪৩। দারে ছাদের, বৈরুত, ১৯৫৭। অপর এক ব্যক্তি, হযরত কোদামা ইবনে মাযউন–যিনি হযরত ওমর (রা.)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন– তিনি তাঁকে বাহরাইন-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করে দন্ড দান করেন। (আল-ইস্তীআব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৫৩৪, ইবনে হাজার, আল-ইসাবা) ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা–২১৯–২২০।

৫২. ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীআব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৪৬৭। শাহ ওয়ালীউল্লাহ, ইযালাতুল খিফা, মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা– ৩৪২, বেরিলী সংস্করণ। কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন তোলেন ঃ হযরত ওমর (রা.) এর ওপর কি ইলহাম (সূক্ষ্ম ওহী) হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তিনি হলফ করে এমন কথা বলেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে যা অক্ষরে অক্ষরে ঘটে গিয়েছিল? এর জবাব এই যে, দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কখনো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাকে যুক্তির আলোকে পুনর্বিন্যাস করলে ভাবীকালে ঘটিতব্য বিষয় তাঁর সামনে এমনিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন ২+২=৪। ফলে ইলহাম ব্যতীতই তিনি দিব্য দৃষ্টি বলে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আরবদের মধ্যে গোত্রবাদের জীবাণু কতো গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে, হযরত ওমর (রা.) তা জানতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে, ইসলামের ২৫–৩০ বছরের প্রচার এখনও সে সব জীবাণু সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি। এ কারণে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি তাঁর এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর নীতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা হয়, তাঁর উত্তরসূরীরা যদি নিজ গোত্রের লোকদেরকে বড় বড় পদ দান করা শুরু করেন, তাহলে গোত্রবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে– কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। ফলে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেবে।

পরে তোমরা খলিফা হলে স্বস্ব গোত্রের লোকদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবে না।[৫৩] উপরন্তু ছয় সদস্যের নির্বাচনী শূরার জন্য তিনি যে হেদায়াত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়টিও ছিল ঃ নির্বাচিত খলিফারা এ কথাটি মেনে চলবেন যে, তাঁরা আপন গোত্রের সাথে কোন ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করবেন না।[৫৪] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) এ ক্ষেত্রে ঈপ্সিত মানদন্ড বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তাঁর শাসনামলে বনী উমাইয়াকে ব্যাপকভাবে বিরাট বিরাট পদ এবং বায়তুলমাল থেকে দান-দক্ষিণা দেয়া হয়। অন্যান্য গোত্র তিক্ততার সাথে তা অনুধাবন করতে থাকে।[৫৫] তাঁর কাছে এটা ছিল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের দাবী। তিনি বলতেন ঃ ওমর (রা.) আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর নিকটাত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন, আর আমি আল্লাহ্‌র জন্য আমার নিকটাত্মীয়দের দান করছি।'[৫৬] একবার তিনি বলেন ঃ "বায়তুলমালের ব্যাপারে আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) নিজেও অসচ্ছল অবস্থায় থাকা পসন্দ করতেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সেভাবে রাখতে ভালবাসতেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার পছন্দ করি।"[৫৭] অবশেষে এর ফল তাই হয়েছে হযরত ওমর (রা.) যা আশংকা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। কেবল তিনি যে শহীদ হন তাই নয়, বরং গোত্রবাদের চাপা দেয়া স্ফুলিঙ্গ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং অবশেষে এর অগ্নিশিখা খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

সাত ঃ গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতাই ছিল এ খেলাফতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরাজির অন্যতম। খলিফারা সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যে

৫৩. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা–২৬৪। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৩৪০–৩৪৪।

৫৪. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা–৪৯–৫০। মুহিবুদ্দীন আত্‌তাবারী, আর–রিয়াযুন নাযেরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৭৬, হোসাইনিয়া প্রেস, মিসর, ১৩২৭ হিজরী। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা–১২৫, আল–১২৫, আল-মাতবাআতুল কুবরা, মিসর, ১২৮৪ হিজরী। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রা.) তাঁর ইযালাতুল খিফায় এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা–৩২৪ দ্রষ্টব্য)

৫৫. তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা–৩৬।

৫৬. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ২৯১।

৫৭. কান্‌যুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদিস-২৩২৪। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৬৪।

থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। **তাঁদের কোন সরকারী দল ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধেও কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না।** মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ঈমান এবং বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। চিন্তাশীল, উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হতো। কোন কিছুই গোপন করা হতো না। **ফায়সালা হতো দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে, কারো দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ বা দলাদলির ভিত্তিতে নয়।** কেবল শূ'রার মাধ্যমেই খলিফারা জাতির সম্মুখে উপস্থিত হতেন না; বরং দৈনিক পাঁচবার সালাতের জামায়াতে, সপ্তাহে একবার জুময়ার জামায়াতে এবং বছরে দু'বার ঈদের জামায়াতে ও হজ্জ-এর সম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অন্যদিকে এ সব সময় জাতিও তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতো। তাঁদের নিবাস ছিল জনগণের মধ্যেই। কোন দারোয়ান ছিল না তাঁদের গৃহে। সকল সময়ে সকলের জন্য তাঁদের দ্বার খোলা থাকতো। তাঁরা হাট-বাজারে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। **তাঁদের কোন দেহরক্ষী ছিল না, ছিল না কোন রক্ষী বাহিনী। এ সব সময়ে ও সুযোগে যে কোন ব্যক্তি তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে, সমালোচনা করতে ও তাঁদের নিকট থেকে হিসাব চাইতে পারতো।** তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার স্বাধীনতা ছিল সকলেরই। এ স্বাধীন ব্যবহারের তাঁরা কেবল অনুমতিই দিতেন না, বরং এ জন্য লোকদেরকে উৎসাহিতও করতেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খেলাফতের প্রথম ভাষণেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন, আমি সোজা পথে চললে আমার সাহায্য করো, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে।

একদা হযরত ওমর (রা.) জুমআর খোতবায় মত প্রকাশ করেন যে, কোন ব্যক্তিকে যেন বিবাহে চারশ দেরহামের বেশি মোহর ধার্যের অনুমতি না দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এমন নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার নেই। কুরআন স্তুপীকৃত সম্পদ (কেনতার) মোহর হিসাবে দান করার অনুমতি দিচ্ছে। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী? হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ তাঁর মত প্রত্যাহার করেন।[৫৮] আর একবার হযরত সালমান ফারসী প্রকাশ্য মজলিসে তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন– "আমাদের সকলের ভাগে এক একখানা চাদর পড়েছে।

৫৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর, আবু ইয়ালা ও ইবনুল মুনযির, এর উদ্ধৃতিতে, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা–৪৬৭।

আপনি দু'খানা চাদর কোথায় পেলেন:?" হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, দ্বিতীয় চাদরখানা তিনি পিতাকে ধার দিয়েছেন।[৫৯] একদা তিনি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যদি কোন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? হযরত বিশ্র ইবনে সাদ (রা.) বলেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেব। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ![৬০] হযরত ওসমান (রা.) সবচেয়ে বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি কখনো জোরপূর্বক কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। বরং সব সময় অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে নিজের সাফাই পেশ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) তাঁর খেলাফত কালে খারেজীদের অত্যন্ত কটূক্তিকেও শান্ত মনে বরদাশত করেছেন। একদা পাঁচজন খারেজীকে গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাযির করা হলো। এরা সকলেই প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিচ্ছিল। তাদের একজন প্রকাশ্যেই বলছিল -আল্লাহ্র কসম, আমি আলীকে হত্যা করবো। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এদের সকলকেই ছেড়ে দেন এবং নিজের লোকদেরকে বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে তাদের গাল-মন্দের জবাবে গালমন্দ দিতে পারো। কিন্তু কার্যত কোন বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিছক মৌখিক বিরোধিতা এমন কোন অপরাধ নয়, যার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।[৬১]

পূর্বে আমরা খেলাফতে রাশেদার যে অধ্যায়ের আলোচনা করেছি, তা ছিল আলোর মিনার। পরবর্তীকালে ফোকাহা-মোহাদ্দেসীন এবং সাধারণ দ্বীনদার মুসলমান সে আলোর মিনারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁরা এ মিনারকেই আদর্শ মনে করে আসছেন।

বিঃ দ্রঃ মওদূদী (র.)-এর লেখার মধ্যে "গণতন্ত্র" এবং "নির্বাচন" শব্দগুলোকে তাঁর লেখার প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে। সম্পূর্ণ নির্দোষ অর্থে শব্দগুলোর এরূপ অসতর্ক ব্যবহারই পরবর্তীতে তাঁর দলকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন এবং তাগুতি সংবিধানের অধীনে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের মত মারাত্মক ভুলে নিপতিত করেছে।

৫৯. মহিবুদ্দীন আত-তাবারী, আররিয়াযুন নাযেরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৫৬। মিসরীয় সংস্করণ। ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃষ্ঠা–১২৭।

৬০. কান্‌যুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদিস–২৪১৪।

৬১. সুরুখসী, আল-মাবসুত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা–১২৫। সাআদাত প্রেস, মিসর, ১৩২৪ হিজরী।

গণতন্ত্র

বিশ্বায়ন হলো বর্তমান বিশ্ব-তাগুত আমেরিকার মূল শ্লোগান। এতে তিনটি প্রধান বিষয় হলো ঃ গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি।

এ তিনটি বিষয় প্রতীক আকারে US One Dollar Note এ Pyramid দ্বারা সংকেতায়িত করা হয়েছে। **পাশ্চাত্যের প্রতিভূ আমেরিকা তথা Judeo Christian Civilization** এর ধারক-বাহকগণ আমাদেরকে তাদের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশে আবদ্ধ করার কালেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও দ্বিমুখী শিক্ষার প্রচলন; আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তথা আলেমদের হত্যা করণ, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে আমাদের যুব সমাজের স্মরণ থেকে গোপন করণ কিংবা স্থান বিশেষে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ শিক্ষিতদের মাঝে দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে বিস্মৃতি ও নানারূপ সন্দেহ সৃষ্টি করে। এর সাথে তাদের আদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্য যে বর্তমান বিশ্বের সকলের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয় সে কথা অনুধাবন করাতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি। বৃটিশদের **প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতা** এবং তৎপরবর্তী কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের ভূমিকায় অভিনয়কারী আমেরিকার **অপ্রত্যক্ষ উপনিবেশ** সেই একই ধারা বজায় রেখেছে। **এ কাজটি বর্তমানে তারা করছে তাদের অত্যন্ত উন্নত ও বিস্ময়কর প্রচার সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং অস্ত্রাগারের মারাত্মক সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে।** এ সবই তারা করেছে অন্যায়ভাবে সমগ্র বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠন ও কুক্ষিগত করে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে সংক্ষেপে কিছু বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে New York এর অদূরে Bretton Woods নামক জায়গায় ১৯৪৪ সনে Judeo Christian সভ্যতার ধারক-বাহকগণ সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিকে নিজেদের অনুকূলে ঢেলে সাজাতে এবং যাবতীয় মুনাফা ও প্রবৃদ্ধি যাতে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের অনুকূলে প্রবাহিত হয় তার নীল নক্সা প্রণয়ন করে। তারই পরিণতিতে IMF এবং World Bank সৃষ্টি হয়। এই IMF, World

Bank জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় (যেখানে সেই আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যদেরই নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত) বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার লেনদেনে এবং পণ্য ও অর্থ প্রবাহে এমন সব নীতি ও নিয়ম-এর প্রচলন করেছে, যার পরিণতিতে **সম্পদ কেবল তাদের দিকেই প্রবাহিত হবার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে।** ১৯৪৪ সন পরবর্তী বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে যতগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে তার সব কয়টিই মূলতঃ ঐ Bretton Woods এর নীল নক্সার ফসল। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতার যুগে বৃটিশগণ পাশ্চাত্যের সেবাদাসরূপে যে সব পাশ্চাত্যপন্থীর সৃষ্টি করেছিল তাদের ঘাড়ে বসে তাদেরকে ব্যবহার করার সকল কলাকৌশল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েই তারা ঐ ঔপনিবেশভুক্ত দেশগুলোকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেয় এবং এ রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব তারা তাদের সেবা দাসদের হাতেই ন্যস্ত করে। এই সেবা দাসরা তাদের প্রভুদের সব কাজকেই মহান ও কল্যাণকর মনে করতে অভ্যস্ত থাকায়, Bretton Woods এর ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে কিভাবে তাদের স্বদেশের সম্পদ এদের দিকে অর্থাৎ আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা দেখতে অপারগ হয়। পরবর্তীতে অবশ্য অনেকেই বিষয়টি যে পরিষ্কার ষড়যন্ত্র তা বুঝতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে এদের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হয়ে তাদের অনুকূলে বিশাল অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। অবৈধ লুণ্ঠিত অর্থে তারা অস্ত্র উৎপাদন, অস্ত্র-ব্যবসা, যুদ্ধ-চাপান, শুধুমাত্র প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে দুই ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিবেশীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি ইত্যাকার কলাকৌশলে বাকী বিশ্বকে শোষণ করার সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। তাদের এ ষড়যন্ত্রের সব চাইতে খারাপ পরিণতি হয় মুসলিম বিশ্বে। এখানকার সকল সম্পদের উপর ওদের (অর্থাৎ পাশ্চাত্যের) নিয়ন্ত্রণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ নিয়ন্ত্রণ এতটাই নিখুঁত এবং সর্বব্যাপি হলো যে সেপ্টেম্বর ১১ এর পর তারা ইসলামি জঙ্গীদেরকে সাহায্য করা হয় এ অজুহাতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের মত দেশগুলোর বিভিন্ন ইসলামি NGO তে যে সব সাহায্য আসতো তার সবই তাদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে নিয়ে নেয়। এমনকি ব্যক্তিগত একাউন্টগুলোর অর্থ স্থানান্তরেও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। **আমরা যে নামেমাত্র স্বাধীন এবং বাস্তবে পরাধীন একথা এখন অনেকেই একটু একটু বুঝতে শিখছেন।**

সম্পদ কুক্ষিগতকরণ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হওয়া–এ দু'টি প্রধান বিষয়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাশ্চাত্যগণ Technological Development এর

ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এ ক্ষেত্রেও তারা Patent Rights এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের সম্পদ তাদের দিকে ধাবিত করার ব্যবস্থা করে। প্রযুক্তি, শিক্ষা, তথ্য এগুলোর আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও তারা এমন সব Classified নিয়ম নীতির প্রচলন করে যাতে কোন উন্নত প্রযুক্তিই তাদের অনুমোদনের বাইরে অন্যত্র বিকাশ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য কোন্ দেশ কতটা অনুমোদন পাবে তা তারা তাদের আদর্শ তথা বিশ্বায়নের নিয়মগুলোকে কারা নিঃশর্তভাবে মেনে নিচ্ছে সেই হিসাব করেই দেয়। Super Specialized Technology এবং War Ammunition-এর ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব যাতে কোনভাবেই অগ্রসর হতে না পারে এ ব্যাপারে তারা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এসব ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের সাথে কিছু কাল প্রতিযোগিতা করেছিল এবং গোটা বিশ্বে কিছুটা সমতা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু **'৯০ এর দশকে রাশিয়া ভেঙ্গে যাওয়াতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও ক্রমে ক্রমে Novus Ordo Seclorum এর মূল শ্লোগানগুলোকে তাদের নিজেদের শ্লোগানে পরিণত করল। সুতরাং গোটা বিশ্ব হয়ে পড়ল এক মেরু বিশ্বে।**

এই এক মেরু বিশ্বের চূড়ান্ত কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের তিনটি শ্লোগান তথা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মুক্তবাজার অর্থনীতির নিকট পরাভব মানার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে। এ আলোচনার প্রেক্ষাপটে এটি অবশ্যই পরিষ্কার যে, **গণতন্ত্রকে যারা কেবলমাত্র সরকার গঠন, সরকার পরিচালনা ও সরকার বিলোপ সাধনের প্রক্রিয়ার সমার্থক মনে করেন তারা কত বড় মারাত্মক ভুল করেন। গণতন্ত্র যদি শুধু তাই হত তা হলে তা সম্ভবতঃ খুব ক্ষতিকর হতো না। কিন্তু এ যে বিশাল ষড়যন্ত্রের সূত্রের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।**

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান দুনিয়ার লাগাম পাশ্চাত্যের হাতে। এদের রাজনৈতিক শ্লোগান হল গণতন্ত্র; সামাজিক বুলি হল মানবাধিকার; আর এদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল সুদ। সুতরাং যারাই গণতন্ত্রের কথা বলবে তাদেরকেই পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে নির্বিরোধ মেনে নিতে হবে। আজ হোক কাল হোক অচিরে তাদেরকে মানবাধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা এবং সুদী অর্থব্যবস্থার শোষণনীতিতে আত্মাহুতি দিতে হবে। কারণ অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে প্রতিকূলে

যাওয়ার ভাবনা পাগলের কিংবা অর্বাচীনের। সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তার এ দীনতা ও বৈপিরীত্য থেকে মুক্ত।

আমাদের দেশে বর্তমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের Syllabus গুলোর দিকে একটু মনযোগ দিলে একথা বুঝতে কারও কষ্ট হবে না যে এ সব Syllabus পাশ্চাত্যের অনুকরণে পাশ্চাত্যের আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রাষ্ট্র বিজ্ঞানে গণতন্ত্র সম্পর্কে যা লেখা রয়েছে, পাশ্চাত্য দেশীয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই আছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি বিষয়ে যা পড়ানো হয় তা IMF, World Bank, WTO, GATTS, PRSP ইত্যাকার Bretton Woods এর Prescription ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের দেশের সমাজ বিজ্ঞানে এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মানবাধিকারের যে ধারণা উপস্থাপন করা হয় তা পাশ্চাত্য থেকে ধার করা ধারণার চাইতে এক চুলও বাইরে নয়। **এমতাবস্থায় গণতন্ত্রকে যারা শুধুমাত্র "সরকার গঠন প্রক্রিয়া" রূপে ইসলামের শুরা-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শৃঙ্খলার প্রতীক 'খিলাফাতু আলা মিনহাজিন্ নবুওয়্যাহ্" এর ধারণাকে বিসর্জন দিতে চাইছেন তারা যে কত বড় বোকার স্বর্গে বাস করছেন তা বোঝানোর ভাষা আমাদের নেই।**

গণতন্ত্র শুধু সরকার গঠন, সরকার পরিচালনা কিংবা সরকার বিলোপ সাধনের প্রক্রিয়া নয়। এটি পাশ্চাত্যের দীর্ঘ ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের সার নির্যাস। এটি একটি আদর্শের নাম যা পাশ্চাত্য ধারণ করে, যা পাশ্চাত্য আমাদের উপর চাপায়। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য আমাদেরকে বর্তমানেও গোলাম বানিয়ে রেখেছে এবং তাদের খেদমতে আমাদের মেধা, আমাদের শ্রম, আমাদের সম্পদকে ব্যবহার করছে, আর আমাদের পরিণত করছে হত দরিদ্র মেরুদন্ডহীন অনুকরণপ্রিয় জাতিতে। **এই Novus Ordo Seclorum এর সমন্বিত শ্লোগান এর অংশ হিসাবে যে সব ইসলামি চিন্তাবিদ গণতন্ত্রকে বুঝেছেন তারা কখনও গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সামান্যতম মিলও খুঁজে পাবেন না।** পক্ষান্তরে যে সব ইসলামপন্থী খন্ডিতভাবে খলিফা মনোনয়নে জনগণের পরামর্শকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখেছেন, যাদের সমগ্র মনোযোগ কেবল এতটুকুতেই ব্যস্ত তারাই কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্দোষ ভাবতে পারেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস যারা পড়েছেন, যারা সেখানকার আর্থ-সামাজিক আন্দোলন ও বিপ্লবগুলোর সার নির্যাস জেনেছেন তারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, **গণতন্ত্র একটি আদর্শের রাজনৈতিক প্রতিনিধি যার সামাজিক দিককে তারা মানবাধিকারের মোড়কে আমাদের নিকট তুলে ধরে। এর অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হল সুদভিত্তিক IMF, WORLD BANK এর দেয়া ফর্মূলায় নির্মিত মুক্তবাজার অর্থনীতি।**

তাই পাশ্চাত্য যখন গণতন্ত্র ফেরি করে তখন তারা একযোগে মানবাধিকারের কথা বলে এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথাও বলে। তারা শুধু বলে না বরং বাস্তবে তারা তার প্রচলন করেছে এবং তা টিকিয়ে রাখার জন্যই তারা তাদের সকল শক্তি নিয়োগ করছে। **এখন কোন ইসলামপন্থী যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীতে অসচেতন ইসলামি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং নিজেদের মূল আদর্শের প্রতীক খিলাফাহকে গণতন্ত্রের শ্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে তখন তিনি আর যাই প্রতিষ্ঠিত করেন না কেন ইসলামকে যে প্রতিষ্ঠিত করছেন না একথা নিশ্চিন্তে বলা যাবে।**

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর গণতন্ত্রকে বোঝার জন্য আমরা পাশ্চাত্যের লেখকদের দু'টি প্রতিনিধিত্বমূলক সংক্ষিপ্ত রচনার বাংলা অনুবাদ তুলে ধরলাম। প্রথম প্রবন্ধটি Encyclopaedia Britannica থেকে গৃহীত। অপরটি Microsoft Library এর জন্য প্রস্তুতকৃত প্রবন্ধ M. Pious এর একটা পর্যালোচনা। এতে পশ্চিমারা গণতন্ত্র বলতে কি বুঝে এবং কি বোঝায় তা জানা যাবে। দু'টি প্রবন্ধতেই গণতন্ত্রের মূল আদর্শরূপে **আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা** এবং **ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণাকে** গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই আমরা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার অংশের বাংলা অনুবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের মানবাধিকার ঘোষণার অংশের বঙ্গানুবাদ তুলে ধরলাম। এ দু'টি ঘোষণাতেই এই আদর্শের মূল চরিত্র পরিস্ফুটিত। **ইসলামের নিয়ম-বিধান বানানো এবং নিয়ম-বিধান দেয়ার মালিক আল্লাহ্। আর এ দু'ঘোষণায় সেই মালিকানা এবং সার্বভৌমত্ব মানুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম এবং গণতন্ত্র মৌলিকভাবেই দু'টি আলাদা বিষয়।** ইসলামে كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا (আল্লাহ্র বাক্যই সব কিছুর উর্দ্ধে)[১] অর্থাৎ দ্বীনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অথচ ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় দ্বীনকে রাষ্ট্রের অধীন করা হয়েছে।

১. সূরা তওবাহ্, আয়াত নং-৪০।

গণতন্ত্র ঃ পশ্চিমা ধারণা

প্রথম প্রবন্ধ ঃ এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা[১]

গণতন্ত্র শব্দটির অর্থ জনগণের শাসন (গ্রীক Demos অর্থ "গণ" এবং Kratos অর্থ "শাসন")। কিন্তু সমসাময়িক ব্যবহারে এটি বিভিন্ন ধারণা বহন করে। ১. **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র**– এটি এমন একটি সরকার গঠন পদ্ধতি যেখানে দেশের সকল নাগরিক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসননীতিকে মেনে নেয় এবং সকলে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ নেয়। ২. **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র**– এটি এমন এক সরকার গঠন পদ্ধতি যেখানে দেশের নাগরিকগণ সশরীরে নয় বরং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। ৩. **সাংবিধানিক গণতন্ত্র**– এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কার্যকর হয় সংবিধানিক অবকাঠামোর মাধ্যমে। ঐ সংবিধান সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। অধিকারগুলো হচ্ছে বাক-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। একে উদারনৈতিক গণতন্ত্র কিংবা সাংবিধানিক গণতন্ত্র বলে। ৪. **সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র**- যে সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরগুলোর ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা করে, বিশেষতঃ সেসব ব্যবধান যা ব্যক্তিগত সম্পদের অসম-বন্টনের কারণে উদ্ভূত-তাকে সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলে, যদিও সরকারের পদ্ধতিটি পূর্বোক্ত তিনটির কোনটির মত নয়।

গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় প্রাচীন গ্রীকের নগর-রাষ্ট্রে। তখন রাষ্ট্রের সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে সংসদে অংশগ্রহণ করত। এমনটি সম্ভব হতো এ কারণেই যে তখন পুরো দেশের নাগরিক সংখ্যা খুবই কম ছিল। সাধারণত ১০,০০০ এর বেশি হত না। তাছাড়া নারী এবং দাসদের কোন রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না।

নাগরিকগণ বিভিন্ন প্রকার নির্বাহী অফিস ও বিচার কার্যালয়ে অংশগ্রহণ করতে পারত। এসবের কতক পদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। আবার কতক পদ

১. এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে গণতন্ত্র শীর্ষক আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ।

লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। সেখানে ক্ষমতার ভাগাভাগি ছিলো না। সকল কর্মকর্তাই গণসংসদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিল। এ গণসংসদই আইন প্রণয়ন, নির্বাহী এবং বিচারকার্য সম্পাদন করতো।

প্রাচীন গ্রীক-গণতন্ত্র ছিল ইতিহাসের ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। এর তেমন কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান আধুনিক সাংবিধানিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকে পরিলক্ষিত হয় না। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের পতনের পর থেকে বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্র পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান প্রায় ২০০০ বছর। আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণাগুলোর বেশিরভাগ অস্তিত্ব লাভ করেছে মধ্যযুগীয় কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা থেকে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ১. ক্ষমতার চর্চায় **ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক** ও **প্রথাগত নিয়ন্ত্রণ**। ২. রাজা রাজন্যদের **শুল্ক নির্ধারণের ক্ষমতা** চর্চায় বিভিন্ন বুর্জোয়া ও সামষ্টিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ গ্রহণ। বর্তমান আধুনিক সংসদ ও আইন সভার জন্ম হয়েছিল এসব সামষ্টিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিধিত্ব সংগ্রহের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছিলো। জন্মগত অধিকার-এর ধারণা, রাজনৈতিক সাম্যের ধারণা, যা ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা ও আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সময়ের দু'টি প্রধান দলিল হল– আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা (১৭৭৬) এবং ফ্রান্সের মানবাধিকার ও নাগরিকাধিকারের ঘোষণা পত্র (১৭৮৯)।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে মুক্ত স্বাধীন সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গড়া প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদের মধ্য দিয়ে। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের সাথে অবধারিত হয়ে আছে বিভিন্ন কার্যালয়ের জন্য প্রতিযোগিতা, বাক-স্বাধীনতা, অবাধ-মুক্ত সংবাদপত্র এবং আইনের শাসন। কম্যুনিস্টদের, "গণপ্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র" এসব নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের মুখপাত্ররা যুক্তি দেখায় যে উৎপাদনের উপাদানের সামষ্টিক মালিকানাই জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর নিশ্চয়তা বিধায়ক।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ ঃ এম. পায়াস-এর পর্যালোচনা [২]

১. গণতন্ত্রঃ (Demos অর্থ 'জনগণ' আর Kretion অর্থ 'শাসন', এ দুয়ে মিলে Democracy অর্থ জনগণের শাসন), একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি যাতে রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের জন্য পছন্দ করা সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। আধুনিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়। এ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক সময় আইনসম্মত রেফারেন্ডাম-এর মাধ্যমে আরও কিছু মনোনীতদের সাহায্য গ্রহণ করে। এ মনোনীতগণ আবার মৌলিকভাবে যারা মনোনয়ন দিয়েছেন তাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। কতক গণতন্ত্রে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে, সরকার প্রধান এবং সংসদের সদস্যগণ উভয়েই নির্বাচিত হন। আদর্শ শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যেমন যুক্তরাজ্যে এবং নরওয়েতে, কেবলমাত্র সংসদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন এবং এ সাংসদগণের মধ্য থেকেই মন্ত্রীপরিষদ এবং প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট করা হয়। যদিও অনেক সময় গণতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রকে একটির স্থলে অপরটির ব্যবহার হয়, তথাপি এ দু'টি শব্দ সমার্থক নয়। উভয় পদ্ধতিতেই নির্বাচিত সদস্যদের নিকট সরকার গঠনের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। প্রজাতন্ত্রে এ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের প্রয়োজন ও স্বার্থে নিজ বিবেকের রায় অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু গণতন্ত্রে অনেক সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের স্বীয় মতামতকে দমন করে রেখে তারা যাদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নির্দিষ্ট মতামতের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন করেন।

২. প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের গণতন্ত্র ঃ

খৃষ্টপূর্ব যুগের গণতন্ত্রে জনগণের শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লাসিকেল গ্রীক ও রোমীয় প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক কালের গণতন্ত্র বর্তমান আধুনিক কালের গণতন্ত্রের মত ছিল না। তখন ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, যেখানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সংসদে কথা বলতে এবং ভোট দিতে পারতো, অনেকটা নিউ ইংল্যান্ড টাউন সভার মত। নগর-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রায়তনের কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার অজানা ছিল

২. Reviewed by Richard M. Pious for Microsoft (R) Encrata (R) Referrence library 2003. (c) 1993-2002 Microsoft Corporation

কিংবা অপ্রয়োজনীয় ছিল। (প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই এ ধরনের নগর রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা কখনই ১০,০০০ এর বেশি ছিল না।) প্রাচীন গণতন্ত্রে সকল ব্যক্তির সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল না। বেশির ভাগ জনতা বিশেষ করে নারী ও দাসগণ যারা সংখ্যায় অধিক ছিল, রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতো না। এথেন্সে, যা ছিল সর্ব বৃহৎ নগর রাষ্ট্র, কেবল নগর জাতদেরই সার্বজনীন ভোটাধিকার ছিল। রোমীয় গণতন্ত্রও গ্রীকের মত ছিল যদিও রোমীয়গণ কখনও কখনও অরোমক জাতদেরও নাগরিকত্ব প্রদান করতো। বর্তমান আধুনিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক উন্নয়নে রোমীয় দর্শন যা জনগণকে ঐশ্বরীয় নীতির অধীন মনে করতো এবং খৃষ্টীয় ও ইয়াহুদী ধর্মবিশ্বাস যেখানে সমাজের অবহেলিতদের ন্যায্য অধিকার ও স্রষ্টার নিকট সকলের সমানাধিকার বিষয়ে জোর দেয়া হতো; এ দুটি বিষয় যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

রোমীয় প্রজাতন্ত্র সম্রাটের একনায়কত্বে শেষ হয়। ইটালি, জার্মেনি এবং ফ্লেন্ডারসের ন্যায় মুক্ত নগরগুলো গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে এবং কিছু কিছু গণতান্ত্রিক নিয়ম-বিধান মধ্যযুগেও প্রবর্তন করে।

সমাজে দাসদের আধিক্য কমতে থাকে। সামন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর উত্থান ঘটে। সরকার ও সরকার পদ্ধতিতে মাথা ঘামানোর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা এবং অবসর দু'ই এ মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর করায়ত্ব ছিল। এর ফলে প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীক দর্শনের স্বাধীন চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটল। রেনেসাঁর যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার-এর ধারণা পুনঃ সংজ্ঞায়িত হল। তখন মানবতাবাদ-এর উন্নয়ন ঘটল। পরবর্তী সংস্কার যুগে ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হল।

৩. পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ঃ

ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন রাজা চার্লস-প্রথম-এর ফাঁসী হয় (১৬৪২) তখন ইউরোপীয় একনায়ক সরকারগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক কর্মকান্ডগুলোর মধ্য দিয়ে বর্তমান আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ কর্মকান্ডগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপ্রাণিত ও পথ নির্দেশনা লাভ করে রাজনৈতিক দার্শনিকদের দ্বারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কো, জাঁ জাক, রুশো এবং আমেরিকার মুখপাত্র টমাস জেফারসন ও জেমস ম্যাডিসন। ঊনবিংশ শতাব্দী

শেষের প্রাক্কালেই উল্লেখযোগ্য সকল ইউরোপীয় রাজতন্ত্রই সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি গ্রহণ করে। এতে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং জনগণকে বেশ পরিমাণ রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়। এদের অনেকগুলো দেশেই বৃটিশ পার্লামেন্টের আদলে প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ফরাসী বিপ্লব শক্তিশালী প্রভাব ফেলে, বৃটিশ রাজনীতি এককভাবে বিশ্বের সকল গণতন্ত্রের উপর প্রভুত্ব করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সফলতা অনেকের দৃষ্টিতে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়।

আধুনিক গণতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা যা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দেয়; আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার; প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং সবার জন্য শিক্ষা। এ সব বৈশিষ্ট্য কতগুলো মহান ঐতিহাসিক দলিলে এ সব বিষয় দাবী করা হয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণায় গুরুত্ব সহকারে দাবী করা হয় জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সর্বোচ্চ ব্যক্তি সুখের অধিকার। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সকলের সমতার নীতি সত্যায়িত হয় ফরাসী ঘোষণায়; স্বাধীনতার চার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে আটলান্টিক চার্টারে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দুনিয়ার সকল দেশ অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে এবং বাস্তবে কিছুটা ভিন্নতা সহকারে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিকে গ্রহণ করেছে। যদিও গণতন্ত্রের আদর্শের ব্যাপক প্রচার প্রসার হয়েছে তথাপি বাস্তবে তার পূর্ণ অনুসরণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে হয়েছে।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা[1]

জুলাই ৪, ১৭৭৬; যুক্তরাষ্ট্রে তেরটি প্রদেশের সর্বসম্মত ঘোষণা

চলমান মানবতার ইতিহাসে একটি জনগোষ্ঠির জন্য তার উপর আরোপিত রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর ঘোষণার প্রয়োজন হয়। যে রাজনৈতিক বন্ধন তাদের পরস্পরকে সংযোজিত রেখেছে তাকে আলাদা করে পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি সম মর্যাদার – যা প্রকৃতি তাদের দান করেছে – ভিত্তিতে অবস্থান নিতে পারে। বিশ্ব জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর নিমিত্তে এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার আশু কারণ ব্যাখ্যা করা তাদের দায়িত্ব।

আমরা এ সত্যতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস করি যে, সকল মানুষই সৃষ্টগতভাবে এক এবং তারা সকলেই জন্মগতভাবে কতগুলো অবিভেদ্য অধিকার প্রাপ্ত। এ অবিভেদ্য অধিকারগুলো হচ্ছে জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখ সম্ভোগের অধিকার। এ সব অধিকারকে সমুন্নত রাখতে মানব সমাজে সরকার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। সরকারগুলো অবশ্যই জনগণের নিকট থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে সমর্থন আদায় করে গঠিত হওয়া উচিত। এটিও নিশ্চিত যে, যখনই যে কোন সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় কিংবা এ লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয় তখনই সরকারের অধীনস্তদের এ অধিকার সংরক্ষিত যে, তারা ঐ সরকারকে পরিবর্তন করে কিংবা বিলুপ্ত করে নতুন সরকার গঠন করে। সরকার ভেঙ্গে দেয়া কিংবা পরিবর্তন করার ভিত্তি এমন সব নীতি ও ক্ষমতার উপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে ঐ জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তির বিঘ্ন না ঘটে। **একনায়ক শক্তির স্বৈরশাসনে মানবতার অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়, যেমন ভুলুণ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক শক্তির অত্যাচারমূলক শাসনে। বর্তমান গ্রেট ব্রিটেনের রাজার ইতিহাস হল ক্রমাগত ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এবং বিভিন্ন উপনিবেশভুক্ত জনগোষ্ঠির অধিকার দলন।** .... (রাজার অপকর্মের একটা লম্বা তালিকা পেশের পর বলা হচ্ছে)............................

১. এটি একটি সুবিখ্যাত দলিল। এ দলিলে বৃটেনের তৎকালীন রাজার অপকর্মের এক বিরাট তালিকা রয়েছে। আমরা তালিকাটি বাদ দিয়ে সংক্ষেপে আমাদের আলোচনার সংশ্লিষ্ট অংশ বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

অত্যাচারের প্রতিটি স্তরে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার প্রতিকার প্রার্থনা করেছি। আমাদের বারংবারের প্রার্থনার জওয়াব এসেছে বারংবার অত্যাচারের মাধ্যমে। একজন রাজা যার সকল কাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অত্যাচার, তিনি মুক্ত স্বাধীন জনগোষ্ঠির শাসক হওয়ার অযোগ্য। এমনকি আমরা বৃটিশ ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সমর্থ হইনি। আমরা সময় সময় তাদেরকে আইনগত প্রতিবিধানের আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করেছি। আমরা আমাদের বিদেশ প্রবাসের অবস্থা তাদেরকে বুঝিয়েছি। আমরা তাদের স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও মহানুভবতার দরবারে আবেদন করেছি যে এরূপ অব্যবস্থা ও অত্যাচার চলতে থাকলে তার পরিণতিতে আমাদের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হবে। তারাও আমাদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব দেখাতে বধিরের ন্যায় আচরণ করেছে। **সুতরাং আমরা আমাদের একান্ত প্রয়োজনে তাদের সাথে বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিতে বাধ্য হলাম। আমরা তাদেরকে পৃথিবীর অপরাপর মানব গোষ্ঠির ন্যায় যুদ্ধে শত্রুজ্ঞান করবো এবং শান্তিতে বন্ধুজ্ঞান করবো।**

অতএব আমরা, **যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একটি সাধারণ সভায় একত্র হয়ে বিশ্বের চূড়ান্ত বিচার ব্যবস্থার সমীপে আমাদের এই উপনিবেশভুক্ত সকল মহৎ লোকদের আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে একটি পূত পবিত্র ঘোষণায় জানাচ্ছি যে, আমাদের এই উপনিবেশ এখন থেকে মুক্ত স্বাধীন। আমরা বৃটিশ রাজ্যের সকল ক্ষমতা থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত। এখন থেকে আমাদের সাথে বৃটিশের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন দেশের ন্যায় আমাদেরও যুদ্ধ ঘোষণার, শান্তি চুক্তি করার, জোট বাঁধার, বাণিজ্যিক চুক্তি করার অধিকার সংরক্ষিত। এই ঘোষণার সমর্থনে আমরা পরস্পরে আমাদের জীবন, ভাগ্য এবং পবিত্র সম্মানের কসম খেয়ে শপথ নিচ্ছি।** [অতঃপর ঐ শর্তটিতে প্রদেশের প্রতিনিধিদের নাম এবং তারা যে প্রদেশে প্রতিনিধিত্ব করেন তার তালিকা দেয়া হয়েছে।]

ফরাসী বিপ্লব ঃ মানবাধিকার ঘোষণা

ফরাসী জন প্রতিনিধিগণ একটি জাতীয় পরিষদে সংঘবদ্ধ হয়েছে এ মৌলিক বিশ্বাসে যে – গণ বিপর্যয় ও সরকারী দুর্নীতির মূল কারণ হল অজ্ঞতা, অবহেলা এবং অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ। এ পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন একটি পবিত্র ঘোষণার – যার মাধ্যমে মানুষের প্রতি প্রকৃতি প্রদত্ত, অবিলোপযোগ্য, মহান মানবাধিকারগুলো সার্বক্ষণিকভাবে সমাজের সকলের সম্মুখে প্রতিভাত হয় এবং তাদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে যে কোন মুহূর্তে সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে সকল রাজনৈতিক সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে তুলনামূলকভাবে বিচার করা যায় এবং অধিকতর শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্য অর্জন করা যায়। সর্বশেষে, **গণ অসন্তোষের প্রতিবিধানে সাংবিধানিক স্থিরতাই হল সকল শান্তির কারণ।** এ কারণে জাতীয় পরিষদ সর্বশক্তিমানের উপস্থিতিতে[২] এবং তাঁর আনুকূল্যে নিম্নের মানবাধিকার ও নাগরিকাধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয় ও ঘোষণা দেয়। ধারাসমূহ ঃ

১. মানুষ আজন্ম মুক্ত, স্বাধীন এবং অধিকারের দিক থেকে সকলে সমান। **সামাজিক মর্যাদার ভেদ কেবলমাত্র প্রকৃতিদত্ত যোগ্যতার কারণে নির্ধারিত হয়।**

২. সকল রাজনৈতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হল মানুষের এই স্বভাবগত, অবিলোপযোগ্য অধিকারের সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলো হচ্ছে– স্বাধীনতা, সম্পত্তির ভোগ-দখল, নিরাপত্তা এবং নির্যাতনের প্রতিরোধ করার অধিকার।

৩. **সার্বভৌমত্বের সকল বিষয় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জাতিসত্তার উপর ন্যস্ত।** কোন ব্যক্তি বা সত্তা জাতির অনুমোদনের বাইরে কোন অধিকার ভোগ করতে পারে না।

---

১. ফরাসী জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত; ২৬শে আগস্ট ১৭৮৯ সন।

২. পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের সংবিধানে সর্বশক্তিমানকে অস্বীকার করেনা। তবে দুনিয়ার জীবনে সর্বশক্তিমানের কোন কর্তৃত্বকেই তারা স্বীকৃতি দেয়না। ফরাসী বিপ্লবের মানবাধিকার ঘোষণার পরবর্তী ৫/৬ বছরের মধ্যেই তারা পরিপূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং সমাজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দীতে সর্বশক্তিমানের কোন আইনের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। বৃটিশ এবং আমেরিকান পার্লামেন্টেও তাই করে।

৪. **স্বাধীনতা অর্থ হল অন্যের ক্ষতি হয় না এমন যে কোন কিছু করার অধিকার**। সুতরাং প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিদত্ত অধিকার ভোগের পথে কেবল সেসব বিষয়ই বাধারূপে স্বীকৃত যা সমাজের অন্যদের সেই একই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দেয় না। এ সীমাবদ্ধতা কেবলমাত্র আইন দ্বারাই নির্ধারিত হতে পারে।

৫. **আইন কেবলমাত্র সেসব বিষয় নিষিদ্ধ করতে পারে যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর**। আইনে যা নিষিদ্ধ নয় তা করতে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না এবং কাউকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা যাবে না যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট নয়।

৬. **জনগণের সাধারণ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হল আইন**। প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে। কি শাস্তি, কি নিরাপত্তা, সর্বক্ষেত্রে সকলের জন্যই এই অধিকার সমান। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিতকরণে প্রতিটি নাগরিক তাদের যোগ্যতানুযায়ী সকল সম্মান পাওয়ার কিংবা জনগুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হবার এবং পেশা গ্রহণ করার সমান অধিকার সংরক্ষণ করে। ব্যক্তিগত যোগ্যতা কিংবা মেধার পার্থক্য ছাড়া কোন প্রকার ভেদনীতি অগ্রহণযোগ্য।

৭. আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত কারণ ব্যতীত কেউ অভিযুক্ত হবে না, গ্রেফতার হবে না কিংবা কারারুদ্ধ হবে না। কেউ যদি এ আদেশের বরখেলাপ কোন অনুরোধ করে, কার্য সম্পাদন করে কিংবা কার্য-সম্পাদনের কারণ হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আইনের প্রয়োজনে কোন নাগরিকের প্রতি সমন জারি হলে কিংবা গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হলে তার উচিত অনতিবিলম্বে আইনের নিকট নিজেকে সোপর্দ করা, কারণ এর প্রতি কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করাই হল অপরাধ।

৮. আইন কেবলমাত্র সেই শাস্তিই নির্ধারণ করবে যা কার্যতঃই অত্যাবশ্যক। কেউই কোন শাস্তি ভোগ করবে না যতক্ষণ না তার দ্বারা আইনের বিপরীত কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই আইনটি নির্দিষ্ট হয় ও প্রচারিত হয়।

৯. যেহেতু সকল মানুষকে নির্দোষ ধরা হয় যতক্ষণ না সে দোষ প্রমাণিত হয়, এমতাবস্থায় গ্রেফতার অপরিহার্য হলে, বন্দীর নিরাপত্তার প্রয়োজন ব্যতীত সকল রুক্ষ ব্যবহার আইন দ্বারা অবদমিত থাকবে।

১০. কাউকে তার মতামতের কারণে তিরস্কার করা হবে না, এমনকি তা তার ধর্ম মত হলেও, যতক্ষণ না তার ঐ মত জন অসন্তোষ এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার বিপরীত হয়।

১১. চিন্তার স্বাধীন বিনিময়, মহান মানবীয় অধিকারগুলোর অন্যতম; তাই প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে কথা বলতে, লিখতে, ছাপাতে পারবে, কেবলমাত্র আইনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত অপব্যবহার এর জন্য দায়ী থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

এ ধারাগুলোর মধ্যে ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ধারা ধর্ম নিরপেক্ষ মানব রচিত আইনের সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিত করে। **এখানে *রাষ্ট্র দ্বীনকে* নিয়ন্ত্রণ করার সর্বময় অধিকার সংরক্ষণ করে। *দ্বীন রাষ্ট্রকে* নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার এখানে স্বীকৃত নয়। এখানে সর্বশক্তিমানের কোন কর্তৃত্বই স্বীকৃত নয়**। মানুষগণ নিজেদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে যা কিছু হালাল বা বৈধ করবে কিংবা হারাম বা নিষিদ্ধ করবে তাই এখানে আইনের স্বীকৃতি লাভ করবে। **এর উপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য সমাজে মদ, জুয়া, দেহ ব্যবসা, লিভ টুগেদার, সমকামি বিবাহের অধিকারসহ যাবতীয় দ্বীন বিরুদ্ধ বিষয় সংবিধানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ধারা ৪-এ স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেবল অন্য জনের অনুরূপ অধিকার ভোগে বাধা হয় এমন কাজকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। অথচ এমন অনেক অপরাধ সম্ভব যা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা পালন করেই সংঘটন করা সম্ভব। এ জাতীয় অপরাধগুলোর একটিও আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বকে মেনে নেয়া ছাড়া এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কার্যকর করা ছাড়া দমন সম্ভব নয়। কথিত গণতান্ত্রিক সংবিধান ও রাষ্ট্র তাই কাঙ্খিত সুস্থ সমাজ বিকাশ ও প্রকৃত সভ্যতার লালনে ব্যর্থ। নারী স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা সহ সকল অনাচার আইনের আশ্রয়েই বিকাশ লাভ করছে**। আমাদের দেশ তথা মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সুর ও সমর্থন ঐ একই প্রকার। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ জাতিসংঘের আওতায় যে সব মানবাধিকার সংস্থা কাজ করছে তারা সকলেই মানব রচিত আইন (যা পাশ্চাত্য স্বীকৃতি লাভ করেছে)-এর অধীনে যে সব স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়া হয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণ-এর কাজই করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের প্রচলিত পাঠ্যসূচীতে ঐ একই বিষয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং গণতন্ত্র এ সব বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ সব বিষয়কে দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা আর দ্বীনকে অস্বীকার করা যে এক, একথা বুঝতে অপারগ হবেন কেবল সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যারা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ভুলে দ্বিমুখী আচরণের নীতি অবলম্বন করছেন।

১২. মানবাধিকার এবং নাগরিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনশক্তির প্রয়োজন। এই জনশক্তির দায়িত্বে নিয়োজিতদের ব্যক্তিগত সুযোগের জন্য নয় বরং দেশের সকলের কল্যাণের জন্যই এই জনবল গঠিত হবে।

১৩. প্রশাসন পরিচালনা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক দান-অনুদান অত্যাবশ্যক; এই অনুদান সকল নাগরিকের নিকট তাদের উপায়-উপকরণের অনুপাতে সামঞ্জস্যশীলভাবে ধার্য হবে।

১৪. প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তার সিদ্ধান্ত জানাতে যার দ্বারা কর ধার্যকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং স্বাধীনভাবে তার পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব। কোন খাতে তা ব্যয় হবে, কি অনুপাতে কিভাবে তা আদায় হবে এবং কত সময়ের জন্য তা প্রযোজ্য হবে এসব নির্ধারণের অধিকারও সকলের জন্য সংরক্ষিত।

১৫. সমাজের অধিকার রয়েছে প্রশাসনিক কাজে প্রতিটি নাগরিককে প্রয়োজন অনুযায়ী দায়িত্ব দেয়ার।

১৬. যে সমাজের আইনের প্রয়োগ অনিশ্চিত, ক্ষমতার বিভাজন অসংজ্ঞায়িত তার কোন সংবিধান নেই।

১৭. যেহেতু সম্পত্তির অধিকার একটি অবিভেদ্য পবিত্র অধিকার তাই কাউকে এ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে, ব্যতিক্রম হল– যদি বৃহত্তর জনকল্যাণে উক্ত বঞ্চনা অবধারিত হয়, যা আইনের মাধ্যমেই স্থিরীকৃত হয় এবং আইনও তাই চায় এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্তকে তার ক্ষতির সমপরিমাণ বিনিময় দিয়ে দিতে হবে।

গণতন্ত্র ঃ পাশ্চাত্যের ভাবশিষ্যরা যা বলেন

সংসদীয় গণতন্ত্র [১]

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংসদীয় গণতন্ত্র। .... গণতন্ত্রের অনেকগুলো কার্যকর ধরন রয়েছে। **তত্ত্বীয় ও বাস্তব অর্থে গণতন্ত্র শুধুমাত্র সরকার গঠন পদ্ধতি নয় বরং এই পদ্ধতির বাইরে আরও কিছু বিষয় জড়িত করে। যেমন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী Hern Shaw বলেন– "গণতন্ত্র শুধুমাত্র সরকার গঠন পদ্ধতির নাম নয়। এটি এক প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং এটি এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থাও। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র এমন একটি পদ্ধতি যা সরকার গঠন, সরকার নিয়ন্ত্রণ এবং সরকার বিলোপের বিষয় নির্ধারণ করে।"**[২]

গণতান্ত্রিক সরকার তখনই সর্বোত্তমভাবে কার্যকর হয়, যখন যে সমাজ ও রাষ্ট্র ঐ ব্যবস্থাকে ধারণ করে, সে সমাজ ও রাষ্ট্র, তত্ত্বীয় ও বাস্তব অর্থে, একই মানসিকতা তথা গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়। ঐ জীবন পদ্ধতির মূলে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তবে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার চর্চা, সংরক্ষণ ও আশংকামুক্ত রাখা হয় সাংবিধানিক রক্ষাকবচের মাধ্যমে। তাই সাংবিধানিক স্থায়িত্ব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির মর্মমূল।

ঐ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি আবার গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিসমূহের ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত বিষয়ের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আধুনিককালে বিশাল

---

১. গণতন্ত্রে উত্তরণ গণতন্ত্র বিনির্মাণ– বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহ্মদ, পৃষ্ঠা ৯২-৯৬; এটি তাঁর একটি ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদ।

২. গণতন্ত্র একটি আদর্শের রাজনৈতিক শ্লোগান। খন্ডিতভাবে সরকার নির্বাচন কিংবা সরকার বিলোপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে গেলে বলবো "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। গণতন্ত্র যে আদর্শ এ কথা পাশ্চাত্য খোলাখুলিভাবেই বলে এবং আমাদের দেশে যারা প্রকৃত গণতন্ত্রমনা তারাও একে আদর্শরূপেই গ্রহণ করে।

জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে প্রাচীন গ্রীসে বিকশিত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবাস্তব। তাই আজকের সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই অপ্রত্যক্ষ। এটি অবশ্যই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা যা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি কিংবা সংসদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে। সরকারের তিনটি মৌলিক বিভাগ– শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি অবশ্যই উন্নততর ও পরিচ্ছন্নতর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এতে অধিকতর কল্যাণকর Check and Balance প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেহেতু সংসদীয় কেবিনেট পদ্ধতিতে আইন সভা ও কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে আংশিক মিশ্রণ থাকে তাই এতে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে অধিকতর সমঝোতা ও সহযোগিতার দাবী রাখে। সরকার প্রধান এবং কেবিনেট আইন সভার অত্যাবশ্যকীয় অংশীদার এবং উভয়ে যৌথভাবে আইন সভার নিকট দায়বদ্ধ। তাই এই বিশেষ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র সহযোগী ও সহমর্মী সংসদ সর্বোত্তম সরকারী ব্যবস্থাপনা দিতে পারে। স্বাধীন সদা সতর্ক বিচার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের চাই তা প্রেসিডেন্সিয়াল হোক কিংবা সংসদীয় হোক উভয় পদ্ধতিতেই দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধতা নিশ্চিত করে। এটিই অব্যর্থভাবে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় জীবন পদ্ধতির মূলনীতি, তথা আইনের শাসন, আইনের চোখে সকলের সাম্যতা নিশ্চিত করে। অবশ্য বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও শক্তি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে অন্য সব সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনসমূহের শক্তি ও সুসংবদ্ধতার উপর।

সংসদীয় পদ্ধতিতে সংসদ সাধারণতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যেমন বৃটিশ পার্লামেন্ট– যাকে যথার্থই সংসদীয় পদ্ধতির জনক বলে অভিহিত করা হয় এবং অন্যান্য দেশ যাকে আদর্শ বলে গণ্য করে সার্বভৌমত্বের অধিকার ভোগ করে। বৃটিশ পার্লামেন্ট ঠিক আইনসম্মত পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি। এটি সে দেশের বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে– যা শুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। বলা হয় Parliament শব্দটি Parley থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থ আলোচনা ও পরামর্শ।

হেনরি তৃতীয় - যার শাসনকালের শেষ ভাগকে সংসদীয় পদ্ধতির বীজ বপন কাল বলা হয়- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাবশালী Baron-দের সাথে পরামর্শ (Parley) করতেন। বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতির নিয়মতান্ত্রিক পরামর্শ সভা ১২৬৫

খৃষ্টাব্দ থেকে নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। হেনরীর মৃত্যুতে তার পুত্র এড্ওয়ার্ড-প্রথমও একই উৎসাহ নিয়ে নিয়মিত পরামর্শ সভা Parley-তে বসতেন। **রাজার ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ব্যারনগণ সক্রিয় হত, অপরদিকে রাজস্ব ধার্য করার জন্য রাজাকে ব্যারনদের উপর নির্ভর করতে হত**। এ সংসদীয় পদ্ধতি মহা বিপর্যয়ে পড়ে যখন স্টুয়ার্ট ডাইনেস্টি-এর রাজাগণ অতি-প্রাকৃতিক ডিভাইন ক্ষমতার অধিকারের দাবী তুলল। রাজা চার্লস অসংখ্য বার সংসদ বিলোপ করলেন, যার পরিণতিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হল এবং যার শেষ পর্যায়ে সংসদীয় পদ্ধতির বিজয় ঘোষিত হল এবং রাজার পরাজয় ও মৃত্যুদন্ড কার্যকর হল ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে সংসদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সুসংহত হল এবং মানবাধিকার বিল পাশ হল। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা আরও কয়েক ধাপ উন্নতি লাভ করলো একটি ঐতিহাসিক দৈবক্রমে। হ্যানোভারিয়ান রাজবংশের দুই রাজা, জর্জ-প্রথম এবং জর্জ-দ্বিতীয় ইংরেজি জানতেন না। তাই তারা মন্ত্রী পরিষদের সভাপতিত্ব করতে এবং প্রশাসনিক খুঁটিনাটি বিষয় তদারক করতে উৎসাহী ছিলেন না, এ বিষয়গুলো একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া হলো, যাকে কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বলা হতে লাগলো এবং কার্যতঃ এই প্রধান মন্ত্রীই সরকার প্রধান রূপ ধারণ করলো। এভাবেই ক্যাবিনেট (মন্ত্রী পরিষদ) সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। **বৃটিশের উপনিবেশগুলোর প্রতিটিকে যখন রাজ্য হিসেবে একজন রাজার অধীনে দেয়া হয়, যেমন ১৮৬৭ সনে কানাডাকে এবং ১৯০১ সনে অস্ট্রেলিয়াকে তখন এই মন্ত্রীসভা শাসিত সরকার পদ্ধতিকে ঐসব রাজ্যে প্রোথিত করা হয় এবং দেখা গেল এ পদ্ধতির সরকারগুলো ভালই ফল দিচ্ছে। ১৯৪৭ সনে যখন ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া নামে দু'টি রাজ্যে পরিণত হল তখন ক্ষমতা হস্তান্তর কালে সেই একই পদ্ধতির সংসদীয় গণতন্ত্র উভয় রাজ্যে আশা করা গিয়েছিল। এই পদ্ধতি ইন্ডিয়াতে ফলপ্রসূ হল কিন্তু পাকিস্তানে তা শোচনীয়ভাবে অকার্যকর প্রমাণিত হয়**। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের অস্তিত্বের ২৪ বছরের মধ্যে প্রথম দশ বছর সংসদীয় গণতন্ত্র কোনভাবে টিকেছিলো। বাকী সময়গুলো সামরিক ও একনায়ক সরকারের শাসনেই শেষ হলো। **স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র কেবল তিন বছর টিকেছিলো, ১১ই জানুয়ারী ১৯৭২ থেকে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫ পর্যন্ত**। এ পদ্ধতিটি

পরবর্তীতে ৮ মাসের জন্য একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে পরিণত হল। এরপর ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার পর্যন্ত এখানে সামরিক ও একনায়ক সরকার ব্যবস্থা চলছিলো। অবশ্য তার ৬ মাস পর সেপ্টেম্বর ১৯৯১ থেকে সংবিধানের দ্বাদশতম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতি এখনও চলছে, তবে প্রশ্ন হল এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্পর্কে।

আমি যেমন প্রথমেই বলেছিলাম, একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার - **"সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকার"** ও **"সংখ্যালঘিষ্ঠের সমালোচনার অধিকার"** এর ন্যায় মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সংখ্যা লঘিষ্ঠকে অবশ্যই বিদ্বেষহীনভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নিতে হবে। অপরদিকে সরকারের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করা ও সমালোচনা করার সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারকে কখনই অস্বীকার করা উচিত নয়। পরস্পরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বাধিক সহ্য করা একান্তই প্রয়োজন। **সংসদ সার্বভৌম সত্তা**। কিন্তু আইন-প্রণয়নই এর একমাত্র কাজ নয়। যেহেতু সকল প্রশাসনিক পদক্ষেপে মন্ত্রীপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী তাই সংসদকে অবশ্যই মন্ত্রণালয়গুলো এবং ডাইরেক্টরেটগুলোর তত্ত্বাবধান করতে হয়। এটি করা সম্ভব সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে যেগুলোর পক্ষে খুঁটিনাটি বিষয় দেখার জন্য অধিকতর সুযোগ রয়েছে। এসব কমিটির পক্ষে মন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণকে বাদ দেয়া উচিত নয়, কারণ কমিটির প্রতিবেদনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। অবশ্য এই প্রতিবেদন মূল সংসদে জমা দিতে হয়। যে মন্ত্রী তার বিরোধী পক্ষের অভিজ্ঞ জনকে এ ধরনের সংসদীয় কমিটিতে আহ্বান করেন তিনি বিচক্ষণ। এসব সংসদীয় কমিটিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন বাস্তবসম্মত নয়। এসব কমিটির সদস্যদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতাই হল মৌলিক গুরুত্বের বিষয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হল এমন সব রাজনৈতিক দলের যারা নীতি নির্দ্ধারণ করে, জনমত গঠন করে এবং যখন ক্ষমতায় থাকে তখন নিজ দলকে সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। তাই দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চাকে নিশ্চিত করতে হবে, দলের নেতৃত্বকে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নির্বাচিত হতে হবে এবং নির্বাচন করার এ ক্ষমতাকে দলের কোন বিশেষ প্রভাবশালীর কুক্ষিগত হতে দেয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উচিত সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। তা না হলে তারা সরকারের

দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে। সরকারের এই দৈনন্দিন কাজগুলো সাধারণতঃ সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক পদক্ষেপে সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ হওয়া উচিত নয়। বৃটিশ সংসদীয় সরকারের সফলতার একটি বড় কারণ হল তার স্থায়ী রাজ-কর্মচারীদের নিঃস্বার্থতা, অতি দক্ষতা এবং রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি চূড়ান্ত নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য। সরকারী কর্মচারীদের উচিত নয় যে তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট থেকে অবৈধ আনুকূল্য গ্রহণ করে তাদের পদোন্নতি, কার্যকালের প্রলম্বিতা কিংবা বিদেশে পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করবে। যেহেতু সরকারী এবং বিরোধী দল উভয়েই একই বৃত্তে আবদ্ধ সুতরাং উভয়ের মাঝে সহযোগিতা থাকা অত্যাবশ্যক। যদি উভয়ের তিক্ত সম্পর্কের কারণে পরস্পরে পরস্পরের বর্তমান কিংবা অতীত ভুলের কিংবা ভবিষ্যৎ কোন কাল্পনিক ভুল উল্লেখ করে গালাগালিতে নিয়োজিত হয় তখন কোন প্রকার সহযোগিতা সম্ভব হয় না। অপরদিকে প্রশাসনিক বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম নজরদারীর জন্য বিরোধী দলের ছায়া মন্ত্রীসভা গড়া আবশ্যক। এতে বিরোধী দলকে দায়িত্বশীল করে গড়া হয়।

মন্ত্রী সভা পদ্ধতির সরকারের অন্তর্নিহিত ঐক্যবদ্ধতা সামষ্টিক দায়বদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। সামষ্টিক দায়বদ্ধতার মানে হল সকল মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও সমষ্টিগতভাবে যে কোন মন্ত্রণালয়ের যে কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন সংসদের নিকট। সেখানে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হওয়া উচিৎ। মন্ত্রীসভার ভয় বা আনুকূল্য কোনটারই পরওয়া করা উচিত নয়। ভিন্নমত প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু একবার যখন সিদ্ধান্ত হবে তখন তা হবে সকলের মিলিত সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর কোন মন্ত্রীরই এ অধিকার থাকে না যে বলবে, অমুক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি জানি না কিংবা অমুক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি ভিন্নমত পোষণ করি। সংসদের এবং প্রশাসনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রীর উচিৎ নয় সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করা কিংবা অন্য সকলের মতামতকে উপেক্ষা করা। গণতান্ত্রিক শাসনের মূল হল এমন মুক্ত স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা যেখানে অর্থবল, পেশীবল, সন্ত্রাস কিংবা অপর কোন অবৈধ চাপের প্রয়োগ হবে না। অপর পূর্বশর্ত হল মুক্ত স্বাধীন সংবাদ-ব্যবস্থা। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া- যা প্রচারণার বড় হাতিয়ার-এমন সব চরিত্রবান বিচক্ষণদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত যারা

কেবলমাত্র সরকার বা মুরুব্বীদের কথার প্রতিধ্বনি করবে না। সর্বোপরি সরকার এবং বিরোধীদল উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে একমত ও দৃঢ় থাকা উচিত যে সবার উর্ধ্বে দেশ, আর সব তারপর; এবং প্রতিষ্ঠান সকল ব্যক্তির কিংবা দলের উর্ধ্বে।

বিঃ দ্রঃ-

ইউরোপ-আমেরিকার সাংসদগণ গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা প্রচার করে কিংবা সেখানকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ গণতন্ত্র সম্পর্কে যা বলেন; আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গণতন্ত্র শিক্ষা দেয়া হয় তার মধ্যে এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামি কোন দল এবং ব্যক্তিত্ব যখন গণতন্ত্রের ওকালতি করেন তখন তারা যে এর বাইরে অন্য কোন পদ্ধতির কথা বলছেন এ কথা বাইরের লোক তো বুঝবেইনা বরং এখানকার সাধারণ ইংরেজি শিক্ষিত জনরাও বুঝবে না। এমতাবস্থায় **"গণতন্ত্র"** নয়, সরাসরি **"ইসলাম"**কে উপস্থাপন এবং **"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র"** নয়, **"খিলাফাতু আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ"** বলাই সততা ও সাহসিকতার পরিচায়ক। আর খিলাফাহ্র দাবীকে উর্ধে তুলে ধরাই মু'মিনদের কর্তব্য।

খিলাফাহ্কে আড়াল করে গণতন্ত্রের শ্লোগান

এ যাবৎ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মনস্তাত্বিক অবস্থান উপস্থাপনের সাথে এদেশীয় প্রকৃত গণতন্ত্রের বোদ্ধাদের যে কি চমৎকার মিল তা দেখান হয়েছে। বর্তমান কলেজ-ভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের আলোচনাগুলো পড়লে দেখা যাবে ঐ একই কথা। **গণতন্ত্র শুধু ক্ষমতার হাত বদলের প্রক্রিয়ার নাম নয় বরং এটি একটা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, এর রয়েছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা, এর সাথে রয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধের সংশ্লিষ্টতা।** সুতরাং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি। একে বর্তমান Judeo Christian Civilization -এর ধারক-বাহক পাশ্চাত্য, বিশেষ করে বিশ্ব তাগুত আমেরিকা তার Novus Ordo Seclorum -এর আওতায় সমগ্র বিশ্বে তার বস্তুবাদী ভোগবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শনে একীভূত করার উদ্দেশ্যে নিরন্তর চেষ্টা করে বাকী বিশ্বসহ তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসকদের দ্বারা চর্চা করাতে সফল হয়েছে।

গুটি কয়েক দ্বীন সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সোয়াশ কোটি জনসাধারণের প্রায় সকলেই পশ্চিমা জীবন-ধারার দুনিয়াবী জৌলুসে মোহগ্রস্ত। ঠিক এমন ঐতিহাসিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে **যদি কোন দ্বীনি আন্দোলনের নেতা কিংবা দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ইসলামের রাজনৈতিক ধারণার প্রকৃত পরিভাষা "খিলাফাহ্" শব্দকে "গণতন্ত্র" শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চান, তিনি মুসলিম জনগণকে ইসলাম থেকে দূর করে পাশ্চাত্যের কুফরি মতবাদের দিকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।** **"জনগণ সার্বভৌম"** এ বাক্যকে শিরোধার্য করে শপথ করার পরও যদি তাঁরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর অর্থের সাথে কোন দ্বন্দ্ব অনুভব না করে থাকেন তাকে কি অজ্ঞানতা বলবো, না জেনে-বুঝে পাপ করা বলবো, তার বিচারের ভার পাঠকের উপর রইল। এখানে আমাদের বর্তমান আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার স্বার্থে যেসব ইসলামি ব্যক্তিত্ব খিলাফাহ্কে গণতন্ত্রের আড়ালে লুকোবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তাদের প্রতিনিধিত্বশীল তিনজনের তিনটি সমসাময়িক লেখার পর্যালোচনা পাঠকের খেদমতে পেশ করা হলো।

ইতোপূর্বে খিলাফাহ্র বৈশিষ্ট্য এবং আমরুহুম শুরা বাইনাহুম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এ সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোহে আবিষ্ট ইসলামপন্থীদের বর্তমান পদক্ষেপ কতখানি ভ্রান্তিপূর্ণ তা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। এ আলোচনায় প্রথমে **"রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র"** [১] এ শিরোনামে ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর একটি লেখা সম্পর্কে বলছি। দৃশ্যত সম্মানিত ড. ইউসুফ আল-কারযাভী একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, স্বৈরতন্ত্র, সামরিক শাসন এবং রাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রমূলক জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ শাসনের বিপরীতে গণতন্ত্র একটা বিকল্প এবং অধিকতর কল্যাণকর ব্যবস্থা। তিনি বলেছেন, "(ইসলামি দলগুলোকে) স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে হবে যে, তাঁরা জালেম শাসকদের স্বীকার করে না এবং একনায়কত্ববাদীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এমনকি কোন জালেম শাসক সাময়িকভাবে কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে দৃশ্যত আন্দোলনের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করলেও।" তাঁর দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া ইসলামি আন্দোলনের বিকাশ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আধুনিক কালের মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে ঘনিষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন পরিবেশ ছাড়া ইসলামি চিন্তা ধারা, ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি জাগরণ বিকাশ লাভ করেনি অথবা ফলপ্রসূ হয়নি।" তিনি আরও বলেন, "সুতরাং আমি কল্পনাও করতে পারিনা যে ইসলামি আন্দোলন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন কিছুকে সমর্থন দিতে পারে।" তাই তিনি আহ্বান করেছেন, "মেকি নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে।" অর্থাৎ রাখ-ঢাক না রেখে তিনি "প্রকৃত গণতন্ত্রের" পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইস-লামি আন্দোলনগুলোকে আহ্বান করেছেন। পাশ্চাত্য জগত যে গণতন্ত্রের কথা বলে সেটাই গণতন্ত্র। এর জায়গায় ইসলামপন্থীরা "যে ইসলামি গণতন্ত্র" কিংবা "শর্ত সাপেক্ষ গণতন্ত্র" কিংবা "রূহানী গণতন্ত্রের" কথা বলে তাই বরং মেকী গণতন্ত্র। এখন দেখুন জনাব ড. ইউসুফ আল-কারযাভী কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রবক্তা। অর্থাৎ তিনিও পাশ্চাত্যদের প্রেরিত প্রকৃত গণতন্ত্র চাইছেন। অপরদিকে ইসলামি চিন্তাধারা, ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি জাগরণ বিকাশ লাভের জন্য কারযাভী

১. Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase বই-এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে এ প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে।

গণতন্ত্রকে যে পূর্বশর্তরূপে ঘোষণা করেছেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে না। কারণ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সময়কার ইসলামের বিকাশ কিংবা তাতারিদের হামলার পর ইসলামি শরীয়াহ্র পুনঃ প্রবর্তনে গণতন্ত্রের কোন ভূমিকা ছিল বলে কেউ কি দাবী করতে পারবেন? আফগানিস্তানে তালেবানদের দ্বারা বিকশিত ইস-লামি আন্দোলন এবং ইরানের সফল ইসলামি আন্দোলন বরং নেহায়েত অগণ-তান্ত্রিক পরিবেশেই বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্কের মত দেশে দীর্ঘ দিন গণতন্ত্রের চর্চা থাকার পরও এই দেশগুলোতে ইসলামি আন্দোলন এখনও কোন প্রকার ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ঐ একই লেখায় তিনি আবার ভিন্ন সুরেও বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, "অনেকের আশঙ্কা যে, গণতন্ত্র জনগণকে শক্তির উৎস মনে করে এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও, যদিও কেবল আল্লাহ্রই অধিকার রয়েছে আইন প্রণয়ন করার। এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ আমরা যে জনগণের কথা বলছি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে মুসলমান এবং তারা আল্লাহ্কে প্রভু, মুহাম্মদ (স.)-কে রাসূল ও ইসল-ামকে দ্বীন হিসাবে মেনে নিয়েছে। এ জনগণতো ইসলামের অলঙ্ঘনীয় নীতিমালা, চূড়ান্ত বিধি-বিধানের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে বলে আশা করা যায় না। ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধানের পরিপন্থী যে কোন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে এমন একটি অনুচ্ছেদের সংযোজন করে এ আশঙ্কা দূর করা যেতে পারে। আমরা মূলগ্রন্থ কোরআন, শরীয়াহ্র সামগ্রিক লক্ষ্য ও ইসলামের মর্মবাণীর সীমার মধ্যে থেকে আইন-বিধি প্রণয়ন করতে চাই।"

সম্মানিত লেখকের এই দ্বিতীয় বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা -

১. এ বক্তব্যে লেখক বলতে চেয়েছেন মুসলিম জনগোষ্ঠির মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে পার্লামেন্ট হবে তা কোরআন ও সুন্নাহ্র অলঙ্ঘনীয় নীতিমালা বা চূড়ান্ত বিধি-বিধানের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না। জেগে ঘুমালে মানুষের যা হয় এ সম্মানিত বুদ্ধিজীবীর অবস্থা তাই বলে প্রতীয়মান হয়। চোখের সামনে ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, তুরস্কসহ যে সব গণতন্ত্র চর্চাকারী মুসলিম দেশ রয়েছে তাতে সুদ, বেশ্যাবৃত্তি, মদ ও জুয়াসহ ইসলামের সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ আইনের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং চালু থাকছে। তবে কি জনাব কারযাভী বলতে চাইছেন এগুলো কোরআন-সুন্নাহ্র অলঙ্ঘনীয় নীতিমালা বা চূড়ান্ত বিধি-বিধানের

অন্তর্ভুক্ত নয় ? না কি তিনি বলতে চাইছেন উল্লিখিত দেশসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিমই নয় ? কোনটা ?

২. এই বক্তব্যের শেষাংশে তিনি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সামগ্রিক লক্ষ্য ইসলামের মর্মবাণীর মধ্য থেকে আইন প্রণয়ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। এটাতো স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামের সব বিষয়ের নীতিমালা ইসলামি পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হতে পারে। বাইরে থেকে আমদানী করা কোন কিছুর মিশ্রণ সেখানে কাম্য নয়। সুতারাং ইসলামি আইন ইসলামি পদ্ধতিতেই কেবল প্রণয়ন হতে পারে। আইন হবে ইসলামি, আর তা প্রণীত হবে ইয়াহুদী-নাসারাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে এমনটি শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার বিরুদ্ধ কথা। অপরদিকে খাঁটি গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের দৃষ্টিতেও এহেন মিশ্রণ বরং গণতন্ত্রকেই কলুষিত করে "মেকী গণতন্ত্রে" পরিণত করে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার জনাব কারযাভী বক্তব্যের শুরুতেই বলেছেন "মেকী নয়" "প্রকৃত গণতন্ত্রের" প্রতিনিধিত্বকারী স্বাধীনতার পথে আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে।

৩. ইসলাম পরিপূর্ণতার দাবী করে। এখানে উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সবই কোরআন ও সুন্নাহ্ অনুমোদিত সীমার ভিতরে হতে হয়। ইজমা ও ক্বিয়াস এখানে স্বীকৃত পন্থা। তবে সে ক্বিয়াস যিনি করবেন তাঁর ব্যাপারে কিছু পূর্ব শর্ত অবশ্যই থাকবে। কোন ইয়াহুদী কিংবা নাসারার ক্বিয়াসলব্ধ কোন কিছু ইসলামে সংযোজন করার কৃতিত্বকে ক্বিয়াস বলে ইসলাম কখনও স্বীকার করবে না। গণতন্ত্র চর্চার প্রতি আহ্বান জানানোর আগে আমাদেরকে নিশ্চিত জানতে হবে "গণতন্ত্র" ইসলামের প্রখ্যাত কোন কোন ফকিহ্‌র ক্বিয়াসের ফসল। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে জনাব কারযাভী কোনভাবেই প্রমাণ করতে পারবেন না যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কোন মুসলিম ফকিহ্-এর ক্বিয়াস-এর ফসল। সুতরাং গণতন্ত্রের এই সংযোজন যে অগ্রহণযোগ্য তা স্বতই প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, **"আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ যোগ করেই কেবল আমরা আমাদের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে অঙ্গীভূত করতে পারি।"** চমৎকার স্বীকারোক্তি !! অর্থাৎ তিনি স্বীকার করছেন গণতন্ত্র আমাদের নয়, এটি পশ্চিমা এবং তিনি এই পশ্চিমা বিষয়টিকেই ইসলামের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করতে চান। প্রশ্ন হলো বাইরের এ বস্তুটি যদি সংযোজন না করি তাহলে ইসলামের

কি ক্ষতি ? সংযোজন না করলে যদি ইসলামের ক্ষতি হয় তা হলে তর্কের খাতিরে বলতেই হয় ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ। এটি কোন ঈমানদার কখনই মানবে না। অপরদিকে এটি সংযোজন না করলে যদি ইসলামের কোন ক্ষতি না হয়, (বাস্তবে কোন ক্ষতিই হবে না বলে সকল ঈমানদার নিশ্চিত) তা হলে জনাব কারযাভী কার স্বার্থে কোন উদ্দেশ্যে তাকে সংযোজন করতে চাইছেন ? একমাত্র খিলাফাহ্‌র দাবীকে গণতন্ত্রের বেদীমূলে জবাই করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য এর পেছনে আছে বলে মনে হয় না।

খ. **"ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র"** [২] নামক নিবন্ধটি এ প্রসঙ্গে আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এটি এদেশের সুপরিচিত আমলা জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান সাহেবের লেখা। এ লেখায় তিনি "শর্তাধীন গণতন্ত্রের" ধারণা উপস্থাপন করেছেন। গণতন্ত্রের সপক্ষে জনমত গড়ার জন্য ইসলামি বুদ্ধিজীবি বলে পরিচিতজনদের মধ্যে যারা সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন তাদের একজন প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বলেন, "শর্তাধীন গণতন্ত্র" শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি যে, ইসলাম আগ্রাসী এবং একনায়কত্ববাদী (Violent Authoritarian) এ সব দূর হবে। মুসলিম বিশ্বেও এর ফলে রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ ইতোমধ্যেই "শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র" পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন।

বোঝা গেল "শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র" গ্রহণ করলে পাশ্চাত্যে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। "আগ্রাসী" এবং "এক নায়কত্ববাদী" নামে আমাদের যে কালিমা রয়েছে তা মুছে যাবার একটা পথ হবে। দ্বিতীয় ঃ আমাদের রাজা-বাদশাহ যেমন সৌদি আরবসহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন ক্ষমতাসীন এক নায়করা আর অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। তাঁর এ বক্তব্যে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন পাশ্চাত্যের নিকট মুখ উজ্জ্বল করার প্রয়োজনে এবং আমাদের রাজা-বাদশাহ্‌দের অন্যায় শাসন থেকে বাঁচার লক্ষ্যে শর্তসাপেক্ষ-গণতন্ত্র চর্চা অপরিহার্য। আমাদের রাজা-বাদশাহ্‌দের অন্যায় স্বৈরশাসন এতে বন্ধ হবে কি না জানিনা (কারণ চোখের সামনেই আমরা আমাদের দেশের নির্বাচিত সরকারগুলোর একনায়কসুলভ চেহারা হর হামেশা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি) তবে, তাঁর প্রথম আশা তথা পাশ্চাত্যের নিকট আমাদের

২. দেশ সমাজ ও রাজনীতি - শাহ্ আবদুল হান্নান, পৃঃ ৯৬, প্রকাশনায় কামিয়াব প্রকাশন।

মুখ উজ্জ্বল হওয়ার বিষয়টি আদতেই যে সম্ভব নয়, সে কথা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্যের নিকট যাঁরা দায়বদ্ধতা অনুভব করেন তাঁরা ইসলামপন্থী হলে তাদের মনে সর্বদাই ওজরখাহী করার একটা প্রবণতা কাজ করে। এটি তাঁরা মনের অজান্তেই করেন। তাঁরা তাঁদের ধারণা মতে দ্বীনের খেদমতের জন্যই এসব করেছেন। পাশ্চাত্যের নিকট মুখ উজ্জ্বল করার একটা রাস্তা আছে, আর তা হলো ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাশ্চাত্যদের ঘোষিত বন্ধু হয়ে যাওয়া। যেমনটি জনাব পারভেজ মোশাররফ করছেন, আর যেমনটি করছে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো। তাই জনাব বুশরা খোলাখুলিই দাবী করেন, "মোশাররফ আমাদের বন্ধু এবং সৌদি সরকার আমাদের বন্ধু।" পাশ্চাত্যের নিকট মুখ উজ্জ্বল করার রাস্তা এখ্তিয়ার করতে হলে ইসলাম ও মুসলমানিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে "শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র" নয়, পাশ্চাত্যের বর্ণিত প্রকৃত গণতন্ত্রই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এবং তাদের বর্ণিত মানবাধিকার তথা যাবতীয় অনৈতিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি ও চর্চা করেই তাদের বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে হবে এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির মূলভিত্তি সুদকেও গলাধঃকরণ করতে হবে। তাই পবিত্র কোরআনে মহান রব্বুল আলামীন বলেন -

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

ইয়াহুদ এবং নাসারাগণ (বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য)
কখনই তোমার প্রতি (মুসলমান ও ইসলামের প্রতি)
রাজী খুশী হবে না
যতক্ষণ না তোমরা (অর্থাৎ মুসলিম ও ইসলামের অনুসারীগণ)
ঐ ইয়াহুদী ও নাসারাদের দ্বীন ও আদর্শকে
(বর্তমানের প্রেক্ষাপটে নব্য বৈশ্বিক নিয়মকে)
পরিপূর্ণ অনুসরণ না করবে।[৩]

পাশ্চাত্যের নিকট মুখ উজ্জ্বল করার আশায় গুড়ে বালি দেয়ার জন্য আয়াতে কারীমাহ্তে لَنْ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্তও তা সম্ভব নয়। অবশ্য পরিপূর্ণভাবে তাদের অনুসরণ করলে (অর্থাৎ তাদের সকল দাবী পূরণ করলে

৩. সূরা বাকারাহ্, আয়াত নং ১২০।

যেমনটি করছে পাকিস্তানের মোশাররফ এবং সৌদি রাজা-বাদশাহ্রা) পাশ্চাত্যের নিকট মুখ উজ্জ্বল করা সম্ভব হবে। জনাব হান্নান সাহেবগণ যদি তাই করতে মনস্থ করে থাকেন তবে উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশের সতর্কবাণী তাঁকে জানানো আমাদের কর্তব্য হবে। আর তা হলো -

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ الَّذِىْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

যদি আপনি (বর্তমান অবস্থার দৃষ্টিতে মুসলিমগণ) তাদের
(ইয়াহুদী ও নাসারাদের)
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন,
ঐ বিষয়ে প্রকৃত সত্য জ্ঞান
(আল্লাহ্র দ্বীন-এর পথ ও পন্থা যা আপনার এবং মুসলমানদের নিকট)
আসার পর, তবে আপনার জন্য
(অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য)
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন বন্ধুত্ব নেই
এবং কোন সাহায্যও নেই।[৪]

সুতরাং জনাব হান্নান সাহেবদের সামনে বিকল্প রয়েছে দু'টি। একটি হল "শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র" নয় "প্রকৃত গণতন্ত্র" (যা ইতোপূর্বেই আমরা জনাব ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর লেখায় দেখেছি) এর অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হয়ে তাদের নিকট তাঁদের চেহারাকে চির উজ্জ্বল করা এবং আল্লাহ্র সাহায্য ও বন্ধুত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। দ্বিতীয়টি হলো "শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র" নয় বরং সরাসরি "খিলাফাতু আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ্" এর দাবী তুলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর খাঁটি অনুসারী হয়ে ইয়াহুদী নাসারাদের দুশমনে পরিণত হওয়া। কিন্তু মাঝামাঝি "শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র" গ্রহণ করলে একূল ওকূল দু'কূল হারাবার সম্ভাবনাই সর্বাধিক (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ)। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)।

৪. প্রাগুক্ত আয়াতে কারীমাহ্।

ইসলাম ও গণতন্ত্র [১]

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়

প্রথমে ইসলাম সম্বন্ধে এটুকু আলোচনা করা প্রয়োজন যে ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে চর্চার দরকার কি। ইসলাম যদি অন্যান্য ধর্মের মতো কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম হতো তাহলে এ আলোচনার কোন প্রয়োজন হতো না। কারণ ধর্মের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই বলেই অন্যান্য ধর্মের নেতারা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের অনুষ্ঠানসর্বস্ব কোন ধর্ম নয়।

আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে দ্বীন বলেছেন – اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন বলতে ইসলামই বুঝায়"।[২]

رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا " আমি সন্তুষ্ট হয়ে ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে দান করলাম"।[৩]

এ দু'টো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে দ্বীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা 'দ্বীন ইসলাম' বলে থাকি। সাধারণ লোকেরা দ্বীন অর্থ ধর্ম মনে করে বলেই দ্বীন ইসলামের অনুবাদ করে 'ইসলাম ধর্ম।

১. **ইসলাম ও গণতন্ত্র ঃ** অধ্যাপক গোলাম আযম; **প্রকাশনায়** আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১১৯/২ কাজী অফিস লেন, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন- ৯৩৫৩১১৩ **প্রথম প্রকাশ** জুলাই ২০০৩। অধ্যাপক গোলাম আযম প্রাক্তন জামায়াতে ইসলামীর আমীর। তিনি দীর্ঘদিন এ পদে ছিলেন। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যারা কোন না কোনভাবে জড়িত তারা প্রায় সকলেই তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ইসলামি আন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। "ইসলাম ও গণতন্ত্র" শীর্ষক এ লেখা দৈনিক ইনকিলাব-এ ছাপা হয়। এটি পুস্তিকা আকারেও আসে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর এ লেখার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা পুরো লেখাটিকেই তুলে ধরলাম। **মাঝে মাঝে যে বিষয়গুলোতে আমরা একমত হইনি সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য ফুটনোটে তুলে ধরেছি। পাঠক যাতে ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হন তাই পুরো লেখা তুলে ধরছি।**

২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৯।

৩. সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত নং ৩।

দ্বীন শব্দের অর্থ আনুগত্য। আর ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। তাই দ্বীন ইসলাম অর্থ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্যের বিধান। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম এমন একটি জীবনবিধান যা আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে।

ইসলামের বাস্তব রূপ হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন। তিনি ৪০ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর পর্যন্ত যা করেছেন এর সবটুকুই আসল ইসলাম। তিনি মসজিদে ইমামতি করেছেন, মদীনায় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিত্বও করেছেন। এ সবই তিনি আল্লাহর রসূল হিসেবে করেছেন। তাই রসূল (স.) অবশ্যই রাজনীতির ময়দানেও ইসলামের আদর্শ।

কুরআন ও রাসূল (স.)-এ বিশ্বাসী সবাই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, রাজনীতি ইসলামেরই একটি দিক। মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক যেমন আছে, তেমনি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। এ কারণেই এ প্রশ্ন **স্বাভাবিকভাবেই ওঠে যে ইসলামে কতটুকু গণতন্ত্র আছে।**[৪]

গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়?

আমেরিকার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন গণতন্ত্রের চমৎকার এক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাহলো ঃ Government of the people, for the people, by the people. (জনগণের সরকার, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা)। এর প্রথম কথাটির মর্ম হলো ঃ যদিও সরকার কিছু লোকই পরিচালনা করে বটে, কিন্তু সরকার এমন হতে হবে যেন জনগণ তাদের সরকার মনে করে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ হলো সরকারকে জনগণের খেদমতের উদ্দেশ্যেই কাজ করতে হবে। তৃতীয় কথাটির মানে হলো, সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হতে হবে।

৪. আমাদের দৃষ্টিতে এমন প্রশ্ন অবাস্তব। কারণ ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তেমনি গণতান্ত্রিকরাও দাবী করে গণতন্ত্র একটা আদর্শের নাম। যেমন-

→ অধ্যাপক গিডিংস বলেন ঃ গণতন্ত্র একটি শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা।

→ ডা. কার্ল কুম্বাই রোডি বলেন ঃ গণতন্ত্র এক ধরনের জীবন ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রের ১ম সংজ্ঞা ঃ প্রকৃতপক্ষে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের বিশেষ একটি পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র। ২য় সংজ্ঞা ঃ গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। ৩য় সংজ্ঞা ঃ জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলা হয়। নীতিগতভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকুক এটা প্রত্যেক সরকারেরই ঐকান্তিক কামনা। তাই সামরিক একনায়করাও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বলে স্বীকৃত হবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জনপ্রিয়তা এবং সর্বজনীনতাই এর আসল কারণ।

গণতন্ত্রের মূলনীতি

গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো পাঁচটি ঃ

১. নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারী ক্ষমতা হাতে নেবার অধিকার রয়েছে।

২. এ নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা হওয়া অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধী দলও এমন সরকারের বৈধতা ও নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩. সরকারের ভুল-ক্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্য জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন-শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।

৪. জনগণের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৫. সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে।[৫]

---

৫. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসাবে যে তিনটি কথা লেখা হয়েছে তা প্রকৃত গণতন্ত্রের ধারক-বাহকদের দেয় সংজ্ঞার আংশিক প্রতিফলন মাত্র। গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা এ পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় 'গণতন্ত্র ঃ পশ্চিমা ধা-রণা' এ শিরোনামে আলোচনা হয়েছে। গণতন্ত্রের মূলনীতি হিসাবে এখানে যে পাঁচটি কথা লেখা হয়েছে তা সবই সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তন সম্পর্কীয় আংশিক গণতন্ত্র, প্রকৃত গণতন্ত্র নয়।

ইসলাম ও গণতন্ত্র ঃ

ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতির কোন বিরোধ নেই।[৬] জনগণের উপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। রাসূল (স.)-এর পর যে **চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশিদীন হিসেবে বিখ্যাত, তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি।** জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহেই তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম ছিলো না কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের প্রার্থী ছিলেন না। আল্লাহর রাসূল (স.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে। এ কারণেই হযরত আলী (রা.)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সাহাবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য নন। **কারণ তিনি চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন।**[৭] অথচ হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (র.) সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত। এর কারণ এটাই যে, রাজবংশের রীতি অনুযায়ী তাঁর পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগণ তারই উপর আস্থা স্থাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব এলে পালানোরও অনুমতি নেই। এ **নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উন্নত!**

ইসলামে সরকারের ভুল-ক্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) দেয়া ওয়াজিব।

---

৬. এ কথার সাথে আমরা একমত নই। আমাদের মতে পশ্চিমা ধারার নির্বাচনের কোন স্থানই ইসলামে নেই। এ প্রবন্ধের লেখক নিজেও এ সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। একটু পরেই তা দেখা যাবে। তবে ইসলামে আমীর কিংবা খলিফা নির্ধারণের নিয়ম কি তা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমরা এ প্রশ্নে পরে আসছি।

৭. এর বিপরীত হল গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি। এখানে ভোটে স্বেচ্ছায় দাঁড়াতে হয়, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজ প্রশংসা নিজকে করতে হয়। এছাড়া নির্বাচনের কারচুপির ব্যাপারে অহেতুক অনেক মিথ্যা ও জালিয়াতির সাথে জড়িত হতে হয়। যে সব ইসলামপন্থী দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের সংসদ সদস্যাদের পক্ষে যারা নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করেছেন এবং তাদের প্রার্থীকে বিজয় পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন তাঁদের একজনও আমাদের এ বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলেন রাসূলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রাসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিকে পালন করতে হয়, তেমনি রাসূল (স.) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। **এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামের শুধু মিলই নয়, ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত।** [৮]

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণা

প্রচলিত গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকেই আমদানী হয়েছে। ঐ গণতন্ত্রে **জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত**। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার সর্বোচ্চ শক্তি। আইনের সর্বজনীন সংজ্ঞা হলো "Law is the will of the sovereign" (সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন)। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় জনগণই সার্বভৌম সত্তা। তাই জনগণ ও জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট যেকোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। অবশ্য পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র মেনে চলতে বাধ্য। তবে পার্লামেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। **নির্বাচিত পার্লামেন্টই বাস্তবে জনগণের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে থাকে।** শাসনতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে না।

পাশ্চাত্য বলতে আমেরিকা ও ইউরোপকেই বুঝায়। সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তারা জড়বাদে (বস্তুবাদ) বিশ্বাসী। **তাদের সভ্যতার ভিত্তিই হলো জড়বাদ।** এ মতবাদের সার কথা হলো ঃ **বস্তুর উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তায় বিশ্বাস করা জরুরী নয়। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।** Divine Guidance (আল্লাহর হেদায়াত)-**এর কোন প্রয়োজন নেই।** ধর্মীয় ব্যাপারে যার যার ধর্ম বিশ্বাসে সবাই স্বাধীন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক জীবনে ধর্মকে টেনে আনা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়।

৮. যেহেতু গণতন্ত্রকে আমরা সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও ইসলাম বহির্ভূত কুফরি পদ্ধতি মনে করি (এবং বাস্তবেও গণতন্ত্র তাই) সে জন্য আমরা এ বক্তব্যকে সংশোধন করে বলবো, আল্লাহ্‌র বিধান ইসলামের বিশ্বজনীন নীতি মানব রচিত গণতন্ত্রের চাইতে লক্ষ-কোটি গুণে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। আমরা ত্রুটিমুক্ত পূত পবিত্র বিষয়কে মানবীয় ভুলে ভরা শিরকের স্পর্শে অপবিত্র গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করতে যাব না।

যদিও মানুষ নৈতিক জীব এবং ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সর্বজনীন ধারণা ও চেতনা সবাই স্বীকার করে, তবুও অধিকাংশ মানুষ একমত হয়ে এসবের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী বলে তারা মনে করে।

এ নীতির ভিত্তিতেই পাশ্চাত্যের সবদেশের আইনেই পরস্পর সম্মতি থাকলে বিয়ে ছাড়াও নারী ও পুরুষের যৌন মিলন দূষণীয় নয়। এমন কি কয়েকটি দেশের আইনে সমকামিতাও বৈধ। অথচ পশুদের মধ্যেও সমকামিতা নেই।

এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, Divine Guidance-**কে অস্বীকার করে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে। কোন পশুর মধ্যেই সমকামিতার মতো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় না। অথচ শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে তা আইনত বৈধ বলেও স্বীকৃতি পায়!**

বিস্ময়ের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু সামষ্টিক জীবনে স্রষ্টার নির্দেশ মানা প্রয়োজন মনে করে না। তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। আবার তারা ধর্মেও বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করে।[৯]

ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌম শক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইনসভাই সকল ক্ষেত্রে আইন-দাতা। আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে।

৯. "পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণা" শিরোনামে যা বলা হয়েছে তার প্রতিটি কথার সাথে আমরা শুধু একমতই নই বরং এর ভিত্তিতেই আমরা গণতন্ত্রকে ইসলামি খিলাফাহ্‌ ব্যবস্থার কাছাকাছি কিছু মনে করি না। আমরা বরং বলি, "গণতন্ত্র" শব্দ ব্যবহার না করে আমাদেরকে আমাদের পদ্ধতিটি পরিচিত করানো উচিত। যেহেতু আমাদের পদ্ধতিটি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত, নির্ভুল এবং যথাযথ তাই আমরা গণতন্ত্র নয়, খিল-াফাতু আলা মিনহাজিন নবুয়্যাহ্‌ কিংবা সংক্ষেপে খিলাফাহ্‌র কথাই বলবো। নতুবা আমাদের এই খিলাফাহ্‌র মূল দাবী গণতন্ত্রের শ্লোগানে হারিয়ে যাবে। দুনিয়ার অপরাপর জাতি তো দূরে থাকুক আম-াদের বেখবর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জন-গোষ্ঠিও তা বুঝতে অক্ষম হবে। গণতন্ত্র বলতে তারা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেই বুঝে।

ইসলামে আল্লাহর দেওয়া আইন ও বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেবার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। **ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ।**

প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু হওয়া সম্ভব। মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরী আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব গভীর। এদিক বিবেচনা করলে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সার্থক রূপ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।[১০]

গণতন্ত্র কি জীবনবিধান ?

পাশ্চাত্য এবং তাদের অনুকরণে প্রাচ্যেও গণতন্ত্রকে আদর্শের মর্যাদা দেবার প্রবণতা আছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক যে মত পোষণ করে তা নৈতিকতা বিরোধী হলেও তা বৈধ হিসেবে গণ্য। এ নীতি মনুষ্যত্ব ও মানবতা বিরোধী। মানুষ নৈতিক বোধ সম্পন্ন জীব। মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীন মূল্যবোধ রয়েছে। "সত্য কথা বলা ভাল। মিথ্যা বলা অপরাধ।" এটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন। মানুষ স্বার্থের জন্য মিথ্যা কথা বললেও মিথ্যা বলা ভাল বলে স্বীকার করে না। অধিকাংশ লোক কোন বিষয়ে মিথ্যা বললেই তা বৈধ বলে গণ্য হতে পারেনা।

যুক্তি, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মদ খাওয়াকে মন্দ বলে স্বীকার করে। আমেরিকার আইন সভায় ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে শাসনতন্ত্রের ১৮ তম সংশোধনীর মাধ্যমে মদকে অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।

১০. "ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র" শিরোনামের পূর্ণ বক্তব্যটাই আমাদের ৯নং ফুট নোটের কথাগুলোকে শক্তিশালী করে। উৎসের বিচারে, কার্যকারিতার বিচারে খিলাফাহ্ কখনই গণতন্ত্রের আড়ালে লুকাতে পারে না। গণতন্ত্র শব্দের প্রতি স্পর্শকাতরতা নয়, এর মৌলিক দুর্বলতার জন্যই এটি আমাদের নিকট পরিত্যাজ্য।

মদ যদি ভাল হয়ে থাকে তাহলে সব সময়ই ভাল, আর মন্দ হয়ে থাকলে সব সময়ই মন্দ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কোন বিষয়কে ভাল বা মন্দ বলে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অযৌক্তিক।

ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে হতে পারে না। এসব শাশ্বত মূল্যবোধের ব্যাপার। যাদের কোন স্থায়ী মূল্যবোধ নেই তারা গণতন্ত্রকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। যারা শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাসী তাদের নিকট গণতন্ত্র সরকার গঠন ও পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি পদ্ধতি মাত্র, গণতন্ত্র কোন জীবনবিধান নয়।[১১]

'ইসলামে গণতন্ত্র আছে কিনা'

এ প্রশ্নের ভিত্তি কি ?

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর দুনিয়ায় মুসলিম শাসন কমপক্ষে এক হাজার বছর চালু ছিল। **এ দীর্ঘ শাসনামলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়নি।**[১২] কিন্তু ইসলামের আদালত ও ফৌজদারী আইন চালু থাকায় এবং এর ফলে ন্যায় বিচার প্রচলিত থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম জনগণও সে শাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিদ্রোহ করেনি। জনগণের বিদ্রোহের কারণে মুসলিম শাসনামলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাস এ কথা বলে না।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে উমাইয়া বংশের, পরবর্তীতে আব্বাসীয় বংশের এবং আরও পরে বংশীয় রাজতন্ত্রই চালু ছিল। সরকারের সামরিক শক্তিই ক্ষমতার উৎস

১১. গণতন্ত্র কি জীবন বিধান, এ প্রশ্নের জওয়াবে সম্মানিত অধ্যাপক নিজেই প্রথমে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, পাশ্চাত্য এবং তাদের অনুকরণে প্রাচ্যেও গণতন্ত্রকে আদর্শের মর্যাদা দেবার প্রবণতা আছে। আমরা এখানে দলিল-প্রমাণ দিয়ে দেখাচ্ছি যে এটি শুধু প্রবণতা নয় বরং এটিই গৃহীত সত্য। গণতন্ত্র এখন আদর্শেরই নাম। পাশ্চাত্যের সবাই তা বুঝে এবং আমাদের দেশসমূহের ইংরেজি শিক্ষিতরাও তাই বোঝে। কেবলমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্কে যারা বুঝে ও মানে তারাই একে কস্মিনকালেও আদর্শ হিসাবে মানে না। যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহ্কে জেনে বুঝে মান্যকারী লোকদের সংখ্যা প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে নগণ্য তাই ইসলামি আন্দোলনের কোন নেতার মুখে উচ্চারিত গণতন্ত্র বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠিকে পাশ্চাত্যের বল্গাহীন গণতন্ত্রের দিকেই ঠেলে দেয়। ফলে আমাদের স্বপ্নের খিলাফাহ্ আরও দূরে সরে যায়।

১২. প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে কখনই বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হয়নি এমনকি খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও তাই হয়নি। সুতরাং এর সাথে তুলনা এবং ইসলামে গণতন্ত্র আছে এমন দাবী করা সম্পূর্ণটাই মনগড়া আবিষ্কার।

বিবেচিত হতো। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করতো। জনগণ কোন সিদ্ধান্তকারী শক্তি ছিল না। অথচ ইসলামি আইন চালু থাকায় ঐ শাসনকালকে ইসলামি মনে করা স্বাভাবিক ছিলো।

ইসলামি শাসন ও মুসলিম শাসন

প্রকৃত কথা এটাই যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর একমাত্র হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল ছাড়া অবশিষ্ট শাসনকালকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসন বলা যায় না। ঐসব শাসনকে মুসলিম শাসনই বলা উচিত। কারণ মুসলমানরা যা করে তাই ইসলাম নয়। ইসলাম যা করতে বলে তা করা হলেই ইসলামি কাজ বলে গণ্য হয়।

রাসূল (স.)-কে স্বয়ং আল্লাহ **(রাষ্ট্র বলতে রাষ্ট্র বিজ্ঞান যে সংজ্ঞা দেয় তেমন রাষ্ট্র ইসলামি খিলাফাহ্ ব্যবস্থায় অনুপস্থিত)** রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছেন। তাই তাঁর ব্যাপারে নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁর পরে কে সরকারী ক্ষমতার অধিকারী হবেন সে বিষয়ে তিনি কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার ইন্তিকালের পূর্বে মদীনাবাসীকে সমবেত করে হযরত ওমরকে এ দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব দিলে সবাই তা সমর্থন করেন। হযরত ওমর (রা.) তার ইন্তিকালের পূর্বে ৬ জন বিশিষ্ট সাহাবীর এক প্যানেল গঠন করেন। প্যানেলের অন্যতম সদস্য হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) বাকী ৫ জনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঘরে ঘরে যেয়ে জনমত সংগ্রহ করেন। অধিকাংশ মদীনাবাসী হযরত ওসমানের (রা.) পক্ষে রায় দেন। হযরত ওসমান (রা.) নিহত হবার পর মদীনাবাসীরা হযরত আলী (রা.)-কে এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দাবী জানান। রাসূল (স.)-এর ইন্তিকালের পর যেভাবে মদীনাবাসীরা হযরত আবু বকরের (রাঃ) হাতে বাইয়াত হন তেমনিভাবে তারা হযরত আলীর (রা.) নিকট বাইয়াত হন। হযরত আলী (রা.) নিজের উদ্যোগে খলীফা হননি।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে প্রথম ৪ খলীফা নিজেরা চেষ্টা করে ক্ষমতা দখল করেন নি। তারা একই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি, কিন্তু অবশ্যই তারা নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে ইসলাম নির্বাচনের নির্দিষ্ট কোন

পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করেনি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে নিজেদের উপযোগী নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। **পদ্ধতি যে রকমই হোক একমাত্র পরামর্শের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হতে হবে– এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সাহাবাগণের যুগেই এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।**[১৩]

তাবেয়ীগণের যুগে খলীফা সুলাইমান মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে খামে বন্ধ করে রেখে নির্দেশ দেন যে তার মৃত্যুর পর সকল গণ্যমান্য নাগরিককে সমবেত করে ঐ খাম খুলতে হবে। যাকে খলীফা নিয়োগ করা হলো সবাই তাঁর নিকট বাইয়াত হবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী সমাবেশে খামটি খুলে যখন পড়া হলো তখন জানা গেল যে খলীফা সুলাইমান তাঁর ছেলেকে বাদ দিয়ে জামাতা ওমর বিন আবদুল আযীযকে নিয়োগ করেছেন।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবনিযুক্ত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে (বাইয়াত হতে) এগিয়ে আসার আগেই ওমর বিন আবদুল আযীয (র.) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে পদ্ধতিতে আমাকে খলীফা নিয়োগ করা হয়েছে তাকে আমি ইসলামি পদ্ধতি মনে করি না। তাই আমি আপনাদের বাইয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। কাকে খলীফার দায়িত্ব দেয়া হবে এ বিষয়ে ফায়সালা করার ইখতিয়ার আপনাদের। আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের খলীফা নির্বাচিত করুন।" সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন, "আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করলাম। আপনি পদ চান না বলে আপনাকেই আমরা এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে গণ্য করি।"

এ ঘটনাটি বড়ই নাটকীয় মনে হয়। কিন্তু এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার সূত্রে খলীফা হওয়ার রেওয়াজ চালু হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.) খলীফা নিয়োগের ঐ পদ্ধতি ইসলামসম্মত নয় বলে ঘোষণার সাথে সাথে রাষ্ট্রের সকল নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য নাগরিক এর সমর্থন করে প্রমাণ করলেন যে তারাও সবাই ইসলামের বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত।

---

১৩. এর সাথে অর্থাৎ তৎকালীন সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতির সাথে বর্তমান আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন বিশেষ করে ইসলামি দলগুলো এ উপমহাদেশে যে সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তার মিল কোথায়? ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই কি পরামর্শ দিতে পারে? পরামর্শদাতার পরামর্শ দেওয়ার ন্যূনতম কিছু যোগ্যতা কি ইসলাম ঠিক করে দেয়নি? যার সাক্ষ্য গ্রহণ হয় না সে কি খিলাফাহ্ নির্ধারণে মতামত দেয়ার অধিকার রাখে?

ইতিহাস সাক্ষী যে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণেই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণেই তিনি পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ ও দ্বিতীয় ওমর হিসেবে উম্মতের নিকট মর্যাদা পেয়েছিলেন।

গণতন্ত্র কি ইসলাম বিরোধী?

ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করার উদ্দেশ্য যারা ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে সক্রিয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ বলে প্রচার করেন। **এ কথা অবশ্যই সত্য যে জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে গণতন্ত্র বিশ্বে চালু আছে তা নিঃসন্দেহে কুফরী।**

এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে সার্ভভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, **যে দেশে মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সে দেশে অনৈসলামি নেতৃত্বের বদলে ইসলামি নেতৃত্ব কায়েম করার পন্থা কী?**[১৪] **যেসব দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের নিয়ম চালু নেই সেসব দেশের কথা আলাদা। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বা অঞ্চলে যেসব সরকার গঠন ও পরিবর্তন হচ্ছে সেসব দেশে নির্বাচন করা কি ইসলাম বিরোধী?**[১৫] **ঐ সব দেশেই ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামি হুকুমাত কায়েমের চেষ্টা করছে। এ নির্বাচনকে কোন যুক্তিতে কুফরী বলবেন?**[১৬]

বহু কারণে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামি সরকার কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই নির্বাচন প্রথাটিকেই অনৈসলামি বলা কি সংগত? নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিবর্তন করার পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র। **যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধী মনে করেন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা, "তাদের নিকট গণতন্ত্রের বিকল্প কী পন্থা রয়েছে?"**[১৭]

১৪. এটি একটি সঙ্গত প্রশ্ন। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা এর উত্তর দেব।

১৫. যেহেতু পদ্ধতিটা বিজাতীয় এবং ইসলামের নিজস্ব নয় সুতরাং তা পরিত্যাজ্য। এতে অংশগ্রহণ ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণ।

১৬. 'ইসলামী আন্দোলন' নাম নিলেই তা ভুলের উর্দ্ধে উঠে যায় না। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বাইরে যে কেউ যে কোন বিষয়ের সংমিশ্রণ করবে তিনিই বিদাআতের প্রচলনের দায়িত্ব নিবেন। আর এ বিদাআত জাহান্নামের রাস্তা ছাড়া কিছু নয়।

১৭. সুস্পষ্ট জওয়াব ইসলামিক পদ্ধতি, আর তা হল দাওয়াত, তানজীম, তারবিয়্যাহ, হিজরাতু আনিল মা'সিয়্যাহ, জ্বিহাদ ওয়া ক্বিতাল ফি-সাবিলিল্লাহ্। এর বাইরে সকল পদ্ধতি বিভ্রান্তি।

এ প্রশ্নের জওয়াবে তারা যা বলে থাকেন তা হলো "বিপ্লব"। তারা বিপ্লব করে ইসলাম কায়েম করতে চান। কিন্তু সে বিপ্লবের রূপরেখা কী সে বিষয়ে কোন ধারণা তাদের আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

"গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব" শিরোনাম থেকে এটাই প্রতিপাদ্য বলে মনে হবে যে, বিপ্লব গণতন্ত্রের বিপরীত পদ্ধতি। আসলে বিপ্লব শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। ব্যাপক পরিবর্তন বা মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (স.) চরিত্রহীন সমাজে উন্নত নৈতিক চরিত্রের লোক তৈরি করে তাদের জীবনে সত্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। তিনি মদীনায় বিনা রক্তপাতে সরকারী ক্ষমতা গণ-সমর্থনের মাধ্যমে লাভ করে প্রচলিত গোটা সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যায়। অবশ্য 'দার্শনিক বিপ্লব'ই এ জাতীয় পরিবর্তনের সঠিক সংজ্ঞা। এটাকে সশস্ত্র বিপ্লব বলা সম্ভব নয়।

বিপ্লব শব্দের ব্যবহার ঃ সাধারণভাবে "বিপ্লব" বললে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থান, শক্তিবলে সরকারকে উৎখাত ইত্যাদি বুঝায়। এভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকার গৌরবের সাথে "বিপ্লবী সরকার" নামে পরিচয় দেয়। এই কারণেই যখন কেউ বিপ্লবের আওয়াজ তোলে তখনই মানুষ শক্তির ব্যবহার হবে বলে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করে।

অবশ্য আজকাল "বিপ্লব" শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকেই করছেন। আন্দোলন করার অর্থেই তারা বিপ্লব শব্দ ব্যবহার করছেন। নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপক প্রচেষ্টাকে আন্দোলন বা অভিযান বলাই যুক্তিযুক্ত। এ কাজটি এত শ্রমসাধ্য ও সাধনা সাপেক্ষ যে, কয়েক বছরেও যদি কোন দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে সক্ষম হয় তাহলে জাতীয় জীবনে এটা অবশ্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এ পরিবর্তন গায়ের জোরে হবে না। সাক্ষরতা আন্দোলন সফল হলেই তা সম্ভব। সেচ ব্যবস্থাকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে এবং বন্যার পানিকে ধারণ করার প্রয়োজনে খাল খননের গণআন্দোলনকে "বিপ্লব" নাম দেয়া হচ্ছে। এক একটি শব্দের বিশেষ একটা ওজন আছে। যেখানে সেখানে কোন শব্দের প্রয়োগ সাহিত্যরস বা হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"বিপ্লব" শব্দটি কোথায় ব্যবহার করা উচিত বা অনুচিত এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আওয়াজ জনগণ শুনতে পায়

সেখানে বিপ্লবের সস্তা ব্যবহার চলতে থাকলে মানুষের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিপ্লবের প্রতিরোধ স্পৃহা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কঠিন পরিস্থিতিতেও বিপ্লবের আওয়াজকে "খাল কাটা বিপ্লবের" মতই জনগণ নিরাপদ মনে করে অবহেলা করতে পারে। তাই "বিপ্লব" সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনেই হালকাভাবে এর ব্যবহার অনুচিত।

যা হোক "বিপ্লব" শব্দের ব্যবহার আলোচ্য বিষয় নয়। ভাববার বিষয় হলো যে আমরা বিপ্লবী সরকার চাই, না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাই। জনগণকেও এ বিষয়ে সজাগ হতে হবে যে, কাদেরকে সমর্থন করা উচিত। যাঁরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই সর্বদিক দিয়ে কল্যাণকর মনে করেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি এক ধরনের হবে। আর যারা শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী তাদের কর্মনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক।[১৮]

গণতান্ত্রিক মনোভাব ঃ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের আচরণ গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে [১৯]। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনকে অশালীন ভাষায় গালি দেয়া চলে না। গণতন্ত্রমনা লোকের ভাষাই জানিয়ে দেয় যে, তিনি অধৈর্য নন। সরকারী ক্ষমতায় থেকে কোন বিরোধী দলকে অন্য দেশের দালাল বলে গালি দেওয়া অর্থহীন। দালাল হয়ে থাকলে আইনের মাধ্যমে বিচার করুন। সরকারের হাতেই আইন রয়েছে। সে আইনের প্রয়োগ না করে অসহায়ের মত গালি দেওয়া দুর্বলতারই পরিচায়ক। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এদেশে যে হারে একে অপরকে বিদেশী দালাল বলছে, তাতে দুনিয়ার মানুষ আমাদের সবাইকে শুধু দালালই মনে করবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে রাজনীতিবিদদের পরম ধৈর্য্যশীল হতে হবে। দুঃখের বিষয়, এ ধৈর্য্যেরই অভাব

১৮. ইসলাম কিংবা খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইসলামের নির্দিষ্ট কর্মপন্থা রয়েছে। ঐ কর্মপন্থার উৎস অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহ্। আল্লাহ্‌র নবী যেভাবে দ্বীন কায়েম করেছেন এখনও ঠিক সেভাবে দ্বীন কায়েম হবে। প্রচলিত অর্থের বিপ্লব এর সমার্থক নয়।

১৯. "গণতন্ত্রসম্মত আচরণ" বলতে বাকী বিশ্বের সবাই বোঝে- ক. মানুষ মানুষের জন্য সংখ্যাধিক্যের নীতিতে আইন তৈরী করবে, খ. এক্ষেত্রে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকা উচিৎ নয়, গ. নীতি নৈতিকতা সবই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত দিয়ে নির্ধারিত হবে। পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্রকে বেছে নিয়ে এর অন্যথা করা মানে গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। অন্ততঃ গণতন্ত্রের ধারক-বাহকরা তাদের এরূপ নীতিকে মোনাফেকী নীতি বলেই আখ্যায়িত করে।

সবচেয়ে বেশি। সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সমালোচনার ভাষা যে নিম্নমানের লক্ষণ প্রকাশ করে তা গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক। এ বিষয়ে সরকারী দলের দায়িত্বই বেশি। তাঁরা ক্ষমতায় থেকে যদি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা না করেন, তাহলে বিরোধীরা শিখবে কি করে? যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের অধৈর্য হবার কোন প্রয়োজনই নেই। বিরোধীরা ক্ষমতায় যাবার জন্য যদি অধৈর্য্য হয় তাহলে কিছুটা এলাউন্স তাদেরকে দিলে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন হতে পারে।

বিরোধী দলের অবশ্যই ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু কিভাবে তারা ক্ষমতায় যেতে চান? একটা নির্বাচন হয়ে গেল। তাঁরা নির্বাচনে অংশও নিলেন। আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তাঁদেরকে কাজ করে যেতে হবে। বর্তমান শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক পন্থায় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না সে কথাও সত্য। তাই যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের নিজেদের কার্যাবলী প্রথমে গণতন্ত্রসম্মত হতে হবে।

যারা বিরোধী দলে আছে তারাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পেতে চাইলে তাদের কার্যক্রম এক ধরনের হবে। কিন্তু যদি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কর্মধারাই তারা অনুসরণ করবে। তাদের কর্মনীতি ও কর্মপন্থা থেকেই তাদের প্রকৃত চেহারা সবার সামনে স্পষ্ট হতে বাধ্য। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে জনগণকে তাদের কার্যাবলী দ্বারা এতটুকু রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তথাকথিত বিপ্লব ও গণতন্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সবার জন্যই নিরাপদ এ বিষয়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে সজাগ করে তুলতে হবে।

বিপ্লবের অনিশ্চিত পথ ঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করে যারা বিপ্লবের পথে গদিতে যেতে চান তাদের নিজেদের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপ্লব যেখানেই এসেছে সেখানে গণতন্ত্র কোথাও দানা বাঁধতে পারেনি। বিপ্লবের পর বিপ্লব লাইন ধরে এসেছে। এটা কি নিরাপদ পথ? শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় গেলে শক্তির উপর নির্ভর করেই শাসন চলে। এ ধরনের সরকার জনগণের সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না বলে যখন জনসমর্থন হারায় তখন সুযোগ বুঝে পাল্টা বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে। তাই এ পথ একেবারেই অনিশ্চিত।

বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যারা বিপ্লব করে তাদের অবস্থা আরও করুণ। আফগানিস্তানে নূর মুহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন ও কারমাল এ বিপ্লব দ্বারা কী পেলেন? যারা কাবুল স্টাইলে স্বপ্ন দেখেন তারা এটাকে নিরাপদ পথ মনে করেন কোন যুক্তিতে? তথাকথিত বিপ্লবের পথে দেশকে একবার ঠেলে দিলে ফিরিয়ে আনার উপায় থাকে না। এ বিপ্লব জনগণের পারস্পরিক আস্থা খতম করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দেশ গৃহযুদ্ধের আগুনে ছারখার হতে থাকে।

তাই বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরই সবার আস্থা স্থাপন করা উচিত [২০]। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু করার প্রধান দায়িত্ব ক্ষমতাসীনদের। তারা যদি নিজেদের গদি ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে তাদের রেশন করা মাপে গণতন্ত্র দেন তাহলে ময়দান বিপ্লবীদেরই পক্ষে যাবে। যদি আন্তরিকতার সাথে গণতন্ত্রকে বিকাশ লাভের সুযোগ দেন তাহলে গণতান্ত্রিক শক্তিই ময়দানে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে বিপ্লবীদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। ক্ষমতাসীনরা ১৯৪৭ সাল থেকে একই ধারায় গণতন্ত্রকে কোণঠাসা করে বিপ্লবী মনোবৃত্তিকে সুযোগ করে দিয়েছে। এর কুফল ক্ষমতাসীনরাই বেশি ভোগ করেছে। কারণ ক্ষমতায় চিরদিন থাকা যায় না। গদি একদিন ছাড়তে হয়ই। এমন নিরাপদ পদ্ধতি চালু থাকা দরকার যাতে গদি থেকে নামার পরও আবার উঠার সিঁড়িটা বহাল থাকে। একবার কোন প্রকারে কেউ ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ যাতে সেখানে যাবার পথ না পায় সে উদ্দেশ্যে সিঁড়িটাই নষ্ট করে দেয়। ফলে নিরাপদে তারা নামার পথও পায় না। গদিতে উঠা নামার পথটা পরিষ্কার রাখাই গণতন্ত্রের পরিচায়ক।

পাক-ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদেরকে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়। কিন্তু মানুষ ইতিহাস থেকে কমই শিক্ষা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক পথে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা থেকে বিদায় হলেন। অনেকে মনে করেছিল যে, তিনি চিরবিদায় নিলেন। কিন্তু ঐ গণতান্ত্রিক পথেই আবার ফিরে আসার সুযোগ পেলেন। গণতন্ত্রের ওপর আস্থা হারানো বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ক্ষমতাসীনরা যদি এটা বুঝতে পারতো তাহলে ইতিহাসের অনেক করুণ ঘটনাই হয়তো ঘটতো না। সরকারী ও বিরোধী সব

২০. ইসলাম আমূল পরিবর্তনের কথা বলে। কোরআন সুন্নাহ্ যে পথ এর ব্যাখ্যা করেছে তার অনুরূপ হতে যে সব পরিবর্তন করা লাগে তার সবটাই করতে হবে। এর নাম যদি বিপ্লব দিতে চান আপত্তি নেই। তবে এর বিকল্প অন্য কোন পদ্ধতি ইসলামে নেই। আর বিপ্লব বলতে যদি কোরআন ও সুন্নাহ্র কোন মৌলিক নীতির লঙ্ঘন হয় তবে একে আমরা বিপ্লব বলবো না।

দলকে অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে, দেশের জন্য, তাদের দলের জন্য, এমন কি নেতাদের জন্যও কোন্ পথটা মঙ্গলজনক ও নিরাপদ। নির্ভেজাল গণতন্ত্র দিলে সরকারী দলের গদিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকলেও আবার জনসমর্থন নিয়ে গদি ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে। বিরোধী দল এক নির্বাচনে ক্ষমতা না পেলেও আবার সে সুযোগ আসতে পারে। তাই গণতন্ত্রের এমন নিরাপদ পথই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা [২১]। **আর বিপ্লব হলো বন্দুকের লড়াই**[২২]। মনুষ্যত্বের উন্নয়ন বন্দুকের হাতে অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ত্রুটি আছে। তবে প্রচলিত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে তা কম মন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে চাইলে ইসলামের কতক মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমাদের যুব শক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগানের মোহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এ জন্যই ইসলামি বিপ্লবের শ্লোগান উঠেছে। বিপ্লবই যদি চাও তাহলে এস ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রাসূল (স.) মক্কা বিজয় করলেন বিনা রক্তপাতে। গোটা আরবে তিনি মনুষ্যত্বের মহাবিপ্লব আনলেন গায়ের জোরে নয়, চরিত্রের বলে। এরই নাম গণতন্ত্র।[২৩]

‘গণতন্ত্র’ পরিভাষার প্রতি এলার্জি

সত্যিকার গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই প্রথম চালু হয় [২৪]। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য থেকেই গণতন্ত্র প্রাচ্যে এসেছে। তাদের গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব জোরে-শোরে প্রচারিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসীদের কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন। কিন্তু

২১. বর্তমানে বাস্তব জগতে যে গণতন্ত্রের চর্চা হতে দেখছি তাতে যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতার স্থলে জোর, জুলুম, সন্ত্রাস, অবৈধ চাপ, প্রতারণা, মিথ্যা আশা দেওয়া, বেহিসেবী টাকা খরচ করা ইত্যাদি অপকর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। তৃতীয় বিশ্বের যেখানেই গণতন্ত্র চালানো হবে সেখানেই ঐ একই ফল দেবে। বর্তমান আমেরিকন নির্বাচনও উক্ত অবৈধ চাপমুক্ত নয়গণতন্ত্র পরিত্যাজ্য হওয়ার এটাও একটা অতিরিক্ত কারণ।

২২. আর এই জন্যই বিপ্লব ইসলামের প্রতিস্থাপক নয়। ইসলাম নিজস্ব পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। ধার করা কোন পদ্ধতিতে ইসলাম আসতে পারে না।

২৩. এর নাম কক্ষণই গণতন্ত্র নহে বরং গণঅভ্যুত্থান।

২৪. কোনটি সত্যিকার গণতন্ত্র ? এ প্রশ্নের জওয়াব· বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিকদের নিকট স্পষ্ট। এই গণতন্ত্রের সামান্যতম অনুমোদনও ইসলামে নেই। খিলাফাহ্ ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করার জন্যই এ সব বলা হয়।

এটাই গণতন্ত্রের একমাত্র সংজ্ঞা নয়। "জনগণের সার্বভৌমত্ব" কথাটি অবশ্যই কুফরী বক্তব্য। আমরা গণতন্ত্রের এ সংজ্ঞাকে কিছুতেই গ্রহণ করি না।

কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নিয়মকে কি অস্বীকার করা যায়? যে কোন **বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি বিকল্প কোন পথ আছে ?** [২৫] মসজিদ কমিটি থেকে শুরু করে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যাদের উপর দায়িত্ব থাকে তাদের অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটাকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা হয়। যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মসজিদ-মাদ্রাসা পরিচালনা করে থাকেন। তাই 'গণতান্ত্রিক' পরিভাষার প্রতি এমন এলার্জি যুক্তিযুক্ত নয়। ইংরেজি এলার্জি (Allergy) শব্দটির অর্থ হলো ঃ "যা আসলেই নির্দোষ সে বিষয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া"। **তারা যদি গণতন্ত্র পরিভাষাটির বিকল্প কোন পরিভাষা তৈরি করে দুনিয়ায় চালু করার কোন ক্ষমতা রাখেন তাহলে চেষ্টা করতে পারেন।** [২৬] কিন্তু কোন বিকল্প পরিভাষা আবিষ্কার না করে গণতন্ত্রকে 'কুফরী মতবাদ' বলা মোটেই সংগত নয়। আজ পর্যন্ত তারা এর বিকল্প পরিভাষা দিতে পারেননি। এর বিকল্প হিসাবে 'বিপ্লব' পরিভাষা ব্যবহার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাদ্রাসা কমিটিতে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বিপ্লবী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

মনগড়া ব্যাখ্যা

সবাই একথা স্বীকার করে যে, কোন কথার এমন ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। কোন লেখক বা বক্তার কোন কথার একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। তাই যার কথা তিনি যে ব্যাখ্যা দেন তা মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মন্দ অর্থ গ্রহণ করা নৈতিক দিক দিয়ে সঠিক নয়। [২৭]

২৫. "যারা পরামর্শ দেবার যোগ্যতা রাখেন তাদের সকলের পরামর্শ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে কেবল উত্তম পরামর্শ গ্রহণ করা" -এটা ইসলাম, এ বিষয়ে এর বাইরে আর কোন পদ্ধতিই ইসলামসম্মত নয়।

২৬. নতুন পরিভাষা আমাদের প্রয়োজন নেই। যারা দ্বীনকে অসম্পূর্ণ মনে করেন তাদের জন্যই কেবল প্রয়োজন পড়তে পারে। বিষয়টি সম্পূর্ণ বহিরাগত। তাই পরিত্যাজ্য।

২৭. সে জন্যই আমরা সম্মানিত অধ্যাপকের পূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরলাম। এ বক্তব্য স্বতঃই প্রমাণ করে গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামপন্থী অথচ গণতন্ত্রের দাবীদার এমন লোকদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে লেখা আছে, **"জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"। আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে কি তা লেখা হয়েছে? এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই হাসিল করতে হবে।** [২৮] সেনাবাহিনী বা কোন সশস্ত্র সন্ত্রাসী শক্তি অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঐ কথাটি এমন ভাষায় হলে বেশি সঠিক হতো যার অন্য অর্থ করা যায় না। যেমন ঃ "শাসন ক্ষমতা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ থেকেই হাসিল করতে হবে"। অর্থাৎ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সকল ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে তা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই ফয়সালা করতে হবে।

জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টকে 'সার্বভৌম' বলা হয়। এখানেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করা উদ্দেশ্য নয়। এর অর্থ হল ঃ বাংলাদেশে আইন-রচনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে এ সংসদ দেশের বাইরে বা ভেতরের কোন শক্তির অধীন নয়। [২৯]

বাংলাদেশের সংবিধানে এ কথাও লেখা আছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি"। তাই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম বলা হয় না। [৩০] এ পরিভাষাটির বিকল্প পরিভাষা তালাশ করা যেতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বোঝাবার জন্য এ পরিভাষাটির ওজন বিশ্বে স্বীকৃত।

২৮. ডঃ কামাল হোসেন এবং তাঁর সাথীরা যারা তখন সংবিধান রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে এখনও যারা বেঁচে আছেন এবং যারা এদেশে গণতন্ত্রের মূল ধারার লোক বলে পরিচিত তাদের নিকট এ বক্তব্য কি গ্রহণযোগ্য ? সংবিধানে বিষয়টি যেভাবে উল্লেখ আছে তা হলো নিম্নরূপ-

৭ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

৭ (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা হলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হবে।

২৯. প্রাগুক্ত ফুট নোট দ্রষ্টব্য।

৩০. অন্য সকল ইলাহ্কে অস্বীকার করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস আনার নাম তৌহিদ। অন্য ইলাহ্ স্বীকারের সাথে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসকে ইসলাম কখনই তৌহিদ মনে করে না। আমাদের সংবিধানে বিসমিল্লাহ্র সংযোজন এবং আল্লাহ্র প্রতি আস্থা ঘোষণার সাথে সাথে জনগণকে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দানের মাধ্যমে তৌহিদ নয়, শিরক এর ঘোষণা দিয়েছে। এর সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক কোথায় ?

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই ইসলামি

নবী-রাসূলগণই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আদর্শ। তাঁরা জনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। যে কাওম দাওয়াত কবুল করেনি তাদের দেশে দ্বীন বিজয়ী হয়নি। কোন নবী সশস্ত্র আন্দোলন করে কোন দেশেই শক্তিবলে ইসলামি হুকুমত কায়েম করেন নি। নবীগণ মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। মনের উপর শক্তি প্রয়োগ করা যায় না বলেই জোর করে জনগণকে হেদায়েত করা সম্ভব নয়। মক্কার জনগণ রাসূল (স.)-এর দাওয়াত কবুল করতে রাজি হয়নি বলে সেখানে দ্বীন প্রথমে বিজয়ী হয়নি। মদীনার জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করায় রাসূল (স.) সেখানে ইসলামি সরকার কায়েম করতে সক্ষম হলেন।

জনগণ ইসলামি সমাজব্যবস্থা কবুল করতে রাজি না হলে আল্লাহ তায়ালা কোন অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর উপর দ্বীনের নেয়ামত জোর করে চাপিয়ে দেন না। জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার পরিবর্তন করার পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলে।[৩১]

রাসূল (স.) মদীনায় যে ইসলামি বিপ্লব সাধন করলেন তা গণতান্ত্রিক পন্থায়ই **করেছেন। জোর করে তিনি মদীনাবাসীদের উপর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেননি।**[৩২]

যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বিপ্লব করে ইসলামকে বিজয় করতে চান তারা বিপ্লব মানে যদি গণ-অভ্যুত্থান মনে করেন তাহলে এ বিপ্লবের সাথে গণতন্ত্রের বিরোধ নেই বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই গণবিপ্লব ঘটানো সহজ গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা ছাড়া জনগণ গণ-বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ হতে পারে না।

তথাকথিত বিপ্লবীরা ইরান বিপ্লবকে মডেল মনে করেন। ইরানে রাজতন্ত্র থাকায় ইমাম খোমেনী দীর্ঘ সময় গণ-সংগঠন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং

৩১. আমরা পূর্বেই বলেছি এটি আংশিক গণতন্ত্র। গনতন্ত্রের ধারক-বাহকগণ এই আংশিক গণতন্ত্রে সন্তুষ্ট নয়।

৩২. এর মানে এ নয় যে তিনি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নির্বাচিত হয়েছেন। বরং জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাকে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করার জন্য আহবান করেছিল। তিনি সে আহবান গ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কেউ তাঁর নেতৃত্বের বিরোধিতা করেনি। তাঁর এই ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মদীনায় দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্র কালিমা সর্বোচ্চে স্থান পেয়েছে। একে গণতন্ত্র নয়, গণঅভ্যুত্থান বলবো।

এক পর্যায়ে হাজার হাজার মানুষ বুলেট বুকে নিয়ে শহীদ হতে এগিয়ে আসায় গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে। যদি ইরানে গণতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের বিধান চালু থাকতো তাহলে এত হাজার হাজার মানুষকে ইসলামি বিপ্লবের জন্য শহীদ হতে হতো না।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল বলেই ১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রথা গণ-বিপ্লবের সহায়ক। যারা ইসলামি বিপ্লব চান, নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধী মনে না করে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এগিয়ে আসতে পারেন।

আমরা নিশ্চিত যে তাদের নিকট তথাকথিত বিপ্লবের কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই। তারা ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে তাদের সময়, মেধা, অর্থ ও শ্রমকে অন্ধকারে অপচয় করছেন। তারা নিজেরা তো বিভ্রান্ত আছেনই, **তারা ইসলামি আন্দোলনের পেছনের কাতারের কিছু লোককে** হয়তো বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হতেও পারেন। কিন্তু তারা মুসলিম সমাজের কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা ছাড়া ইতিবাচক কোন খেদমত করতে পারবেন না। গণতন্ত্র শব্দের বিশেষ এক অর্থকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে তারা বিপ্লবের অস্পষ্ট পথে হারিয়ে যাচ্ছেন।[৩৩]

৩৩. ইসলাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যই এসেছে, এর জন্য কোন চোরাগুপ্তা পথের আশ্রয় ইসলাম নেয় না। যেসব দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী দ্বীন কায়েমের জন্য বিজাতীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল তাঁরা তাঁদের মনের অজান্তেই দ্বীন যে পরিপূর্ণ নয়, একথা স্বীকার করে নেন। গণতন্ত্রের উপর যে কোন ধরনের নির্ভরতা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথকে ভেজালযুক্ত করা ছাড়া আর কিছু করে না। ইসলাম আল্লাহ্র রাসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের মন জয় করে তাদেরকে খাঁটি তৌহিদের সুশীতল ছায়াতলে এনে তাদের মন থেকে শিরক-এর সকল অপবিত্রতার স্পর্শ দূর করে মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে দ্বীন পালনের জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী এবং তাগুতদের সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীদের সর্বাত্মক লড়াই সংগ্রাম হয়। এই লড়াই-সংগ্রামকে ইসলাম হিজরাত, জ্বিহাদ, ক্বিতাল ইত্যাদি পরিভাষায় চিহ্নিত করে। দ্বীনের স্থান জনগণের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করার ইসলামি পরিভাষা হলো দাওয়াত। যারা দাওয়াতপ্রাপ্ত তাদের মন মগজ আচার-আচরণ থেকে দ্বীনের আক্বিদা ও সুন্নাহ্ বিরোধী বিষয়সমূহ দূর করার নাম ইসলাহ্। এই ইসলাহ্-এর জন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণের দরকার হয়। একে বলা হয় তারবিয়্যাহ্ বা প্রশিক্ষণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্বীন কায়েমের সঠিক পন্থা হচ্ছে পর্যায়ক্রমে- ১. দাওয়াত, ২. তানজীম বা সংঘবদ্ধতা ৩. তারবিয়্যাহ্ বা প্রশিক্ষণ ৪. হিজরাত কিংবা জ্বিহাদ ও ক্বিতাল ৫. পূর্ণাঙ্গ ইক্বামাতে দ্বীন। এটি ইসলামের স্থায়ী পদ্ধতি এবং সর্ব স্বীকৃত পদ্ধতি। সুতরাং সম্মানিত অধ্যাপক তথাকথিক বিপ্লবীদের নিকট বিপ্লবের সুস্পষ্ট কোন রূপরেখা দেখতে পাচ্ছেন না বলে যে অভিযোগ তুলেছেন তা ভিত্তিহীন। অবশ্য দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীরা নিজেদেরকে বিপ্লবী দাবী না করে মু'মিন দাবী করাই অধিকতর সঙ্গত।

এতক্ষণে আমরা সম্মানিত অধ্যাপক সাহেবের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার রূপরেখাসহ বাকী আরও দুজন সম্মানিত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের সাহায্যকামীর বক্তব্য আলোচনা করেছি। তাঁরা সকলেই সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে ইসলাম যে কেবল আল্লাহ্‌কেই মানে একথা অকপটে স্বীকার করেন এবং গণতন্ত্র যে এই সার্বভৌমত্বকে জনগণের উপর ন্যস্ত করেছে একথাও স্বীকার করেন। এর কারণে গণতন্ত্র যে পশ্চিম থেকে আমদানিকৃত কুফরি মতবাদ তাও স্বীকার করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো তাঁরা এত সবের পরও গণতন্ত্রকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সহায়ক মনে করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই দ্বীন কায়েমের সঠিক পন্থা নির্ধারণ করেন। তাঁদের সাথে আমাদের মূল দ্বিমত এখানেই। তাঁদের একটা সঙ্গত প্রশ্ন রয়েছে যা সম্মানিত অধ্যাপক গোলাম আযম তীক্ষ্ণভাবে রেখেছেন, যা আমরা এই আলোচনার ১৪ নং ফুট নোটে উল্লেখ করেছি। তাঁর প্রশ্নটি ছিল, " যে দেশে মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সে দেশে অনৈসলামি নেতৃত্বের বদলে ইসলামি নেতৃত্ব কায়েম করার পদ্ধতি কি ?" ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এর যথাযথ জওয়াব দেব। প্রসঙ্গক্রমে জনাব সম্মানিত অধ্যাপক "ইসলামি আন্দোলনের পেছনের কাতারের কিছু লোক" বলে যে আত্মপ্রসাদ পেতে চেয়েছেন তার জওয়াবে আমরা তাকে পবিত্র কোরআনের সূরা ওয়াকিয়ার ৩নং আয়াত স্মরণ করাবো, যেখানে ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে خافضة رافعة অর্থাৎ সে দিন কতক সম্মানিত অপমানিত হবে, আর কতক অপমানিত সম্মানিত হবে। সেদিন কার অবস্থান কোথায় হবে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আমরা ঈমানদারদের কল্যাণকামী।

খিলাফাহ্ ও গণতন্ত্র ঃ তুলনামূলক আলোচনা

"প্রচলিত গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকেই আমদানী হয়েছে। ঐ গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার সর্বোচ্চ শক্তি। আইনের সার্বজনীন সংজ্ঞা হল – Law is the will of the sovereign. "সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন।" [১]

"প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।" [২]

"সত্যিকার গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই প্রথম চালু ছিল।" [৩]

"গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নিয়মকে কি অস্বীকার করা যায়? যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি বিকল্প কোন পথ আছে? [৪]

"যদি গণতন্ত্র পরিভাষাটির বিকল্প কোন পরিভাষা তৈরী করে দুনিয়ায় চালু করার কোন ক্ষমতা রাখেন তা হলে চেষ্টা করতে পারেন। " [৫]

এসবই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন আমীর, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জনাব গোলাম আযম সাহেবের।

"আধুনিক কালের ইসলামের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরা গণতন্ত্রকে ইসলামের নিকট গ্রহণীয় বলেছেন– শুধু তত্ত্বগত একটি দু'টি বিষয় ছাড়া।" [৬]

"ইসলামি দলগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন কাঠামো একই ধরনের।" [৭]

"কেবল সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যেখানে ইসলামে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মুখ্য সেখানে

---

১ থেকে ৫ পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলোর সবকটি একই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত। পুস্তিকার নাম হল – ইসলাম ও গণতন্ত্র ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম। ইতোপূর্বে আমরা পূর্ণ প্রবন্ধটি আলোচনা করেছি।

৬, ৭ এর কথাগুলো জনাব শাহ আব্দুল হান্নান সাহেবের "ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র" প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি তাঁর "দেশ সমাজ রাজনীতি" বইতে সংকলিত আছে। আমরা পূর্বেই এর আলোচনা উপস্থাপন করেছি।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে।" [৮]

"ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণ ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকার চায়। এসব বুঝবার জন্যই আজকাল গণতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শর্তাধীনে গণতন্ত্র শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।"[৯]

কথাগুলো দেশের সুপরিচিত আমলা জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নান সাহেবের।

"ইসলামি আন্দোলনের কর্তব্য হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কত্ববাদী শাসন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও জনগণের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মেকী নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে।" [১০]

"এখানে আমি জোরের সাথে বলতে চাই ইসলাম গণতন্ত্র নয় আর গণতন্ত্রও ইসলাম নয়। বরং আমি বলব অন্য কোন নীতি বা পদ্ধতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সবদিক দিয়ে ইসলাম অতুলনীয়। আমি চাই না পশ্চিমা গণতন্ত্র তার খারাপ দিকসহ ইসলামের মাঝে স্থান পাক। আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ যোগ করেই কেবল আমরা আমাদের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে অঙ্গীভূত করতে পারি।" [১১]

উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যই ড. ইউসুফ আল কারযাভী'র। "মেকী নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব"; সাথে সাথে " আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ যোগ করেই কেবল আমাদের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে অঙ্গীভূত করতে পারি।" এ জাতীয় কথাগুলো "ইসলাম গণতন্ত্র নয় আর গণতন্ত্রও ইসলাম নয় "কথার সাথে কতটা বেমানান ও স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

উপরোক্ত তিনজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের ন্যায় আরো অনেকেই ইদানিং পশ্চিমের জয় ও উন্নতিতে দিশেহারা হয়ে ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামোর প্রকৃত পরিচয় "খিলাফাহ্ আলামিন হাজিন নবুওয়্যাহ" (خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ)

৮, ৯ এর কথাগুলো প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে নেয়া।

১০ এবং ১১ ইসলাম ঃ আধুনিক যুগ, কর্মকৌশল ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী, পৃষ্ঠা ৯৬ এবং ৯৭।

বা "নবুওয়্যাতি পন্থার খিলাফাহ্" বা সংক্ষেপে খিলাফাহ্ (خِلَافَةٌ) কথাটা **বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। তাঁদের এ জাতীয় বক্তব্যকে দলিল করে একদল তথাকথিত ইসলামপন্থী Secular Democratic Government - এ যোগ দিয়ে দ্বীন কায়েমের কসরত করছেন।**

ইসলামের আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম খিলাফাহ্ আলা মিন্হাজিন নবুওয়্যাহ (خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ)। বর্তমান উন্নত পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম উদার গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র বা Liberal Democratic Nation State. অ-মুসলিম সমাজে এ ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার খুঁটিনাটি পার্থক্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত।

Liberal Democratic Nation State বিভিন্ন প্রকার। যেমন Constitutional Democracy, Parlimentary Democracy, Social Democracy ইত্যাদি। **এদের সকলের মূলে আছে স্রষ্টার কর্তৃত্বের ও সার্বভৌমত্বের অনুপস্থিতি।**

পক্ষান্তরে খিলাফাহ্ আলা মিন্হাজিন্ নবুওয়্যাহ্ এর মূল ভিত্তিই হল স্রষ্টার সার্বভৌমত্বে ও কর্তৃত্বে আত্মসমর্পণ। এখন যদি কোন মুসলিম নামধারী বলে Democracy অবলম্বন করলে কিংবা মেনে নিলে তেমন অসুবিধে হয় না– কারণ এখানে "জনগণের রায়" যেমন শাসন ও সরকার নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য ইসলামেও "জনমতের সমর্থন " ছাড়া খিলাফাহ্ সম্ভব নয়। এখানে যেমন "পার্লামেন্ট" আছে, ইসলামেও তেমনি "শু'রা" আছে। এখানে যেমন "বিচার ব্যবস্থা" আছে ইসলামেও তেমনি 'কাজী কাজওয়াত" আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমরা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবো গরু এবং ছাগলের মধ্যে দুটোরই একটি করে মাথা আছে, চারটা করে পা আছে এবং একটা করে লেজ আছে; তথাপি গরু গরুই এবং ছাগল ছাগলই, দু'টি কখনই এক নয়। তেমনি ইসলাম ইসলামই; আর গণতন্ত্রও কেবল গণতন্ত্রই, দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা। **আমরা অবশ্যই বলব ইসলামের "খিলাফাহ্" এক অনন্য ব্যবস্থা, একে গণতন্ত্রের পরিচয়ে পরিচিত করান ভুল। কারণ তৌহিদের উপর ভিত্তি হওয়ার কারণে ইসলামের "খিলাফাহ্" পাশ্চাত্যের ধর্ম-নিরপেক্ষ, স্রষ্টার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণমুক্ত গণতন্ত্র কখনই এক হতে পারে না।** এমতাবস্থায় নিজেদের অজান্তে যারা পশ্চিমাদের বর্তমান সৌর্য বীর্য দেখে ও অনুভব করে

নতজানু হয়ে পড়েছেন তারা তারস্বরে চিৎকার করবেন এই বলে যে খিলাফাহ্ এবং গণতন্ত্রে মিলই বেশি; একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিষয় ছাড়া এতে দোষের কিছুই নেই।

বর্তমান গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক সরকার হল তৎকালীন আরব সমাজের লাত, মানাত ও উয্যা

আমাদের মধ্যে যাঁরা ভুল করে গণতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত কম দোষের মনে করেন এবং ঐ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আরোহণ করে দ্বীন কায়েম করবেন বলে ঐ প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাদের ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য পবিত্র কোরআন থেকে এ ব্যাপারে আমরা সূরা আন্‌আমের ১১৪-১১৭ নং আয়াত ক'টির বক্তব্য পেশ করব ঃ

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِى حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ـ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يُّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন বিচারক-এর অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন ? আমরা যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যতা সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার প্রতিপালকের বাক্য সত্যতা ও সুবিচারে পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। আর যদি **আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে।** তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল মিথ্যাই রচনা করে। কারা বিপথগামী তাদের সম্পর্কে আপনার প্রতিপালক সব চাইতে বেশী জানেন এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার অনুগমন করে।

উপরের আয়াত ক'টি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. গায়রুল্লাহ্র কাছে বিচার-ফয়সালা দাবী করা হারাম।

২. নাযিলকৃত আল্লাহ্র কিতাব বিস্তারিত এবং ফয়সালা দানকারী।

৩. এই কিতাব যে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে তা আহলে কিতাবের লোকরাও জানে।

৪. সুতরাং ফয়সালা দানকারীরূপে এ কিতাবকে মানা এবং এর সত্যতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। (গায়রুল্লাহ্র কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া কিংবা গায়রুল্লাহ্কে মেনে নেয়াই এই কিতাব-এর সত্যতা ও ফয়সালা সম্পর্কে প্রকৃত সন্দেহ পোষণ করা)।

৫. আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র বাক্য বিশদ বর্ণনায় এবং সুক্ষ্ম বিচার-ফয়সালা দানে পরিপূর্ণ, এর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। (সুতরাং গায়রুল্লাহকে মেনে নিলে এই কিতাবকে পরিবর্তন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। কারণ গায়রুল্লাহকে আল্লাহ্র কিতাবের স্থলে স্থান দিলে প্রকারান্তরে গায়রুল্লাহ্কে পরিবর্তনকারীরূপে মেনে নেয়া হয়।)

৬. **অধিকাংশ লোকের মতের অনুসরণ আর আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়া একই।**

৭. দুনিয়ার অধিকাংশ লোক ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করে চলে। (আর ধারণা-অনুমান সাধারণত সত্যের মোকাবেলায় কিছুমাত্র কাজে আসে না)

এখন দেখা যায় যে, আয়াতগুলোর ষষ্ঠ বক্তব্যটি সরাসরি গণতন্ত্রকে গোমরাহীর পথ বলে চিহ্নিত করে। কারণ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ নয় বরং সমাজের অধিকাংশের মতের ধারণা-কল্পনার অনুসরণ।

প্রথম বক্তব্যটি ষষ্ঠ বক্তব্যের সাথে মিলালে গণতন্ত্র গায়রুল্লাহ্ হিসেবে চিহ্নিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তব্যে বোঝা যায় গায়রুল্লাহ্কে বিচার-ফয়সালা বিধান নির্ধারক মনে করলে আল্লাহ্র কিতাব যে সত্যতা সহকারে নাযিল হয়েছে এবং ঐ কিতাব যে পরিপূর্ণ সুবিচারের সাথে বিচার-ফয়সালা দেয়, সে ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে। অধিকাংশ লোকের মতের অনুসরণ করাটা গোমরাহী হওয়ার কারণ হল, অধিকাংশ লোক সত্য নয় বরং ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করে।

এখন দেখা যায়, বর্তমানে গণতন্ত্র আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে ঐ নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন রচনার ব্যবস্থা করে, অতঃপর ঐ আইনের দ্বারা আমাদেরকে ঐ নির্বাচিত লোকদের মাধ্যমে গঠিত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রের নামে শাসন করে। সুতরাং দেখা গেল গণতন্ত্র প্রথমত আল্লাহ্কে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এরপর গণতন্ত্রে নির্বাচিত পার্লামেন্ট আল্লাহ্র কিতাবকে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। অতঃপর ঐ পার্লামেন্ট নিজ সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের নামে আমাদেরকে শাসন করে। ঠিক আইয়্যামে জাহেলিয়ার যুগে এভাবে আরবের শাসকগোষ্ঠি লাত, মানাত ও উয্যার নামে তৎকালীন সাধারণ জনতার উপর শাসন ও শোষণ কার্যকর করছিল। এই লাত, মানাত, উয্যাই হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে ছিল "উদ্দা" 'সুয়া' 'ইয়াউকা' ও "ইয়াগুস"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে "গণতন্ত্র', গণতান্ত্রিক সরকার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইত্যাকার মুখরোচক নাম ভিন্ন নামে "লাত" "মানাত" ও "উয্যারই" প্রকৃত প্রকাশ বৈ আর কিছু নয়।

সুতরাং মোহাম্মদ মোস্তফা (স.)-এর সময় "লাত", "মানাত", "উয্যা" যেমন তাগুতরূপে ধিকৃত ও পরিত্যাজ্য হয়েছিল, তেমনি তাঁর খালিস অনুসারী হিসেবে আমাদের কাছেও এসব তথাকথিত "গণতন্ত্র" "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র" ও "গণতান্ত্রিক সরকার" রূপ তাগুত পরিত্যাজ্য ও ঘৃণিত হওয়া আবশ্যক।

সরকার গঠন এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অধীনস্থ জনগণের ন্যায্য সমর্থন লাভ গণতান্ত্রিক কাঠামোর পূর্ব শর্ত। তাদের পাশ কাটিয়ে কিংবা তাদেরকে উপেক্ষা করে তা করা যাবে না। কেবলমাত্র এ বিষয়টি বিবেচনা করলে খিলাফাহ্ এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এক ও অভিন্ন।

একনায়কত্বের বিকল্প যদি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন হয় তবে সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারকে একনায়কত্বের তুলনায় পছন্দনীয় বলা যাবে।

কেবলমাত্র এতটুকু বৈধ কথাকে সম্বল করেই যারা ইসলাম আর গণতন্ত্রকে এক দেখছেন কিংবা ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা খিলাফাহ্কে আড়াল করে গণতন্ত্রের শত সহস্র রূপ ও ধরনের কোন একটিকে যেমন – শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র, শর্তাধীন গণতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র অবলম্বন করার শ্লোগান দিচ্ছেন তারা প্রকৃত দ্বীন কায়েমের রাস্তা থেকে নিজেদের অজান্তেই অনেক দূরে সরে পড়েছেন। "খিলাফাহ্" এর মত মৌলিক পরিভাষাকে পাশ্চাত্যের প্রচলিত

গণতান্ত্রিক পরিভাষার আড়ালে লুকাতে গেলে কি কি বিপদ হতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করছেন **সাইয়ীদ কুতুব শহীদ** নিম্নোক্ত ভাষায় –

"সে সব ব্যক্তির লেখার ধরনকেও আমরা সঠিক পন্থা বলে মনে করি না, যারা ইসলামি সোশ্যালিজম অথবা ইসলামি গণতন্ত্র ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকে। অথবা এমনিরূপে যারা আল্লাহ্ কর্তৃক রচিত জীবনাদর্শ এবং মানবরচিত জীবনাদর্শের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও জোড়াতালি লাগানোর অপচেষ্টা করে থাকে, তাদেরকেও আমরা পছন্দ করি না। মানবিক রঙ ও প্রভাবের ছাপ বিদ্যমান থাকে। ---- এ রূপ জোর জবরদস্তিমূলক অন্যান্য মতবাদ ও দর্শনের সাথে অনর্থক তার এমন সম্পর্ক জুড়ে দেয়া উচিত নয়, যা তার জন্য ব্যাখ্যাকারী বা টিকা হিসাবে ব্যবহার হয়।

---- কোন বহিরাগত ও অভিনব উপাদানকে তার ভিতর স্থান দেওয়ার পরিণামে গোলমাল-ফ্যাসাদ ছাড়া অন্য কোন অবস্থা প্রকাশ পাবার নয়। যেমন মনে করুন একটি পূর্ণাঙ্গ অথচ খুব সূক্ষ্ম কারিগরি শিল্পযন্ত্রের কোন একটি স্থানে যদি বাইরের কোন একটি পার্ট জুড়ে দেয়া হয় তবে সেই শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।----- এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের চিন্তা-কর্মের গতিধারা ও নিয়মপদ্ধতি অপরিচিত পথের বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে থাকে যে ইসলামের ভেতর এ সকল বিধান জুড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য নবতর শক্তি সঞ্চয় করে দিয়েছেন। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক ও বাতিল এবং ইসলামের জন্য খুবই মারাত্মক। এটা ইসলামের প্রাণ-আত্মা সম্পূর্ণ অকেজো ও অকর্মা করে দেয়, আর এটি একপ্রকার পলায়নী মনোবৃত্তিবিশেষও; যদিও তা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা হয় না।" [১২]

পাশ্চাত্য পরিভাষার অপপ্রয়োগ এ শিরোনামে মুহাম্মদ আসাদের ন্যায় সুপন্ডিত বিশেষজ্ঞ বলেছেন ঃ

---

১২. ইসলামের সামাজিক সুবিচার – সাইয়ীদ কুতুব শহীদ, শিরিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা - ১৩৮৭, পৃষ্ঠা, ২৬৫-২৬৭।

"ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এ ধারণাকে বোঝাতে গিয়ে এর সমর্থক ও বিরোধী উভয় দল কর্তৃক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা ও সংজ্ঞার যথেচ্ছ ব্যবহার ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে বিভ্রান্তির একটি প্রধান কারণ। আধুনিক মুসলিমদের রচনায় এ দাবী বিরল নয় যে, "যা ইসলামসম্মত তা-ই গণতান্ত্রিক", এমনকি এ দাবী বিরল নয় যে, "সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য।" যদিও প্রতীচ্যের বহু লেখক ইসলামের মধ্যে এক ধরনের সমূহবাদের উল্লেখ করে থাকেন, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে স্বেচ্ছাতন্ত্র। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে সংজ্ঞা দানের এহেন প্রয়াস শুধু যে পরস্পরবিরোধী এবং গুরুতর আলোচনার পক্ষে ব্যবহারিক মূল্যহীন তাই নয়, শুধুমাত্র প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সমাজের সমস্যাকে দেখার এবং এভাবে ঘটনার মোকাবেলার বিপদও এতে লিখিত রয়েছে।" [১৩]

কতিপয় সাদৃশ্য দেখিয়ে "গরুকে ছাগল বলা" কিংবা "উড়োজাহাজের প্রপেলার এর জায়গায় উন্নতমানের গরুর গাড়ীর চাকা সংযুক্ত করা" যেমন বেমানান, বিসদৃশ কিংবা উদ্ভট অকার্যকর তেমনি বেমানান উদ্ভট ও অকার্যকর হল "ইসলামি গণতন্ত্র" ধরনের কোন বক্তব্যের ফেরি করা। গণতন্ত্রকে একটি আদর্শের ধারক রূপে মনে না করে শুধুমাত্র সরকার গঠন প্রক্রিয়ার একটা পদ্ধতি বলে যারা চালিয়ে দিচ্ছেন তাদের বক্তব্য কতখানি অগভীর ও হাস্যকর তা নিম্নের কয়েকটা উদ্ধৃতি থেকে সহজেই প্রমাণ করা যায় ঃ

১. **অধ্যাপক গিডিংস বলেন ঃ** গণতন্ত্র একটি শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা।

২. **ডা. কার্ল কুমবাই রোডি বলেন ঃ** গণতন্ত্র এক ধরনের জীবন ব্যবস্থা।

৩. **আর. এস. ম্যাক আইভার বলেন ঃ** গণতন্ত্র বলতে কেবলমাত্র সরকার গঠনের পদ্ধতিকে বোঝায়না, এটা একটা শাসন ব্যবস্থা।

৪. **বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ বলেন ঃ** সংসদীয় গণতন্ত্র কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর আদর্শ বৈশিষ্ট্য ------ গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটা সরকার পদ্ধতির

১৩. খিলাফাহ্ (আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ্) আধুনিক প্রেক্ষিত – মুহম্মদ রাফিকুল বারী। পৃষ্ঠা – ৩৫।

নাম নয়। এটি এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা এবং অবশ্যই একটি সমাজ ব্যবস্থা। সরকার পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্র কেবল সরকার নিযুক্তি, সরকার নিয়ন্ত্রণ ও সরকার বিলোপের ব্যবস্থা করে। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বোত্তমভাবে তখনই কাজ করতে পারে যখন রাষ্ট্র ও সমাজ আদর্শগত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হয়।" [১৪]

সরকার গঠন, ক্ষমতার হস্তান্তরকরণ, সরকারের বিলোপ সাধনের প্রক্রিয়া আদর্শ নিরপেক্ষ জীবনবোধ নিরপেক্ষ হবে কিনা এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাঁরা প্রায় সকলেই এ প্রক্রিয়া যে আদর্শ ও জীবনবোধ নিরপেক্ষ হতে পারে না তার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ক "রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল্যবোধ বর্জিত পরিস্থিতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" এরূপ মত পোষণ করেন **ডুর্কহেম প্যারেটো, ওয়েবার, ম্যাক আইভার** প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীগণ। [১৫]

খ. "মূল্যবোধহীন সমাজ-বিজ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণভাবেই অর্থহীন। মূল্যবোধহীন সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজ-বিজ্ঞান কখনো ছিল না, কখনও থাকবেও না।" কথাগুলো বলেছেন **গার্লার মীরডাল, লিপসন, অ্যালান বল, লিও স্ত্রাউজ।** এরা **সকলে মূল্যবোধহীনতার বিপক্ষে যুক্তি দেখান।** [১৬]

গ. "প্রকৃতপক্ষে অদ্যাবধি কোন রাজনৈতিক আলোচনাই আদর্শ ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেনি, মূল্যবোধ বর্জিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান এখনও দিবা-স্বপ্নের মত," Richard Neustudt, **মালফোর্ড সিবৃলি, সমিত** এবং **টেনেনহৌস** এরূপ কথাই আমাদেরকে বলে এসেছেন। [১৭]

ঘ. উপসংহারে মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করা না গেলে তাকে নিরপেক্ষ করে রাখাও সম্ভব নয়। মূল্যবোধহীন আলোচনার তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব

১৪. গণতন্ত্রের উত্তরণ, গণতন্ত্র বিনির্মাণ-বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, পৃঃ-৯২।
১৫. ১৬. ১৭. আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভূমিকা – অধ্যাপক নির্মলকান্তি সেন, পৃষ্ঠা - ২৯৮-৩০৬।

এবং মানবিক স্বার্থ-বিরোধী একটি তত্ত্ব এবং সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার অস্বীকৃতি।[১৮]

গণতন্ত্রের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, এখনকার ভরা যৌবন পাশ্চাত্যের ক্রোড়ে একথা অস্বীকার করার মত কেউ আছেন কি? সুতরাং পাশ্চাত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ মেজাজ ধারণ করা যে রাজনৈতিক তত্ত্ব, তা ইসলামের ন্যায় পরিপূর্ণ দ্বীন ব্যবস্থাতে Graft[১৯] করতে গেলে Incompatibility -এর কারণে যে Violent Graft Rejection হবে তা কি আমাদের তথাকথিত আপোষকামী, পরসৌর্য-বীক্ষণে হতাশ-নতজানু "গণতন্ত্রের-ফেরিওয়ালা"রা বুঝতে সক্ষম হবেন? আমাদের বদ-নসীব, এহেন আপোষকামী লোকদেরকেই আমাদেরকে আজ নেতা মানতে হচ্ছে। এরাই আজ আমাদেরকে নির্ভেজাল তৌহিদের জীবন থেকে মুখরোচক বুলি দিয়ে, নানারূপ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিদেশী বিজাতীয় মতাদর্শ গিলিয়ে শির্‌কে লিপ্ত করতে বাধ্য করছে; "জনগণ সার্বভৌম" এই কথাকে পবিত্র আমানত ঘোষণা করেও তাঁরা বলছেন তাঁরা শির্‌ক করছেন না, তাঁরা "খাঁটি তৌহিদ"-এর তত্ত্ব বিলাচ্ছেন !!

'গণতন্ত্র– "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের আড়ালে যে মূলতঃ সংখ্যালগিষ্ঠের শাসন," "অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ ও সমাজে এর প্রয়োগে যে দুর্বৃত্ত ও জোচ্চোরদের ক্ষমতার উর্ধাহরেণ হয় এবং যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের বর্তমান পার্লামেন্টের নগণ্য কয়েকজন ছাড়া বাকী সব" সে তর্কে না গিয়েও গণতন্ত্র এবং খিলাফাহ্ তার তাত্ত্বিক অবস্থানে কি পার্থক্য তার প্রতি একবার চোখ বুলালেই আমাদের পাশ্চাত্য প্রেমিক, মগজ-ধোলাই হওয়া নেতা-নেত্রীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েমের **সাধের গুড়ে কতখানি বালি** তা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

১৮. আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভূমিকা – অধ্যাপক নির্মলকান্তি সেন, পৃষ্ঠা - ২৯৮-৩০৬।

১৯. Graft বর্তমান সার্জারিতে একটি সুপরিচিত ব্যবস্থা। কোন অঙ্গের পরিবর্তে অন্য অঙ্গ এনে সেস্থানে লাগানো কিংবা কোন নির্দিষ্ট টিস্যু শরীরের একস্থান থেকে অন্যস্থানে লাগানোর নাম Graft করা। এক্ষেত্রে অঙ্গ বা টিস্যু যথাযথ না হলে শরীর তা প্রত্যাখান করে।

খিলাফাহ্ ঃ গণতন্ত্র

তুলনামূলক পর্যালোচনা

	খিলাফাহ্	গণতন্ত্র
১. জীবন ব্যবস্থা	আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, ইসলাম। পরকাল কেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থা।	মানব রচিত দ্বীন। বস্তুকেন্দ্রিক, ইহকাল সর্বস্ব ব্যবস্থা।
২. মূলমন্ত্র	তৌহিদ, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস।	আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব। ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার, বস্তুবাদ।
৩. মূল্যবোধ	আল্লাহর দরবারে সকল মানুষ সমান। কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতেই মর্যাদার তারতম্য হয়।	আইনের চোখে সকল মানুষ সমান তবে বস্তুগত পার্থিব যোগ্যতাই মর্যাদার তারতম্য ঘটায়।
৪. সার্বভৌমত্ব	সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। আইন দেয়ার অধিকারও একমাত্র আল্লাহ্‌র।	অধিকাংশের বেশি জনগণের এবং পার্লামেন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠদের। পার্লামেন্ট আইন রচনা করে।
৫. রায় দেয়ার অধিকার	কেবলমাত্র আহ্‌লুর রাই-দের (যারা বিচক্ষণ এবং বর্ণিত বিষয়ে কার্যকর পরামর্শ দানে সক্ষম) রায় দেয়ার অধিকার রাখে। যাদের সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা রহিত তাদের রায়দানের যোগ্যতাও রহিত।	সকল শ্রেণীর মানুষ ঃ ভাল-মন্দ, চোর-ডাকাত, অপরাধী-নিরপরাধী; শিক্ষিত মূর্খ আমানতদার-খেয়ানতকার সকলেরই ভোটদানে সমান তথা সার্বজনীন ভোটাধিকার।
৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি	আহ্‌লু জ্বিকর অথবা আহ্‌লুর রাইদের[২০] থেকে শুনে, সর্বোত্তম[২১] কথাকে বেছে নেয়া।	দুনিয়াবী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়াকেও শর্ত করা হয়নি। বরং অধিকাংশ লোকের চাহিদাকে শর্ত করা হয়েছে।

	খিলাফাহ্	গণতন্ত্র
৭. অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা	কর্তব্য প্রধান জীবনধারা। অধিকার স্বতঃস্ফূর্ত।	অধিকারের দাবীই প্রধান, কর্তব্য চিন্তা গৌণ।
৮. বাক স্বাধীনতা	নিয়ন্ত্রিত। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সমালোচনা, অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার, মিথ্যা সংবাদ প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবল মাত্র সত্যের সাক্ষ্য ও সত্য প্রচারে আদিষ্ট।	অনিয়ন্ত্রিত কোনকিছুই সমালোচনার উর্ধে নয়। শ্লীল-অশ্লীল, সত্য-মিথ্যা কোনটাই প্রচার নিষিদ্ধ নয়, সত্য মিথ্যা যা মন চায় তাই প্রচার করা যাবে কেবল প্রত্যক্ষভাবে কেউ তার অধিকার ক্ষুণ্নতা প্রমাণ করতে না পারলেই হল।
৯. অপরাপর অধিকার	জীবন ধারণের অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত এবং খিলাফাহ্ কার্যতঃ তা নিশ্চিত করে। কেবল অপচয়ের অধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র দেয় সীমালঙ্ঘনের অধিকারও নিষিদ্ধ।	জীবন ধারণের অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার-এর অবাধ সুযোগ থাকলেও রাষ্ট্র সকল দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য নয়। কেবল অন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করে না এমন শর্ত আরোপিত।. পার্লামেন্ট; নির্বাচনভিত্তিক ব্যবস্থা।

২০. পবিত্র কোরআনের নির্দেশ – فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ – যদি না জান সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। ২১ ঃ ৭।

২১. যদি একাধিক আল্লাহওয়ালা বিশেষজ্ঞ থাকে তবে তাদের সকলের মতামত ধৈর্য ধরে শুনে তার মধ্যে যা অধিকতর কল্যাণকর, যুক্তিযুক্ত, ইহ ও পরকালীন রাস্তায় লাভজনক তাই গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে দলিল হল সূরা আল যুমার এর ১৮ নং আয়াত।

	খিলাফাহ্	গণতন্ত্র
১০. সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগঠন	ক. শুরা; পরামর্শভিত্তিক মনোনয়ন ও বাইআতকেন্দ্রিক।	ক. পার্লামেন্ট; নির্বাচনভিত্তিক ব্যবস্থা।
	খ. শুরা সদস্যগণ নিজেরা পদপ্রার্থী হতে পারে না; আত্ম প্রচারে জড়িত হতে অক্ষম; কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ঘোষিত ও স্বীকৃত দোষাবলীর ধারক হতে পারবেন না।	খ. নিজেরা নিজেদের পদপ্রার্থী হন। আত্মপ্রচারমূলক অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং করেন। কোন ঐশী আইনের অনুসরণে নিজ চরিত্র সংশোধনে বাধ্য নন।
	গ. **কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট** কোন আইন পরিবর্তনের কোন অধিকার নেই। মৌলিক আইন পূর্বঘোষিত এবং অপরিবর্তনীয়।	গ. কোন ঐশী অপরিবর্তনীয় আইনের অস্তিত্ব নেই। সবকিছু সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পরিবর্তনশীল।
	ঘ. **কেবল কোরআন সুন্নাহ্‌তে সরাসরি উল্লেখ নেই এমন** বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সে আইন কোরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে সংঘর্ষশীল হলে বাতিল ঘোষিত। জাতীয় রেফারেন্ডামের মাধ্যমেও এমন কিছু বৈধতা পায় না।	ঘ. ঐশী আইনের নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে, সংখ্যাগরিষ্ঠের চাহিদার ভিত্তিতে ঘোর অনৈতিক আইনও পাশ করতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত মূলনীতিও চাইলে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে।
	ঙ. আইন প্রণয়ন নয় মূলতঃ আইনের ব্যাখ্যা দান, প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সমসাময়িক সমস্যার আলোকে কৌশল নির্ধারণ।	ঙ. আইন প্রণয়নই পার্লামেন্টের মূল কাজ, এর ব্যাখ্যা, কর্মকৌশল ও কার্যাদি সবই পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে।

এরূপে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, জীবনের নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগের স্বাধীনতা, বিভিন্ন সামাজিক সাংগঠনিক বিষয়ের সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের প্রতিযোগিতা এ সবেই খিলাফাহ্ ঐশী আইনের নিয়ন্ত্রণে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, সামষ্টিক সকল যোগ্যতা ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ সাধনের সকল বৈধ রাস্তা স্থায়ীভাবে প্রশস্ত করে। অপরদিকে মানব রচিত ব্যবস্থায় (যা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য) নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজের এসব স্বাধীনতা ও অধিকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা দ্বারা ক্রমশই পরিবর্তন করা হয়। তাই সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সত্ত্বার ক্রমবিকাশ কোন স্থায়ী নীতিতে নয় বরং সদা পরিবর্তনশীল অস্থায়ী নীতিদ্বারা পরিচালিত হয়। পরিণতিতে অস্থায়ী ও বারবার নীতির পরিবর্তনে এবং ঐশী পথ নির্দেশনার অভাবে ঐ গণতান্ত্রিক জাতি রাষ্ট্রে নানারূপ জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা, মানসিক রোগ, মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ নেশা, ভায়োল্যান্স ইত্যাকার অসংখ্য সামাজিক ব্যাধির জন্ম নেয়। অপরদিকে খিলাফাহ্ ব্যবস্থাতে স্থায়ী শান্তি লাভ সম্ভব হয়। কারণ তা সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা সর্বকল্যাণকামীর পক্ষ থেকে আগত ব্যবস্থা।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ইসলামি নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ঃ

ক. গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে গেলে তার স্থান এখানে সঙ্কুলান হবে না। আমরা এখানে আমাদের বোঝার জন্য বলবো এ যাবৎ যা আলোচনা করেছি তাই গণতন্ত্রের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আমরা এ জন্য গণতন্ত্রসহ সকল মন্ত্র তন্ত্র ত্যাগ করবো যে, এর কারণে আমরা

১. শিরকের পঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়বো।

২. এটি কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াসের কোন জায়গাতেই নেই, সুতরাং এটি বিজাতীয়। অর্থাৎ ইসলামের বাইরের, আর ইসলামের বাইরের কিছু ইসলামে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমরা আমাদের মনের অজান্তেই দ্বীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করি। অথচ আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়াতায়ালা ঘোষণা করেছেন দ্বীন পূর্ণাঙ্গ।

৩ ইসলামের শুরুর সোনালী দিন থেকে আরম্ভ করে শেষের খারাপ দিনগুলো

পর্যন্ত (১৯২৪ সনের তুর্কী খিলাফত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত) এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও কখনও গণতন্ত্রের চর্চা হয়নি কিংবা কোন ইসলামি মুজতাহিদ কিংবা ফেকাহ্‌বিদ কিংবা রাষ্ট্র-নায়ক এর প্রচলন করার সুপারিশ করেননি (যদিও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকেই ইউরোপে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আমেরিকায় এর ব্যাপক চর্চা হয়ে আসছিল)। মজার ব্যাপার হলো সম্মানিত অধ্যাপক জনাব গোলাম আযমও আমাদের এই পর্যবেক্ষণের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "খোলাফায়ে রাশেদীনের পর দুনিয়ার মুসলিম শাসন কমপক্ষে এক হাজার বছর চালু ছিল। এ দীর্ঘ শাসনামলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়নি। কিন্তু ইসলামের আদালত ও ফৌজদারী আইন চালু থাকায় এবং এর ফলে ন্যায় বিচার প্রচলিত থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম জনগণও সে শাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিদ্রোহ করেনি। জনগণের বিদ্রোহের কারণে মুসলিম শাসনামলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাস এ কথা বলে না।"

আল্লাহ্ পাক স্বয়ং দ্বীনকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করবেন আর যে পদ্ধতিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত থাকে কিংবা দ্বীনের অনুসারীদের গাফেলতির কারণে বিজাতীয়দের সংস্পর্শে খিলাফত ভেঙ্গে যায় তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি বলে দেবেন না এটা হতেই পারে না। বিশেষতঃ তিনি যেখানে বলেন-

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَامِهِمْ

যে দিন আমি প্রতিটি মানব গোষ্ঠিকে
তাদের ইমামের নামে আহ্বান করবো।[২২]

ক্বিয়ামাহ্ সংঘটিত হবার পর হাশরের ময়দানে রব্বুল আলামীন প্রতিটি মানবগোষ্ঠিকে তাদের নেতার (ইমামের) নামে নিজের দিকে আহ্বান করবেন। প্রতিটি মানুষের জন্য তার নেতা নির্ধারণ বিশেষতঃ মুসলিমদের দ্বীনি জিন্দেগীতে নেতার গুরুত্ব কত বেশি তা বোঝানোর জন্য আর কিছুর প্রয়োজন আছে কি? এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পদ্ধতি কোরআন সুন্নাহ্‌তে থাকবে না আর তার জন্য কাঙ্গালের ন্যায় বিজাতীয় আদর্শের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত বাড়াতে হবে এমন একটা জুলুমমূলক কল্পনা কোন ইসলামি নেতৃত্বের পক্ষে শোভা পায় কি?

২২. সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং ৭১।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

তারা তাদের নিজদের মধ্যে পরামর্শ করে তাদের নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে।[২৯]

এখানে পরামর্শ গ্রহণের গুরুত্বের সাথে নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ ঈমানদারদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ছাড়া কাজ যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না, তেমনি বেঈমানদের পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং মু'মিনদের ইমারত বা নেতৃত্ব নির্ধারণে কাফির ও মুশরিকদের স্থান নেই। অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকরা ইমারাত নির্ধারণে যেমন রায় দিতে পারবেনা তেমনি তারা মু'মিনদের নেতাও হতে পারবে না। এমনকি নেতা নির্ধারণী পরামর্শ সভার সদস্যও হতে পারবে না। এছাড়া যার মধ্যে মুনাফেকির প্রমাণ পাওয়া যাবে তাকেও এর থেকে বঞ্চিত করা হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো-

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যদি না জান, যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।[৩০]

এখানে اَهْلُ الذِّكْرِ এর নিকট পরামর্শ গ্রহণের অর্থ হলো, যে যেই বিষয়ে জ্ঞানী তার কাছ থেকে সেই বিষয়ের পরামর্শ চাওয়া। দ্বীনি ইমারাত নির্ধারণে পথ ও পন্থা প্রণয়নে اَهْلُ الذِّكْرِ হবেন তাঁরা যাঁরা দ্বীন সম্পর্কে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সুতরাং ইমারাত কিংবা ইমারাতুল কোবরা নির্ধারণের নিয়ম-নীতি প্রণয়নে কেবল কোরআন ও সুন্নাহ্য় অভিজ্ঞ ঈমানদারদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে দ্বীনের ফকিহ্দের নিয়ে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে কোরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতি ঠিক রেখে নেতা নির্ধারণের নিয়মগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়া যেতে পারে। একজন ফকিহ্র তুলনায় একাধিক ফকিহ্ এ দায়িত্ব পালন করলে বর্তমান যুগের সকল সমস্যাকে সামনে রেখে কোরআন ও সুন্নাহ্র সকল মূলনীতি ব্যবহার করে সর্বজন গ্রাহ্য পদ্ধতি রচনা করা মোটেই কঠিন হওয়ার কথা নয়। এই ফকিহ্দের মতামত কোন্ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ্ বলেন-

২৮. সূরাতুর রা'দ, আয়াত নং ৩১।
২৯. সূরাতুশ্ শুরা, আয়াত নং ৩৮।
৩০. সূরা আন্ নাহ্ল, আয়াত নং ৪৩।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

(ঈমানদারগণ এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে)
তারা মনযোগ দিয়ে কথা শ্রবণ করে
অতঃপর যা উত্তম (এবং সর্বাধিক নির্ভুল) তা গ্রহণ করে।[৩১]

এখানে মনযোগ সহকারে শোনার কথা বলা হয়েছে, ফকিহ্দেরকে তাঁদের মতামত খোলাখুলিভাবে, স্বাধীনভাবে (কোন প্রকার অন্যায় চাপ ব্যবহার না করে) দেয়ার সুযোগ দেয়ার পর যখন তাঁরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য দেবেন তখন তা যথাযথভাবে শুনে বুঝে তার মধ্যে যা অধিকতর বাস্তবমুখী ও নির্ভুল তা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং উপরোক্ত ফকিহ্দের সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে রাসূল (স.)-এর ঘোষিত নেতা নির্ধারণীর প্রক্রিয়াকে খুব সহজেই প্রয়োগ করা যায়। রাসূল (স.)-এর ঘোষিত পদ্ধতিটি নিম্নরূপ-

اِجْعَلُوْا اَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ

ক. তোমারদের মধ্যে অধিকতর উত্তমদেরকে নেতা নিযুক্ত কর।[৩২]

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَأَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا لِلسُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُوْلَ فِيْ سُلْطَانِهٖ وَلَا يَقْعَدُ فِيْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

খ. ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, কোরআনের জ্ঞানে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি ইমামতি করবে (নেতৃত্ব দিবে)। এ ব্যাপারে সকলে যদি সমকক্ষ হয় তবে সুন্নতের জ্ঞানে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি নেতৃত্ব দিবে। যদি এ বিষয়েও একাধিক সমান পারদর্শী হয় তবে যিনি আগে হিজরত করেছেন তিনি ইমামতি করবেন। এ ক্ষেত্রেও সমান হলে বয়সে যিনি প্রবীণ তিনি

৩১. সূরা আল যুমার, আয়াত নং ১৮।
৩২. ইন্তেখাবে হাদিস, পৃষ্ঠা ২১৮।

নেতৃত্ব দিবেন। কোন ব্যক্তি যেন অপরের প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি এবং বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতীত তার নির্দিষ্ট যায়গায় না বসে।[৩৩]

উপরোক্ত দু'টি হাদিস নেতৃত্ব, ইমামত ও খলিফা নিযুক্তির প্রশ্নে সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা। এ দু'টি হাদিসে যে মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছে তার মাধ্যমে আমরা মুসলিম জাহানের খিলাফত থেকে শুরু করে মুসলিম দেশ, মুসলিম এলাকা, শহর, গ্রাম কিংবা পরিবার পর্যন্ত সর্বত্র ইমাম কিংবা নেতা নির্বাচিত করার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাই।

প্রথম মূলনীতি হলো যিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তিনি ইমাম বা নেতা হবেন। এটা সব স্তরেই প্রযোজ্য। পরিবারের সর্বোত্তম ব্যক্তি পরিবারের নেতা, মহল্লার সর্বোত্তম ব্যক্তি মহল্লার নেতা, গ্রাম বা শহরের সর্বোত্তম ব্যক্তি গ্রাম বা শহরের নেতা, একইভাবে কিংবা মুসলিম বিশ্বের নেতাও মুসলিম দেশ কিংবা মুসলিম বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তি।

এখন কিসের ভিত্তিতে এবং কোন গুণের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নেতা বা ইমাম নির্ধারিত হবেন তা উপরের দ্বিতীয় হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। মসজিদের ইমামতি বা সালাতুল জামাআতের ইমামতি এবং সমাজ সংসারে নেতৃত্ব আলাদা হওয়া আদর্শ ইসলামি খিলাফাহ্ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়। নবুয়্যাতের যুগে এবং খিলাফাহ্র যুগে সালাতের ইমাম এবং সমাজের রাষ্ট্রের ইমাম একই ব্যক্তি ছিলেন। এটিই আদর্শ নীতি। খিলাফাহ্র ব্যবস্থায় যখনই অনুত্তম ব্যক্তি নীতি বহির্ভূত পন্থায় নেতৃত্বে এসেছেন তখনই ইসলামের প্রকৃত আদর্শের অনুসারীরা তার হেফাজতে প্রাণ দিয়েছেন।[৩৪]

আদর্শ খিলাফাহ্ ব্যবস্থার পর উম্মাতের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এমনকি মূল খলিফা কিংবা উলিল আমর রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও সালাত-সিয়ামসহ উম্মাহ্র যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দিবেন, না এই দুই কর্তৃত্ব দুই ভাগ হবে এ নিয়েও মতভেদ দেখা দেয়।[৩৫]

৩৩. মুসলিম শরীফ থেকে মিশকাতে উদ্ধৃত হয়েছে, ইন্তেখাবে হাদিস পৃষ্ঠা ২২২।

৩৪. এ ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.) এবং ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা প্রমাণ হয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে নফসে যাকিয়্যাহ্র আন্দোলন এবং ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আন্দোলন এই একই সাক্ষ্য বহন করে।

৩৫. মা'রিফুল কোরআন-এর সংক্ষিপ্ত -খাদেমুল হারামাইন কর্তৃক প্রকাশিত, ২৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এখানে আমরা যা বুঝেছি তা হলো রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্ব এবং ধর্মীয় মাসলা-মাসায়েল তথা সালাতের নেতৃত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব একই উলিল আমর-এর উপর ন্যস্ত। দুই কর্তৃত্বের আলাদা হওয়ার ধারণাটা বিচ্যুতি বৈ কিছু নয়। খিলাফাহ যখন রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয় তখনই এই দ্বৈত নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। এখনও যদি খিলাফাহ্ আলা মিন্হাযিন নবুওয়্যাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে এই উভয় কর্তৃত্বই উলিল আমর-এর অধিকারীর উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রকৃত উলিল আমর তথা ইসলামি বিশ্বের খলিফাহ্ থেকে শুরু করে দেশ, এলাকা, পাড়া-মহল্লা পরিবার সর্বত্র উলিল আমর-এর যে সব যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা উপরোক্ত ইবনে মাসউদের হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। সেখানে ৫টি বিষয় উল্লেখ হয়েছে এবং তার ক্রমগুরুত্বও বলা হয়েছে। একটু বিস্তারিতভাবে বললে বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

ক. এ বিষয়ে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচ্য বিষয় হলো কিতাবুল্লাহ্র (কোরআনের) উপর কার দক্ষতা বেশি। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে ইল্ম-আমল-তাকওয়া এবং ইস্তেনবাত করার যোগ্যতা ও মা'রিফাতিল্লাহ্, যুহদ, তায্কিয়্যাতুন্নাফ্স, সাহস, বিচক্ষণতা ইত্যাদি সবই এ পারদর্শিতার অন্তর্গত। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেন এ বিষয়ে যদি এককভাবে কেউ সকলের উর্ধে বিবেচিত হন কেবল তখনই তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং উলিল আমর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। যদি এ বিষয়ে অন্য আরও কেউ একই সমপর্যায়ের হন কেবল তখনই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হবে।

খ. দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুন্নাহ্র উপর পারদর্শিতা। যদি কোরআনের উপর পারদর্শিতায় সমকক্ষ একাধিক জন থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে যিনি সুন্নাহ্র বিষয়ে অধিকতর ওয়াকিফহাল এবং অধিকতর পাবন্দ থাকেন তবে এ ক্ষেত্রেও অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্র উভয় ক্ষেত্রে সমান পারদর্শী একাধিক ব্যক্তি থাকেন তবেই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হবে। এখানে অবশ্যই একথা অনুধাবন করা দরকার যিনি কিতাবুল্লাহ্তে পারদর্শী তিনি সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ সর্ম্পকেও পারদর্শী। তবে এ ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্র পারদর্শিতার ক্ষেত্রেও একটু কম-বেশি হওয়ার অবকাশ আছে।

গ. তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো কে কত আগে হিজরত করেছেন। সাহাবীদের যুগে হিজরত কে আগে কে পরে করেছেন বোঝা কঠিন ছিল না। মক্কা বিজয়ের

পূর্বে মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে হিজরত করা ঈমানের শর্ত ছিলো। সামর্থ থাকা সত্বেও যারা হিজরত করেননি তাঁদের সাথে মুসলমানদের ন্যায় আচরণ করা নিষেধ ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) ঘোষণা করেন-

لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই।[৩৬]

অপর এক প্রকার হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। যেটি কি্বয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) বলেছেন- اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ তিনিই মুহাজির বা হিজরতকারী যিনি আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় থেকে হিজরত করেছেন বা বর্জন করেছেন।[৩৭] বোখারী শরীফের টীকাকার আল্লামাহ্‌ আইনি বলেছেন, "স্থায়ী হিজরাতের অর্থ হচ্ছে পাপ কর্ম পরিত্যাগ করা।"[৩৮]

বর্তমান Globalization বা বিশ্বায়নের যুগে দাজ্জালি শক্তি, কুফরি শক্তি সমগ্র বিশ্বটাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে হিজরত করে যাওয়া যায় এমন কোন যায়গাই আর বাকী নেই। গভীর অরণ্য বলেন, পাহাড়ের গুহা-কন্দর বলেন কিংবা গভীর সমুদ্রের তলদেশ বলেন সর্বত্রই দাজ্জালি শক্তির নিয়ন্ত্রণের আওতায় রয়েছে। খাঁটি তৌহিদভিত্তিক সমাজ-এর অস্তিত্ব এই দাজ্জাল (অর্থাৎ Judio-Christian সভ্যতার ধারক-বাহক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্মদাতা ও লালন-পালনকারী আমেরিকা) মুহূর্তের জন্যও সহ্য করবে না।

আলজিরিয়ায় ইসলাম বিজয়ের প্রচেষ্টা, আফগানিস্তানের ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা ইরানের ইসলামি বিপ্লব কোনটাই এই কালো শক্তি সহ্য করেনি। বস্তুতঃ দ্বীনের দাবী পূরণ করে পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জিন্দেগী যাপন-এর জন্য যাওয়ার মত কোন যায়গা এখন আর নেই। সুতরাং এখন দ্বিতীয় ধরনের হিজরতই বিবেচনার বিষয় বলে ধরে নেয়া দরকার।

ঘ. চতুর্থ ও পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে বয়সের প্রবীণতা ও নিজ এলাকা বা অঞ্চলের বাসিন্দার বিষয়। এ দু'ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যরা নেতৃত্ব দিতে পারে।

৩৬. মা'রিফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর, খাদেমুল হারামাইন প্রকাশনা - পৃষ্ঠা-২৭০।
৩৭. মা'রিফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর, খাদেমুল হারামাইন প্রকাশনী - পৃষ্ঠা-২৭০।
৩৮. মা'রিফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর, খাদেমুল হারামাইন প্রকাশনী - পৃষ্ঠা-২৭০।

উপরোল্লিখিত ৫টি বিষয় আরও পরিষ্কার করে বোঝার জন্য নিম্নের ২টি বিষয় অবশ্যই খেয়াল করতে হবে।

প্রথম বিষয়টি হলো ঃ যদি এমন হয় একজন আল্লাহ্‌র কিতাবে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে কিন্তু অপরজন সুন্নাহ্‌র পারদর্শিতার ক্ষেত্রে, হিজরতের ক্ষেত্রে, বয়সের প্রবীণতার ক্ষেত্রে এমনকি আঞ্চলিকতার দিক দিয়েও এক যোগে অধিকতর অগ্রসর এমতাবস্থায় কে নেতৃত্ব পাওয়ার অধিক হকদার ? এক্ষেত্রে প্রথম জনই অধিক হকদার। কারণ, হাদিসের ভাষাতেই আছে প্রথমে যে বিষয় দেখা দেবে তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাবে পারদর্শিতা, এ ক্ষেত্রে একাধিক সমপারদর্শিতার কেউ না থাকলে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়ের প্রশ্নই আসে না।

দ্বিতীয় বিষয় হলো ঃ উল্লিখিত ৫টি ইতিবাচক গুণ তখনই বিবেচ্য হবে যখন পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত সেই সব দোষের অনুপস্থিতি ঘটবে, যেগুলো কালাম-ল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে- ৪৭ ঃ ৩৩, ২৫ ঃ ৫২, ৪ ঃ ১৪১, ৩৩ ঃ ১, ৪ ঃ ১৪০, ৬৮ ঃ ৮, ৯,১০, ৭৬ ঃ ২৪, ২৫ ঃ ৩৩, ১৮ ঃ ২৮।

উপরোক্ত নেতিবাচক বিষয়ের অনুপস্থিতিতেই কেবল অগ্রবিবেচ্য ৫টি বিষয়কে বিবেচনার ক্রমধারায় আনতে হবে। উলিল আমর, ইমাম, খলিফাহ্‌, আমীরুল মু'মিনিন এই পদগুলো সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই পদের জন্য মৌলিক যোগ্যতা কি কি ? এ পদের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী কি হওয়া উচিত এবং কোন কোন দোষের সংশ্রব থাকলে উলিল আমর হওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হয় আর কি কি কারণে উলিল আমরকে পদচ্যুত করানো যাবে তার সবই কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

কিভাবে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে ?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনৈসলামি নেতৃত্বের বদলে ইসলামি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। অবশ্য কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এখন এ মুহূর্তে যদি বাংলাদেশে ইসলামি খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা হলে কি করতে হবে ? আমরা কি সর্বপ্রথম ফকিহ্‌দের কোন Body তৈরী করবো? যদি ফকিহ্‌দের Body নির্দিষ্ট করতেই হয়, কিসের ভিত্তিতে, কাদের সনদের বদৌলতে Body তৈরী করবো ? আমরা কারা ? আমাদের কথা সকল মুসলিম কেন শুনবে ? এ সব প্রশ্নের জওয়াব এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। তবে জওয়াব আছে।

Body নির্ধারণের এই অনিশ্চয়তা এবং মুসলিম সাধারণের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কেবল তখনই প্রশ্ন উঠে যখন জানা নেই শোনা নেই হঠাৎ কোন একদল লোককে "সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ" কিংবা "খিলাফাহ্ পরিষদ" ইত্যাকার নামে ঘোষণা দিয়ে এ লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হয়। তাঁদের যোগ্যতা যতই হোক না কেন, তাদের আমানতদারী আল্লাহ্ ভীতি যত উচ্চেই উঠুক না কেন হঠাৎ গজানো কোন পরিষদ কর্তৃক তা আদৌ সম্ভব নয়। তাঁদের শারীরিক যোগ্যতার দলিল প্রমাণ, জ্ঞানের প্রশস্ততার ভুরি ভুরি প্রমাণ এমনকি বিস্ময়কর ইস্তেনবাত এর যোগ্যতাও এলক্ষ্যে কোন কাজে আসবে না।

বস্তুত এটি কোন যুক্তিযুক্ত পন্থা হতেই পারে না । কারণ আল্লাহ্র রাসূল (স.) এভাবে দ্বীন কায়েম করেননি। তিনি যেভাবে প্রথমে দাওয়াত দিয়েছেন আমাদেরকেও সেভাবে দাওয়াত পেশ করতে হবে। সেই দাওয়াতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়ন/তাগুত ইত্যাদি বিষয় রাখ ঢাক না রেখে খোলাখুলিভাবে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এসব বুঝে তাগুতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে (কেবলমাত্র আল্লাহ্র নবী যেমন সংঘবদ্ধভাবে মক্কার জিন্দেগীতে মক্কার ঘরে ঘরে কিংবা হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে দাওয়াত দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তেমন) কর্মসূচী নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর দাওয়াত প্রাপ্তদের নিয়ে সংগঠন গড়তে হবে এবং সংগঠনকে মজবুত শৃঙ্খলায় আনতে হবে। যারা দাওয়াত কবুল করে সংঘবদ্ধ হবে তাদের সাথে বাস্তব জীবন পরিক্রমায় দ্বীনের বাস্তব অনুশীলনে তৎপর হতে হবে। ইতোমধ্যে সমাজের এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত তাগুতি শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি এই সংঘবদ্ধ দলকে নিশ্চিহ্ন করার সকল কলাকৌশল প্রয়োগ করবে এবং দ্বন্দ্ব/সংগ্রাম/যুদ্ধ ইত্যাদিতে জড়িয়ে ফেলবে। আল্লাহ্র রাসূল (স.) যেমন কোন প্রকার প্রলোভন, হুমকি, চাপের নিকট মাথা নত না করে কোন প্রকার compromise না করে সত্যের দাওয়াতকে শত অত্যাচার নির্যাতনের মুখেও তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন তেমনটি করতে হবে। জেল-জুলুম-গুপ্ত হত্যা, প্রকাশ্য মারধর, হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ-সামাজিক বয়কট এমনকি লাঠি/ছুরি/রামদা থেকে শুরু করে কালাশনিকভ, একে-৪৭ এর মধ্য হয়ে ক্লাস্টার বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করার মুখেও অটল থেকে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। কোন আন্দোলন যদি দ্বীন কায়েম-এর লক্ষ্যে উল্লিখিত স্তরগুলো যেমন- ১. দাওয়াত বা তাবলীগ ২. সংগঠন বা তানজীম ৩. তারবিয়্যাহ্ বা প্রশিক্ষণের স্তর যথাযথভাবে পার হতে থাকে, হিকমতের নামে যদি কোথাও

compromise না করে দ্বীনের দাওয়াতের এবং সত্যের সাক্ষ্য দানে ভেজাল মিশ্রিত না করে; জাহিলিয়্যাহ্র কোন কলাকৌশলকেই আন্দোলনের জন্য লাভজনক মনে না করে, তাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত তাগুতি শক্তি কিংবা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না হয়ে পারে না। সেই দ্বন্দ্ব সংগ্রামে দু'টি বিষয় অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটবে। এক. আন্দোলনে আসা ব্যক্তিবর্গ নেফাকের যাবতীয় কলুষমুক্ত হয়ে খাঁটি ঈমানদারে পরিণত হবে এবং দুর্বলচেতা কিংবা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গ ভয়ে পালাবে। দুই. দুনিয়ার নির্যাতিত নিষ্পেষিত জনতার দৃষ্টি আকর্ষিত হবে, তারা আশায় বুক বাঁধবে এবং এ আন্দোলনের সাথে ধীরে ধীরে একাত্মতা ঘোষণা করবে, অপর দিকে আরামপ্রিয় আয়েশিরা compromise এর পথ তালাশ করে ব্যর্থ হয়ে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবে।

যদি হিক্মাহ্র নামে প্রতিষ্ঠিত তাগুতি শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ রক্ষায় মুচলেকা দিয়ে সত্যের কোন অংশ প্রকাশ কোন অংশ আড়াল করে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ঢং-এ গণতন্ত্র মানবাধিকার ইত্যাকার বিষয় মেনে নেয় তা হলে আন্দোলনে স্বার্থবাদীদের ভীড় জমবে, আন্দোলনের মেদ বাড়বে কিন্তু প্রকৃত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুদূর পরাহত থাকবে।

সুতরাং দ্বীন কায়েমের জন্য কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ নেই। দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম-যুদ্ধে যারা জয়ী হবেন তাদের পক্ষে উপরোক্ত ফকিহ দল নিযুক্ত করে কোরআন ও সুন্নাহ্র সীমানায় থেকে খিলাফাহ্র বিভিন্ন পদে নেতৃত্ব মনোনয়ন, নিযুক্ত করণ কিংবা নির্ধারণ করা কোন কষ্টের ব্যাপারই হবে না। যারা দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম-জ্বিহাদ-ক্বিতালের প্রত্যক্ষ রাস্তা এড়িয়ে তাগুত তোষণনীতি অবলম্বন করে দ্বীনকে বিজয়ের আসনে বসাতে চায় তাদেরকে বলবো আল্লাহ্ পাক পবিত্র, কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই আল্লাহ্র দরবারে পৌছায়। পঁচা ভেজালযুক্ত কিছুই সেই দরবারে গৃহীত হয় না। আল্লাহ্র রাসূল (স.)-এর পদ্ধতি অবলম্বন করলে জ্বিহাদ-ক্বিতাল এর কোন শর্ট কাট রাস্তা নেই। আন্দোলনের মাধ্যমে সার্বিক সফল দ্বীন বাস্তবায়ন করতে হলে জ্বিহাদ-ক্বিতালের কঠিন পরীক্ষা পাশ হতেই হবে। এমনিভাবে যারা পাশ করবে তাদের জন্য খিলাফাহ্ কায়েম করা কিংবা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কোন কঠিন বিষয় নয়। জ্বিহাদ-ক্বিতাল এড়িয়ে কাল্পনিক কুসুমাস্তীর্ণ পথে যারা যাবে তারা প্রতিষ্ঠিত তাগুতের লেজুড়বৃত্তি করেই তাদের দ্বীনি আন্দোলনের সমাপ্তি টানবে।

❑ পরিশিষ্ট

ক. এক চোখ

খ. জবরদখলকৃত কোম্পানীর দায়িত্বশীল ঃ একটি উপমা

গ. হযরত ইসা (আ.) ঃ নবুওয়্যাতপূর্ব জীবন

পরিশিষ্ট

এক চোখ

ইউ. এস. ডলারে সেই এক চোখ সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা দরকার। পশ্চিমা দর্শনের এ বিশেষ দিকটি উন্মোচিত না হলে চলমান বিশ্বের ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরিক্রমায় পশ্চিমারা আজ এ নীতিতে এসেছে। সুবিধাবাদ, ভোগবাদ, উদারতাবাদ ছাড়াও "জোর যার মুল্লুক তার", "যোগ্যতমের উর্দ্ধতন" সর্বোপরি "নৃতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা" পশ্চিমাদের মন মগজে খুব শক্ত করে বসে আছে। তাদের থিংকট্যাঙ্কগুলোর সবাই একযোগে এ সব বিষয় তাদের একান্ত নিজস্ব অধিকার বলে মনে করে। বিশেষ করে "জাতীয় স্বার্থের ভৌতিক চিন্তা" যখনই তাদের মনোজগতে হানা দেয় তখনই তারা চরম একদেশদর্শীতার পরিচয় দেয়।

তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ববাদের নৈতিক ভিত্তি দেয়ার জন্য এবং তাদের দাস ব্যবসার বৈধতা দানের জন্যই তারা Charles Darwine কে দিয়ে Darwinism তত্ত্বের উদ্ভাবন করে। পরবর্তীতে এই মতবাদের ভিত্তিতে তারা তাদের নিজেদের নৃতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় মত্ত থাকে। জনাব হারুন ইয়াহ্ইয়া এই Social Darwinism[১] এর মারাত্মক বর্ণবাদী রূপের কুৎসিৎ চেহারা উন্মোচন করেছেন যথাযথভাবেই। (অতি হালের) D. N. A বিশ্লেষণের মাধমেই কেবলমাত্র প্রমাণিত হয় গোটা মানবজাতি এক আদি পিতা থেকে এসেছে। তার আগে তাদের টার্গেট ছিল একথা প্রমাণ করার যে তাদের উৎপত্তি কোন এক উন্নত প্রজাতি থেকে হয়েছে যেখানে আফ্রিকান কিংবা এশিয়ানদের উৎপত্তি নিম্ন শ্রেণীর কোন প্রাণী-গোষ্ঠি থেকে হয়েছে। বনের শক্তিশালী পশু দুর্বল প্রাণীগুলো শিকার করে খায়, বড় মাছ ছোট মাছ খায়, এমন একটা যুক্তি দেখিয়ে তারা অন্যদের জীবন সম্পদ লুণ্ঠনের নৈতিক অধিকার সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মাথা ঘামাতে থাকে। তবে তাদের সে প্রচেষ্টা অতি হালের গবেষণায় নাকচ হয়ে যায়।

---

১. Disasters Caused by Social Darwinism, Harun Yahya.

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ধর্ম বিবর্জিত চিন্তাধারার প্রাধান্য পেতে থাকে। এর অনেকগুলো বাস্তব কারণও ছিল। আমরা স্থান সঙ্কুলানের অভাবে সে দিকে যাচ্ছিনা। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের কোথাও ধর্মীয় বক্তব্যের প্রভাব যাতে না পড়ে; পরকাল ভীতি কিংবা স্রষ্টার আইন বিধান পালনের বাধ্যকতা থেকে সযত্নে দূরে থাকার সকল ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন এক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জন্ম লাভ করে। মানবতার সমগ্র ইতিহাসে **এই প্রথমবারের মত** ইউরোপের মানুষ স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। মানবতার ইতিহাসে মানুষের জন্য **সবচাইতে বিপর্যয়কর ফিত্‌নার** তখনই উদ্ভব হয়। **মানুষ এই প্রথম নিজেকে স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণহীন ভাবতে শুরু করে।** "সবার উপর বস্তু সত্য তাহার উপর নাই" এমন বিশ্বাসকে সম্বল করে স্রষ্টা পরকাল জওয়াবদিহীতাকে অস্বীকার করা হয়। স্রষ্টার নিকট জওয়াবদিহীতার অনুপস্থিতিতে জাগতিক আরাম-আয়েশের প্রয়োজনে অন্যদের সম্পদ ছলে-বলে কলে-কৌশলে লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি এই স্রষ্টার কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী ইউরোপীয় মানবগোষ্ঠির মন মগজে চেপে বসে। তারই পরিণতিতে ঔপনিবেশিকতাবাদের সৃষ্টি হয়। ঔপনিবেশিকতাবাদের নেতৃত্বে থাকে বৃটিশরা। তাদের মুদ্রা ছিল পাউন্ড স্টার্লিং। এই ঔপনিবেশিক যুগে বৃটেন ছিল '**কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র**'। দুনিয়ার সর্বত্র আদান-প্রদানের ভিত্তিরূপে পাউন্ড স্টার্লিংকে তারা প্রতিষ্ঠিত করে। ঔপনিবেশিকতার এই যুগে ইউরোপীয়রা পৃথিবীর অ-ইউরোপীয় অংশের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দখল করে এবং বিজিত দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। বিজিত দেশগুলোর উপর তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ছাড়াও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগও তারা তখন পায়। ইতিহাসের এ অধ্যায়কে আমরা প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতার যুগ বলতে পারি। এ যুগে বৃটেনকে "কৃর্তৃত্ববাদী" রাষ্ট্রের ভূমিকায় দেখা যায় এবং পাউন্ড স্টার্লিং হয় এ সময়ের মুদ্রা বাজারে সর্বাধিক শক্তিশালী মুদ্রা। আর দর্শনের জগতে স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণহীন মতবাদ বা বিশ্বাসসমূহের ব্যাপক প্রসার তখন ঘটে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এ সময়টা ছিল কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের পালা-বদল কাল। এ দু'টি বিশ্ব যুদ্ধের সার্বিক ফলাফলে আমেরিকা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হল, আর পাউন্ড স্টার্লিং-এর স্থলে ইউ. এস. ডলার শক্তিশালী মুদ্রায় পরিণত হল।

১৯৪৪ সনে নিউ ইয়র্কের অদূরে "ব্রেটন উডস" নামক যায়গায় একটি বিশেষ কনফারেন্স হয়। সেই কনফারেন্সেই ইউ. এস. ডলারকে বৃটিশ পাউন্ড স্টার্লিং-এর মোকাবেলায় শক্তিশালী ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের ভূমিকায় বৃটিশের যায়গায় আমেরিকার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। **ইউ. এস. ডলারের পিরামিড শীর্ষের আভাযুক্ত চক্ষুটি এই কর্তৃত্ববাদিতাকেই নির্দেশ করে।** আজকের দুনিয়ার সর্বত্র আমেরিকার কর্তৃত্ব ও দাপট ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক স্বীকৃত হয়। এ সময়ে সমগ্র প্রাশ্চাত্য আমেরিকার নেতৃত্বে বিপুল সামরিক শক্তি অর্জন করে এবং তথ্য সম্প্রচার জগতে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তির সাথে কারিগরি ও তথ্য সম্প্রচার জগতের একক চালিকা শক্তি হওয়ার কারণে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে নিজেদের অজান্তেই পাশ্চাত্যের দর্শনকে, পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থাকে, পাশ্চাত্যের অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজদের সমাজ ও রাষ্ট্রিয় জীবনে গ্রহণ করে। একে আমরা **ঔপনিবেশিকতা উত্তর যুগ** বলতে পারি। এ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিকতার যুগের দর্শনকে সামাজিক সাংস্কৃতিকভাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর নেতৃত্বে থাকে আমেরিকা। পাউন্ডের যায়গায় ইউ. এস. ডলারের কর্তৃত্ব মুদ্রা বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থা আরও কিছুকাল চলবে।

আমেরিকা ও ডলারের কর্তৃত্বের স্থলে অপর এক কর্তৃত্বের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর-১১ এর ঘটনা তার সূচনা কাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্বে সারযোভোর রাজ পথের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে বৃটিশ ও পাউন্ড স্টার্লিং এর কর্তৃত্ব পরিবর্তন হয়ে যেমন আমেরিকা ও ডলারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি সেপ্টেম্বর-১১-এর ঘটনার পরবর্তী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার ও ডলারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে অপর এক তৃতীয় কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের এবং মুদ্রার জন্ম নিচ্ছে। খুব সম্ভব নীলনদ থেকে ফোরাত এর তীর পর্যন্ত অঞ্চলকে যারা নিজেদের বিধাতার দেয়া অঞ্চল বলে দাবী করে সেই ইসরাঈল হচ্ছে অতি **আসন্ন কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র** এবং তাদের বিশেষ প্রচলন করা কোন "**ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা**" দখল করবে ডলারের স্থান। বৃটিশ ও পাউন্ড স্টার্লিং-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন ধর্ম নিরপেক্ষ দর্শনের সামাজিকীকরণ হয়েছে আমেরিকা ও ডলারের নেতৃত্বে New World Order এর মাধ্যমে। শীঘ্রই ইসরাঈল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে তাদের নির্দেশিত মুদ্রার ক্ষমতায় সমগ্র বিশ্ব পদানত হবে।

সেপ্টেম্বর-১১ পরবর্তী কালে আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ ও নিশ্চিহ্ন করণ; ইরাক আক্রমণ ও দখল প্রতিষ্ঠিত করণ দুনিয়া জোড়া ত্রাস-এর সঞ্চার করার সাথে সাথে আমেরিকার প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করছে। অপরদিকে আমেরিকার অর্থনীতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, আমেরিকানদের স্বাধীন চলাফেরার প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে ইসরাঈল অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। জাতিসংঘের ম্যানডেট অমান্য করার কাজ সে অনেক আগ থেকেই করছে। ইদানিং আমেরিকা বৃটেনের অনুরোধ উপরোধও সে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কিংবা মানতে অস্বীকার করছে। কারিগরি দক্ষতায়, সামরিক যোগ্যতায়, তথ্য সম্প্রচারের কর্তৃত্বে, সর্বোপরি নির্ভুল ও সফল গোয়েন্দাবৃত্তিতে ইসরাঈল এখন এগিয়ে। নীল নদ থেকে ফোরাতের তীর পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথে কার্যতঃ কোন বাধা আছে বলে আপাতত প্রতীয়মান হচ্ছে না। যে কোন একটা অজুহাত সৃষ্টি করে যে কোন মুহূর্তে আর একটি আরব ইসরাঈল যুদ্ধের মাধ্যমে তারা তা করতে বেগ পাবে বলে মনে হচ্ছে না।

এটা সত্য যে আধ্যাত্মিক জগতের বিবেচনায় মানবতা আজ অতীতের মানবেতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সর্বাধিক ফিত্‌নায় জড়িত। এই ফিত্‌না কিংবা বিপর্যয়ের মাত্রা আরও শতগুণে বেড়ে যাবে যখন সত্যসত্যই ইসরাঈল কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের আসন দখল করবে। মোট কথা ইউরোপীয় জাগরণে যে স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন দর্শনের জন্ম নেয় সেই দর্শনেরই সামাজিকীকরণ ঘটে আমেরিকান নব্য বৈশ্বিক নিয়মে। এই নব্য বৈশ্বিক নিয়ম অচিরেই মানবেতিহাসের জঘন্যতম বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটাবে আর তার নেতৃত্ব দিবে ইসরাঈল।

দাজ্জাল সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর বাণীগুলো একত্রে পাঠ করলে এর সম্পর্কে মোহাম্মদ আসাদ[১], বায়জীদ খান পন্নী[২], ইমরান নযর হোসাইন[৩], আহ্‌মেদ থম্‌সন্[৪] এর ব্যাখ্যা পড়লে উপরোক্ত বিশ্লেষণের বৃটেনের নেতৃত্বের ঔপনিবেশিকতাবাদকে Phylosophical Dajjal (দার্শনিক পর্যায়ের দজ্জাল); আমেরিকার নেতৃত্বে নব্য

১. A way to Macca, মোহাম্মদ আসাদ, এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ হচ্ছে মক্কার পথে। অধ্যাপক শাহেদ আলী এর বঙ্গানুবাদ করেছেন।

২. দাজ্জাল, বাজিদ খান পন্নী। এটি বাজিদ খান পন্নীর সাড়া জাগানো গ্রন্থ।

৩. JERUSALEM IN THE QUR'AN IMRAN, N. HOSEIN, বইটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পথে। বঙ্গানুবাদ করেছেন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার জনাব এনামুল হক।

৪. Dajjal the Anti Christ, Ahmed Thomson, Ta-Ha Publishers Ltd. I Wynne Road, London, SWQOBB, United Kingdom.

বৈশ্বিক নিয়মের ঘটমান বর্তমানকে Sociological Dajjal (সামাজিক সাংস্কৃতিক দজ্জাল) এবং অত্যাসন্ন ইসরাঈল নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিতব্য চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিকে ব্যক্তি দাজ্জাল (Dajjal in Person) বলে চিহ্নিত করতে কষ্ট হয় না। ইউ. এস. ডলার এর বাম পার্শ্বের গোল বৃত্তে পিরামিডের চূড়ায় অবস্থিত আভাযুক্ত এক চক্ষুর ব্যাখ্যায় এ যাবৎ আমরা যা আলোচনা করলাম তাকে অনেকে "ধারণা কল্পনার সমাহার" বলতে চাইবেন। কিন্তু তিনিও ইউরোপীয় জাগরণ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, নব্য বৈশ্বিক নিয়ম এবং অত্যাসন্ন নিকট ভবিষ্যতের বিপর্যয়কর পরিস্থিতিকে একই সূত্রে গাঁথা একই মহা বিপর্যয়ের সূত্রপাত, বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির তিন স্তর বা পর্যায় বলতে দ্বিধাগ্রস্থ হবেন না। দাজ্জাল সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যৎ বাণীগুলো পড়লে দাজ্জালের জন্মকে ইউরোপীয় জাগরণ, দাজ্জালের কৈশোরকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদ, দাজ্জালের যৌবনকে বর্তমান ঘটমান নব্য বৈশ্বিক নিয়মের কর্তৃত্ব এবং দাজ্জালের পূর্ণতা প্রাপ্তিকে আসন্ন ইসরাঈল রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ঘটিতব্য চরম বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের স্থলে ইউরোপীয় ধর্মহীন রাষ্ট্র দর্শন মানবতাকে গায়রুল্লাহ্‌র কৃর্তৃত্বে আবদ্ধ করে। সর্ব প্রকার গায়রুল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব যখনই নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে তখনই তা "তাগুতে" পরিণত হয়। **সুতরাং বর্তমান সময়কার সর্ববৃহৎ তাগুত হলো নব্য বৈশ্বিক নিয়মের লাগাম হাতে ধরা আমেরিকা এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ স্থান দখল করবে ইসরাঈল**। দাজ্জালের কার্যকলাপ সূচিত হয় খৃষ্টীয় ষোল এবং সতর শতক ধরে। মুসলিম বিশ্বে এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু করে খৃষ্টীয় আঠার শতকে এবং এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সনের তুর্কী খিলাফাহ্‌ ধ্বংসের মাধ্যমে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত এবং নিকট ভবিষ্যতের কিছু সময় পর্যন্ত দাজ্জালের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুসলিম নামে পরিচিত জনবসতির ভাগ্য বিপর্যয়ে স্তরে স্তরে মন্দ থেকে মন্দতর পরিণতি ঘটছে এবং ঘটবে। **সুতরাং এখন "দাজ্জাল", "নব্য বৈশ্বিক নিয়ম" এবং "তাগুত" সমার্থক শব্দ এবং একই অপশক্তির তিন বিশেষ নাম**। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলুন কিংবা বাস্তবতা বলুন, যাই বলুন তুর্কী খিলাফাহ্‌ ধ্বংসের চক্রান্তে যেই সৌদী রাজ বংশ বৃটিশ রাজের বেতনভূক কর্মচারী হয়ে বৃটিশের সাথে তাদের নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত করে সে তারাই এখনও নযদ ও হেজাজে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখে নিজেদেরকে খাদেমুল হারামাইন নামে পরিচয় করিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের একনায়ক রাজতান্ত্রিক পরিবারগুলো বর্তমানে আমেরিকার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে

এতদঅঞ্চলে আমেরিকান স্বার্থের পাহারাদার হয়ে থাকছে। '৯১ এর সাদ্দাম আক্রান্ত কুয়েতকে ইস্যু করে তারা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) কর্তৃক ঘোষিত পৌত্তলিক ও ইয়াহুদী-নাসারামুক্ত দেশে আমেরিকানদের সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুসলিম বিশ্বের ঘরভেদী বিভীষণ এই অপশক্তি অচিরেই আসন্ন কর্তৃত্ববাদী ইসরাঈলের সাথে হাত মিলাবে।

ইউরোপীয় জাগরণ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয় ঔপনিবেশিকতাবাদ। তার ফলশ্রুতিতে বাকী বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের একেকটি অঞ্চল এই পাশ্চাত্যের পদানত হতে থাকে। এর সাথে চলতে থাকে ঔপনিবেশিক শোষণ এবং লুন্ঠন। এমনি করে শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সনে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের নাম মাত্র প্রতীক তুর্কী খিলাফাহ্‌ ধ্বংস হয়।

তুর্কী খিলাফাহ্‌ ধ্বংসের প্রেক্ষাপট সময়ে ১৯১৭ সালে ঘোষিত হয় কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা। এ সময়ে বৃটিশ জেনারেল অ্যালেনবাই জেরুজালেম দখল করেন। জেরুজালেম এর দখলের পর কোরআন বর্ণিত বরকতময় অঞ্চল একটি ম্যানডেট-এর মাধ্যমে বৃটিশদের দ্বারা শাসিত হয়। এরপর এই অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী জায়নবাদী ইয়াহুদীদের হাতে ন্যাস্ত হয়। ঐ সময় থেকে পাশ্চাত্যের শাসন কর্তৃত্বের নেতৃত্বে যারা এসেছেন তাদের এ অঞ্চল সম্পর্কিত বক্তব্য থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত তাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পর্যালোচনা করলে তাদের এই এক চোখা নীতির স্বরূপ বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না। আমরা এখানে প্রমাণস্বরূপ জন মেজর এর ১৯৯৩ সনের ২রা মে লিখিত পত্রটির একটি কপি সংযোজিত করে তার বঙ্গানুবাদ পেশ করলাম। ডলারের মধ্যে অঙ্কিত চিত্র কর্মের যে বাস্তব ভিত্তি আছে তার উদাহরণ পেশ করার জন্যই আমরা উপরোক্ত পত্র সংযোজিত করলাম। বস্‌নিয়াতে যখন মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যা-লুট-ধর্ষণ কর্ম চলছিল তখন ইউরোপীয়রা তাদের স্বগোত্রীয় স্ব-ধর্মীয় ভাইদের পক্ষে মুসলিমদের বিপক্ষে যে অবস্থান নিয়েছিল তার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রে। মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তাদের সামগ্রিক মানসিকতার একটা জ্বলন্ত চিত্র এখানে দেখা যাবে। জাতীয় স্বার্থের অন্ধত্বে তারা কতখানি নিচে নামতে পারে এবং সেই নির্লজ্জতা নিয়ে তারা কি পরিমাণ দর্প করতে পারে এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই সাথে এই নব্য বৈশ্বিক নিয়মই যে তাদের বর্তমান মূল নিয়ন্তা তাও এ পত্রের মাধ্যমেই বাস্তবভাবে প্রমাণিত।

10 DOWNING STREET
LONDON SW1A 2AA

THE PRIME MINISTER — 2 May 1993

Douglas Hogg
Foreign and Commonwealth
Office
London SW1A 2AH

Dear Douglas

Thank you for your indepth report on the current as well as past situation in the "Bosnia-Hercegovina" region of the former Yugoslavia.

As you are well aware from previous discussions, both within the "Cabinet" and at other times Her Majesty's Government has not changed its position on any of the following policies:

1) We do not agree now or in the future to 'arm or train' the Muslims within Bosnia-Hercegovina with military hardware.

2) We will continue to help impose and enforce the U.N. embargo on weapons to this region. While we are well aware that Greece, Russia and Bulgaria are supplying arms and training to Serbia and Germany, Austria, Slovinia and even the Vatican are doing similar efforts on behalf of the Croatian and H.V.O. forces within the region, it is of paramount importance that we make sure that no such efforts are successful on behalf of the Muslims within the region from Islamic States and Groups.

To this end and until the final outcome of the situation on the ground i.e. the dismemberment of Bosnia-Hercegovina and its destruction as a possible "ISLAMIC STATE" within Europe which will not be tolerated, we will continue to follow this policy. Further, the mistake of training and arming the Afghan fighters against the forces of the former USSR and their becoming so-called "Islamic Fighters" now in other parts of the world, as in Bosnia-Hercegovina, will not be repeated with the Muslim population in Bosnia-Hercegovina. This could lead to serious problems in the future within the emigre Muslim population within the E.C., and North America. Please see attached paper from the United states entitled: "Iran's European Springboard?" Dated September 1 1992. Within reason these criteria are becoming more and more relevant, therefore, special attention by our internal security services should be placed on the Muslim Communities within the Western States, especially here in the U.K.,

3) Until the situation in the former Yugoslavia is settled we must at all costs make sure that no state that can be deemed "Muslim" is allowed any say on the West's policy actions in this area, especially that of Turkey. It is therefore, necessary to continue with the sham of the "Vance-Owen" peace talks in order to delay any such possible action until Bosnia-Hercegovina no longer exists as a viable state and its Muslim population is totally displaced from its land.

Whilst this may seem a hard policy I must insist with you and the policy makers within the F.C.O., and the Armed Services that this is infact "real-politic" and in the best interests of a stable Europe in the future, whose value system is and must remain based on a "Christian-Civilisation" and ethic. This view I must inform you is also felt in every other European and North American government, therefore, we will not intervene in this region to save the Muslim population or push to lift the arms embargo on them. The Muslims in the West must be made to see that they can not oppose our view of the world in the "NEW World Order" and that by the inaction of the "So-called" Muslim governments of the world, in doing nothing to oppose the destruction of the Muslims of Bosnia-Hercegovina and not follow through on their pledges to do something by the 15.1.93 at the OIC Conference, if the West did not rescue the Muslims, they are totally powerless to oppose us, as we control their governments.

Whilst I know you do not feel fully as I or the Minister for Defence feel on this subject, it is important that we all show a united front to those in Parliament and the country on this matter, especially after the "forceful" attack on this policy by the former Prime Minister.

I expect all those that serve this government to obey "Cabinet Responsibility!"

Yours sincerely
John M.

১০, ডাউনিং স্ট্রীট
লন্ডন, SWIA ZAH   ২রা মে, ১৯৯৩

প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে
বৈদেশিক এবং কমনওয়েলথ
অফিস, লন্ডন, SWIA ZAH
ডগলাস্ হগকে।

সুপ্রিয় ডগ্লাস্,
তোমার চলমান এবং বিগত সময়ের বস্নিয়া হার্জেগোভিনা সম্পর্কিত বিশদ রিপোর্টের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের পূর্ব আলোচনা যা ক্যাবিনেটে এবং অন্যত্র সংঘটিত হয়েছে যার সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত আছ তার জের ধরে বলছি নিম্নের কোন নীতিমালা থেকেই মহামান্য বৃটিশ সরকার তার অবস্থানকে পরিবর্তন করবে না।

১. বস্নিয়ার মুসলমানদেরকে এখন কিংবা ভবিষ্যতে সমরাস্ত্র দিয়ে অস্ত্রসজ্জিত কিংবা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে বৃটেন কখনই রাজী হবে না।

২. বৃটেন সেই অঞ্চলে জাতিসংঘের অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা আরোপও কার্যকর করতে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবে। যদিও আমরা বৃটিশরা জানি যে গ্রীস, রাশিয়া ও বুলগেরিয়া সার্বীয়দেরকে অস্ত্র ও ট্রেনিং দিচ্ছে; জার্মানী, অস্ট্রিয়া, শ্লোভানিয়াও এমনকি ভ্যাটিকানও সে অঞ্চলে ক্রোশিয়া ও বস্নিয়ার ক্রোটবাহিনীকে অনুরূপ সাহায্য দিচ্ছে, এ সত্ত্বেও বৃটেনকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে কোন ইসলামি দেশ কিংবা গ্রুপ বস্নিয়ার মুসলমানদেরকে এ ধরনের সাহায্য প্রদানের প্রচেষ্টায় সফল না হয়। এটা পশ্চিমাদের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এ নীতির প্রতি যত্নবান থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ইউরোপের বুকে মুসলিম রাষ্ট্র (যা কখনই সহ্য করা হবে না) সম্পূর্ণ ধূলিস্যাৎ হয় এবং বর্তমান পরিস্থিতির পরিণতিতে বস্নিয়া হার্জেগোভিনা যেন সম্ভাব্য ইসলামি দেশে পরিণত না হয়।

সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের ট্রেনিং প্রদান ও অস্ত্র সজ্জিত করা ভুল হয়েছে। এর ফলে সেখানে ইসলামি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে

উঠছে। বস্নিয়া হারজেগোভিনার মুসলিম জনগোষ্ঠির ব্যাপারে সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা যায় না। এই ভুল করা হলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও উত্তর আমেরিকায় বহিরাগত মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে ভবিষ্যতে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সব সম্ভাবনা ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে দেখা দেয়ার আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা নিরাপত্তা সার্ভিসের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে এ পত্রের সাথে সংযোজিত হয়েছে ১৯৯২ সনের পহেলা সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা কাগজপত্র যার শিরোনাম হলো, "IRAN'S EUROPEAN SPRING BOARD" যা আমাদের বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করে।

৩. টেকসই রাষ্ট্র হিসাবে বস্নিয়া হারজেগোভিনার অস্তিত্ব লোপ না পাওয়া পর্যন্ত এবং তার মুসলিম জনগোষ্ঠিকে সম্পূর্ণ উৎখাত না করা পর্যন্ত ভ্যান্সওয়েন শান্তি আলোচনার অভিনয় চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তুর্কীসহ কোন মুসলিম রাষ্ট্রেরই এতদঞ্চলে পাশ্চাত্যের কার্যনীতি কৌশলের উপর কোন বক্তব্য কখনই গ্রাহ্য হবে না যতক্ষণ না যুগোস্লাভিয়ার বর্তমান অবস্থা স্থিতি লাভ করে। এই নীতি শুনতে কঠোর শোনালেও আমি বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অনুধাবন করতে চাপ দিব যে, এই নীতিই হচ্ছে সত্যিকারের নীতি এবং ভবিষ্যতের স্থিতিশীল ইউরোপের স্বার্থে এই নীতি অপরিহার্য। ভবিষ্যত ইউরোপের মূল্যমান পদ্ধতিকে অবশ্যই হতে হবে খৃষ্টান সভ্যতা-ভিত্তিক এবং নৈতিকতা ভিত্তিক। আমি অবশ্যই স্মরণ করাব যে এ নীতিই প্রতিটিই ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকান দেশের সরকারের নীতি। সুতরাং এই অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর থেকে জাতিসংঘের আরোপিত অস্ত্রসংবরণ নীতি রহিত করার জন্য কোন পদক্ষেপই আমরা গ্রহণ করবো না। **পাশ্চাত্যের মুসলিমদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে দিতে হবে যে, "নব্য বিশ্ব ব্যবস্থায়" তারা বিশ্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের** মতামতের **বিরোধিতা করতে পারে না**। তাদেরকে আরো অনুধাবন করতে দিতে হবে যে, বসনিয়া হারজেগোভিনায় মুসলিমদের ধ্বংস করবার প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় বিশ্বের তথাকথিত মুসলিম সরকারগুলো নিষ্ক্রীয় রয়েছে এবং ১৫-১-৯৩ ও আই সি সম্মেলন নাগাদ একটা কিছু করার তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমের মুসলিমদের আরো বুঝতে হবে যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যদি মুসলিমদের রক্ষা না করে তাহলে ইসলামি দেশগুলো কিছুই করতে পারে না। **কারণ আমরাই তাদের সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণ করি**। যদিও আমি এবং

প্রতিরক্ষামন্ত্রী যে মত পোষণ করি তুমি তা কর না তথাপি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে হবে পার্লামেন্টে, বিশেষ করে যেখানে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে শক্তিশালী ভিন্নমত উপস্থাপন করে। আমি আশা করি, যারাই দেশকে সেবা করে তারা ক্যাবিনেট অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

ইতি–

তোমাদের

জন মেজর

জবরদখলকৃত কোম্পানীর দায়িত্বশীল ঃ একটি উপমা

বিদেশে অবস্থানরত বিশাল কোম্পানীর এক বিরাট **প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত** এদেশীয় একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির সমস্যা নিয়েই শুরু করছি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাড়ি-গাড়িসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা কোম্পানী করেছে এবং প্রকল্পের আয় থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট বেতন-ভাতার অনুমোদনও ঐ কোম্পানী দিয়েছে। কোথায় প্রকল্পের কি কাজ কিভাবে করতে হবে তাও তাকে জানানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাকে একটা **গাইড বইও** দেয়া হয়েছে। প্রকল্প অফিসে কোম্পানীর **মূল মালিকের একটি কক্ষ সংরক্ষিত** রয়েছে।

প্রকল্পের কাজ যথারীতি চলাকালীন সময়ে এদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথেষ্ট স্বাধীনতার সাথে সততা ও যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে কাজ করে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় বিদেশে অবস্থানরত কোম্পানীর বিশেষ বন্ধু পরিচয়ে একজন লোক এদেশীয় প্রজেক্ট অফিসে উপস্থিত। লোকটি এসেই ঐ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে আলাপ করে **কোম্পানীর জন্য সংরক্ষিত কক্ষ খুলে বসার সুযোগ করে নেয়।** দিন যায়, যথারীতি কাজ চলছে।

এদিকে বিদেশে অবস্থানরত কোম্পানীর মূল মালিকের সাথে এদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ থাকে যে, ঐ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ দেশের ভিসা নিয়ে সশরীরে গেলেই তার সাথে সাক্ষাৎ করে যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করতে পারবে, কিংবা কোম্পানীর মূল মালিক যদি নিজ থেকে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন তা হলেই তা পুনরুদ্ধার হবে। **ভিসা পাওয়া কিংবা কোম্পানীর মালিকের নিজ থেকে সরাসরি যোগাযোগ কখন হবে তা অনিশ্চিত**, তাই এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনির্দিষ্টকালের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্নই রয়ে যায়।

ইতোমধ্যে ঘটে যায় মহাবিপত্তি। **কোম্পানীর বন্ধু পরিচয়ে আসা লোকটিই একজন প্রতারক ও সন্ত্রাসী এবং সে নিজেকে প্রজেক্টের মূল মালিক বলে দাবী করে বসে।** প্রজেক্টের অন্য কর্মচারীরা মূল মালিককে কখনও দেখেনি, তাই তারা এ ব্যাপারে অন্ধ। **এমতাবস্থায় এ যে মূল মালিক নয় বরং প্রতারক তা**

কেবল ঐ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। প্রতারক লোকটি ছলে-বলে-কৌশলে অফিসে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানীর নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করে দেয় এবং এদেশীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁর সাথে সহযোগিতার আহ্বান জানায় কিংবা কমের পক্ষে চুপ থাকার পরামর্শ দেয়। এছাড়া সে তাকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দেয়। আরও বলে যদি অসহযোগিতা করে কিংবা তার ইচ্ছার বিপক্ষে যায় তা হলে তার (ঐ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির) জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান সব লুটে নেবে এবং দুর্বিষহ যাতনায় তাকে নিক্ষেপ করবে।

এমতাবস্থায় এই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিম্নোক্ত কোন কাজটি অবশ্যই করণীয় কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে ঃ

ক. চিনেও না চেনার ভান করা ঃ যেহেতু মূল মালিকের সাথে সহসা যোগাযোগ অসম্ভব, যেহেতু সে ছল-চাতুরী ও দুষ্কৃতির মোকাবেলায় নিজকে দুর্বল কিংবা অক্ষম ভাবছে, তাই সে নিজে প্রতারককে চিনেও না চেনার ভান করে পূর্ববৎ নিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া এবং তার দৈনন্দিন দায়িত্বগুলো পালন করে যাওয়াকে তার কর্তব্য স্থির করে এবং ঐ প্রতারকের সাথে যাতে কোন দ্বন্দ্ব না হয় সে রূপ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং এই অপেক্ষায় থাকে যে, মূল মালিক স্বয়ং আসলে কিংবা কোন প্রতিনিধি পাঠালে তার সাথে পরামর্শ করে এই প্রতারকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। প্রতারকের সাথে দ্বন্দ্ব হবে না– এ জাতীয় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ভুয়া মালিকের নির্দেশ মত চালাতে থাকে। এতে সাধারণ কর্মচারীরা আরও ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়।

খ. বিশ্বাসঘাতকতা ঃ যেহেতু মূল মালিককে কেবলমাত্র সেই **(এই দেশীয় দায়িত্বশীলই)** চেনে, অন্যেরা চেনেনা এবং এরূপ অবস্থায় **মূল মালিকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে** প্রতারকের সাথে হাত মেলালে অন্যরা বুঝতে পারবে না; উপরন্তু আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার আশ্বাস রয়েছে। তাই **বিশ্বাসঘাতকতার** পথকেই শ্রেয় বলে নির্ধারণ করা।

গ. পলায়নী মনোবৃত্তি ঃ বিশ্বাসঘাতকতা করা খুব অন্যায় বোধ হওয়ায়, প্রতিরোধ সংগ্রামে নিজের সমূহ বিপদ মনে করায় আত্মগোপন করে প্রজেক্ট অফিস যাওয়া বন্ধ করা এবং **ভবিষ্যতে মূল মালিকের সাক্ষাতের আশায়** দিন গোনা।

ঘ. চিনেও না চিনার ভান করার সাথে খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করা ঃ পলায়নকে দুর্বলতা মনে করে, বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণা করে, নিশ্চুপ কাজ করে যাওয়াকে এই বলে যুক্তিযুক্ত মনে করা যে, প্রতিরোধ সংগ্রামে গেলে তার নিজের জীবন তো বিপন্ন হবেই, সাথে সাথে অন্যান্য নিরীহ কর্মচারীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঙ. প্রতারককে উৎখাত করা ঃ নিজের যতই কষ্ট হোক, জান-মাল-ইজ্জতের যতই ক্ষতি হোক কোন কিছুর পরওয়া না করে প্রতারকের পরিচয় অন্যদের কাছে তুলে ধরে, অন্য কর্মচারীদের সংগঠিত করে প্রতারক **ভুয়া মালিককে অপসারণের সর্বাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করা।**

একটু পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে

ক. মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ও দুনিয়ার যাবতীয় নীতি ও নৈতিকতাই এই শেষোক্ত কর্মপন্থাকে সর্বাধিক প্রশংসা করবে এবং এর পক্ষে মত পেশ করবে। এমন কি এ পথে **এ দায়িত্বশীল ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম, মানহানি কিংবা প্রাণ-বিয়োগ সব কিছুকেই গৌরবের মনে করবে।** কেবলমাত্র খল চরিত্রের অধিকারী, স্বার্থান্বেষী কিংবা বিশ্বাসঘাতক কিংবা দ্বিমুখী স্বভাবের লোকেরা কিংবা নির্বোধেরা এর নিন্দা গাইবে। ভুয়া মালিক এবং তার দালালরা একে নিশ্চিহ্ন করার সব কলা-কৌশল প্রয়োগের অপপ্রয়াস চালাতে কখনই ভুল করবে না। পক্ষান্তরে মূল মালিক ঘটনা জানার পর তাকে সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করবে।

খ. মৌলিক-মানবীয় গুণাবলীর ঘাটতিসম্পন্ন দুর্বলচেতা নিরীহ গো-বেচারা ভদ্রলোক প্রতারককে চিনেও না চেনার ভান করে নিজকে ধোঁকায় ফেলবে। প্রকৃত মালিকের কঠোর জবাবদিহির কাছে তার কর্মপ্রচেষ্টা কোন প্রশংসারই দাবী রাখবে না বরং ঐ কর্মপদ্ধতিতে যদি এ দায়িত্বশীল নিজে সন্তুষ্ট থেকে নির্লিপ্ত সময় ব্যয় করে থাকে এবং নিজের কোন ক্ষতি না হওয়াকেই নিজের জন্য মঙ্গলজনক বলে প্রতিভাত করে থাকে, তবে মূল মালিক অবশ্যই তাকে শাস্তি দেবেন।

গ. বিশ্বাসঘাকতার রাস্তা গ্রহণকারী নির্ঘাত বিশ্বাসঘাতকরূপে পরিগণিত হবে এবং মূল মালিকের রোষানলে অবশ্যই পড়বে। ভুয়া মালিক তাকে প্রশংসা করবে, তার সর্বপ্রকার উপকার করবে। খল চরিত্রের দ্বিমুখী লোকেরা তাকে বাহবা দেবে এবং তাকে দিয়ে ফায়দা লুটতে চাইবে। প্রকৃত বিবেকবান নীতি-নৈতিকতার

অধিকারীগণ সর্বদাই এ পন্থাকে ঘৃণা করবে। প্রজেক্টের কর্মরতদের মধ্যে ভালরা বঞ্চিত হবে, খারাপরা পুরস্কৃত হবে। অনাচার-অন্যায় অপ্রতিহত গতিতে চলবে।

ঘ. ভীরু–কাপুরুষরাই পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করবে, বাস্তবে তাদের এ কাজ বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল বয়ে আনবে। মূল মালিকের শাস্তি তার জন্যও অবধারিত হবে। দুনিয়ার কোন বিবেকবানই তাদের প্রশংসা করবে না। ভুয়া মালিকের পোয়া বার হবে। প্রজেক্টের সর্বস্তরে অন্যায়-বিশৃঙ্খলা শুরু হবে।

ঙ. নিজের আপাতঃ সমূহ ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষ্যেই বাস্তব-বিবেকবানদের সমালোচনা-তিরস্কারকে সাময়িক ধোঁকায় ফেলার জন্যই না চেনার ভান করার খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শনকারী এ পদ্ধতি গ্রহণ করে। এরা নিজেদেরকে চালাক ভাবে। কিন্তু প্রকৃত মালিক কখনই তার এ কর্মপদ্ধতিকে অনুমোদন দেবে না; বরং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবেই। ভুয়া মালিক তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকবে। অপরাপর কর্মচারীরা জুলুমের শিকার হবে।

উপরোক্ত ঘটনা বাস্তব অবস্থার রূপক মাত্র। আমরা সবাই এর সাথে জড়িত। **বিশেষভাবে যাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে অনুধাবন করেছেন, তাঁরা সবাই উপরোক্ত কোম্পানীর এদেশী প্রজেক্টের দায়িত্বশীল এম.ডি.। একটু খোলাসা করছি।**

বিদেশ = পর্দার আড়ালে। কিংবা মৃত্যু যবনিকার ওপারে।

বিশাল কোম্পানী = স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা।

গাইড বই = কোরআন।

ভিসা = মৃত্যু।

দায়িত্ব = খেলাফত (এম.ডি.পদ)।

ভুয়া মালিক = তাগুত।

দায়িত্বশীল = কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী।

সাধারণ কর্মচারী = উম্মি জনসাধারণ– যাদের কোরআন-সুন্নাহ্‌র প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই।

দায়িত্বশীলের বাড়ি-গাড়ি = কোরআন ও সুন্নাহ্ অনুধাবনকারীর বিবেক-বুদ্ধি, হাত-পা, শারীরিক সুস্থতা।

দায়িত্বশীল-এর বেতন = এ জগতে কর্মের প্রতিকূলে প্রাপ্ত জীবন-জীবিকা।

মূল মালিকের সংরক্ষিত কক্ষ = সার্বভৌমত্ব, যার চূড়ান্ত মালিক একমাত্র আল্লাহ।

মূল মালিকের বিশেষ বন্ধুর ভুয়া পরিচয় = কোরআন-সুন্নাহ্ জানা লোকদের অসতর্কতায়, অসাবধানতায় ভুয়া মালিকের তথা তাগুতের অবস্থান দখল।

সাময়িক যেগাযোগ বিচ্ছিন্নতা = নবুওয়্যাতের দরজা বন্ধ থাকা।

ভিসা নিয়ে দায়িত্বশীলের সশরীরে যাওয়া = কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারীর মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের ঘটনা।

কোম্পানীর প্রতিনিধি = ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

মহাবিপত্তি = ভুয়া প্রতারকের (তাগুতের) সার্বভৌম ক্ষমতার ঘোষণা এবং কোম্পানীর আইন পরিবর্তন।

কর্মচারীদের অন্ধত্ব = সাধারণ জনতা এবং ইংরেজি শিক্ষিতদের কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞতা।

নিশ্চিহ্ন করার কলা-কৌশল চালাতে কখনই ভুল করবে না = তাগুতবিরোধী খাঁটি তওহীদের আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে তাগুত কখনই পিছপা হয় না।

প্রতারক ভুয়া মালিককে কেবল এ দেশীয় দায়িত্বশীল চেনার কারণ হল কেবল এই দায়িত্বশীলই কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে অনুধাবন করেছে। সুতরাং তাঁর বা তাঁদেরই মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে ভুয়া মালিকের প্রতারণাকে তুলে ধরার। অন্য উম্মিদের দায়িত্ব এখানে গৌণ। তারা কেবল মৌলিক দায়িত্বশীলের অনুসারী হতে পারে।

ভুয়া মালিকের ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতা দখল-তাগুতদের **উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা দখল কিংবা বাদশাহী, অভ্যুত্থান বা ক্যু, সামরিক শাসন, গণতান্ত্রিক আরোহণ ইত্যাদি।**

প্রতারকের সাথে দ্বন্দ্ব না করার পন্থা = সরাসরি ইসলামি আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করা অথবা কোন ইসলামী সংগঠনের এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করা যাতে প্রতিষ্ঠিত তাগুতী শক্তির সাথে কোন বিরোধ না বাধে।

মূল মালিকের প্রতিনিধির অপেক্ষা = ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর অপেক্ষা।

প্রতারকের সাথে হাত মেলানো = তাগুতের সাথে হাত মেলানো, তাগুতের দেয়া

পদ-পদবী গ্রহণ করা, তাগুতের দেয়া কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা, তাগুতের প্রশংসা করা, তাগুতকে সময়ে-অসময়ে অভিনন্দন জানানো, তাদের মজলিসে যাওয়া।

অফিসে যাওয়া-আসা বন্ধ করা = কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারীর সমাজ-সংসার ছেড়ে গহীন বনে সন্ন্যাসব্রত পালনে যাওয়া।

ভবিষ্যতের মূল মালিকের সাক্ষাতের আশা = মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা।

অন্য নিরীহ কর্মচারীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যুক্তি = সমাজে ইসলামি আন্দোলনের প্রভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে তাগুত যে দমন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেয়, তার থেকে বেঁচে থাকার খোঁড়া যুক্তি।

মূল মালিকের কাছে প্রিয় ব্যক্তিরূপে সাব্যস্ত হওয়া = আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করা।

এবার উপরোক্ত ঘটনাকে আবার একবার পড়লে, কিয়ৎকাল চিন্তা করলে প্রত্যেক কোরআন-সুন্নাহ্র অনুধাবনকারীই দিবালোকের মত নিচের সত্যগুলো বুঝতে সক্ষম হবেন ঃ

১. যেহেতু আল্লাহ্র দাসত্বে অন্য কারও কোন অধিকার নেই, যেহেতু আল্লাহ্র দাসত্ব বান্দাহর সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত, যেহেতু বান্দাহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য এবং অপর যে কোন غَيْرُ اللهِ -র ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে সে আদিষ্ট, তাই প্রতিটি কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী ব্যক্তিই বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বশীলদের মনগড়া নিয়ম-নীতি অস্বীকার তথা তাদের ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে তাগুত বলে চিহ্নিত করতে বাধ্য।

২. আল্লাহ্ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -(আমি কারও প্রতিই তার ক্ষমতার অধিক দায়িত্ব চাপাই না।)

অপর কথায় আল্লাহ বলেন, আমি বান্দাহ্র উপর তার ক্ষমতা অনুযায়ীই দায়িত্ব চাপাই।

সুতরাং কোরআন-সুন্নাহ্কে যিনি অনুধাবন করেছেন তিনি **তাগুতকে যথাযথই চিনেছেন**। তিনি যেহেতু **তাগুতকে চিনেছেন**, তাঁরই দায়িত্ব তাগুতকে চিহ্নিত করা এবং **তাগুতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ** গড়ে তুলে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করা।

৩. **তাগুতকে অস্বীকার** করার জন্য যেহেতু তিনি আদিষ্ট এবং **তাগুতকে অস্বীকার করার** পরই যেহেতু আল্লাহ্তে ঈমান আনার কথা ঘোষিত হয়েছে, তাই তাঁর যথাযথ ঈমানদার হওয়ার প্রমাণার্থেই তাকে **তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা** দিতে হবে এবং **তাগুত উৎখাতের আন্দোলনে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে**।

৪. **যেহেতু তিনি আল্লাহ্র বান্দাহ, আল্লাহর খলিফা, সুতরাং তার দায়িত্ব আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ প্রতিটি শক্তিকে তার চরম শত্রু জ্ঞান করে তাদের ধ্বংসের সকল চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত থাকা** এবং একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অপরাপর সব মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ তথা ইকামতে দ্বীনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে পর্যন্ত তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ না করেছেন, সে পর্যন্ত তিনি দুনিয়া-আখেরাতের সমূহ ক্ষতির ঝুঁকি বহন করছেন।

৫. প্রতিটি কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী ব্যক্তিই অনুভব করবেন এ কাজের দায়িত্ব তার উপর এবং তিনি এক্ষেত্রে যোগ্য। যদিও তিনি নানা প্রকার বাহ্যিক ওজর-আপত্তি পেশ করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۱

আর একথা নিশ্চিত দুনিয়ার জীবনে এসব ওজর-আপত্তি সাময়িকভাবে নিজকে ধোঁকায় ফেলবে, অন্যদের কাছে তাঁর আচরণকে নির্দোষ দেখাবে, কিন্তু পরকালে আল্লাহ পাকের কঠোর পাকড়াও-এর সামনে এসব কোন কাজেই আসবে না।

৬. উপরোক্ত রূপক আলোচনায় এদেশীয় দায়িত্বশীল (তথা কোরআন-সুন্নাহ অনুধাবনকারী)-এর চিনেও না চেনার আচরণের কারণ ঃ

এক. সৎ সাহসের অভাব তা আবার নিম্নোক্ত বিষয়ের অভাবের সাথে জড়িত–
ক. ইস্তেকামাত, খ. সবর, গ. আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল।

দুই. দুনিয়ার জীবনকে ঝামেলামুক্ত রাখা -

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

১. সূরা আল ক্বিয়ামা, আয়াত নং ১৪।

তারা বন্ধুর গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করে নি।[২]

তিন. দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে অগ্রাধিকার দেয়া–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلُّ خَطِيَّةٌ

দুনিয়ার প্রতি মহব্বতই সকল ক্ষতির কারণ।

اِنْ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلٰى الْاِيْمَانِ

তবে কি কুফরকে ঈমানের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে?[৩]

চার. আল্লাহ্‌র আজাবের চাইতে বান্দাহ্‌র আজাবকে অধিক গুরুত্ব দেয়া–

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ

মানুষকে ভয় করে যেমন নাকি আল্লাহকে ভয় করে।[৪]

পাঁচ. ঈমানের শর্ত পূরণ না করলে নামায-রোযা-তস্‌বীহ-তাহলীল, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাকার ইবাদত যে আল্লাহর দরবারে অগ্রহণযোগ্য তা বুঝতে অপরাগতা। لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ অর্থাৎ, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সমগ্র আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقٰى অর্থাৎ, যে তাগুতকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে–ই দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে।

সলাত সিয়াম হজ্জ জাকাতের অভ্যাস, তসবীহ তাহ্‌লীলের মত্ততার ন্যায় নেক আমল তাদের মনে এক ধরনের ভুয়া আশার সঞ্চার করে এবং শয়তান ঐ আশাকে আরও চাকচিক্যময় করে দেয়। فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ তাই আল্লাহ্ বলেন, فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং তোমরা আল্লাহর সম্পর্কেও যেন ধোঁকায় পতিত না হও।

২. সূরাতুল বালাদ, আয়াত নং ১১।
৩. সূরা তাওবা, আয়াত নং ২৩।
৪. সূরাতুন নীসা, আয়াত নং ৭৭।

যারা বলে ইসলামে রাজনীতি নেই, কিংবা যারা রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনার পরিমণ্ডলে দ্বীনের চর্চাকে নাযায়েজ মনে করেন, যারা বিশ্ব তাগুত আমেরিকা এবং তার দোসরদের কর্মকান্ডকে দ্বীনের আলোকে ব্যাখ্যা থেকে জেনে বুঝে বিরত থাকছেন তারা এ দলে অবস্থান করছেন। তাঁদের এ জাতীয় আচরণের ফলে সমাজের সাধারণ লোক দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমান্বয়ে গোমরাহীর অতলে ডুবে যায় এবং তৃগুতরা নিশ্চিন্তে আল্লাহর বান্দাহদের উপর তাদের অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানোর সুযোগ পায় আর এ কারণেই তাগুত মাঝে-মধ্যে এদের কোন কোন আপাতঃ দ্বীনি কাজে সহায়তার হাত প্রসারিত করে। আর একটু লক্ষ্য করলেই এ জাতীয় আচরণ গ্রহণকারী কোরআন-সুন্নাহ্‌র অনুধাবনকারীকে আপনি দেখতে পাবেন।

৭. বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ গ্রহণকারীরা সর্বাধিক জঘন্য এবং ঘৃণার পাত্র। এরাই ইসলামের ঘরভেদী বিভীষণ। এদের উপস্থিতি অতীত ইতিহাসে যেমন ছিল, এখনও তেমনিই আছে। এদের স্বরূপ চিত্রায়িত হয়েছে কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং অজস্র হাদিসে। সাধারণ লোকেরা এদের কারণেই সর্বাধিক ধোঁকায় নিপতিত হয়। এদের বেশির ভাগের উপরই خَتَمَ اللّٰهُ আয়াত কার্যকর হয়। এদের পরিত্রাণের কোন আশাই তেমন বাকী থাকে না। যেসব ইসলামি ব্যক্তিত্ব কিংবা দল কেবলমাত্র দুনিয়াবি ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও অর্থবিত্তের লোভে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে যোগ দিচ্ছেন তারা এ বিশ্বাসঘাতকদের দলের লোক। এরা তাগুতকে পরামর্শ দেয়, তাগুতের মজলিসে যায়, তাগুতের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। তাগুতকে কারণে-অকারণে প্রশংসা করে। **এদের সংখ্যা বেশি না হলেও এদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেশি। এদের সলাত -সিয়াম-হজ্ব-যাকাত-তসবীহ-তাহলীল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যয় হয়। জনগণ তাদের তাগুতপ্রীতিকে তাগুতের জায়েয হওয়ার সনদ মনে করে। সুতরাং তাদের ঐ বিশেষ দ্বীনদারী তাগুতের সবচাইতে বড় খেদমতে লেগে যায়।** যেহেতু তাগুত এদের বন্ধু, পরস্পর-পরস্পরের সহায়ক, তাই এদের অর্থবল, লোকবলের কোন অভাবই হয় না। এরা প্রয়োজনে **মসজিদ-মাদ্রাসা এমনকি ইসলামের নাম জুড়ে দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও ঘুষ হিসেবে নেয়।** এরা প্রকৃত দ্বীনদারকে ধোঁকা দেবার জন্য অজুহাত পেশ করে বলে, জঘন্য তাগুতের ঘৃণ্য কীর্তি থেকে দ্বীনের বিষয়কে হেফাজত করার জন্যই আমরা এদের সহযোগিতা করছি।

৮. পলায়নী প্রক্রিয়ার আচরণকারীদের অনেকে জায়েয প্রমাণ করার জন্য হয়ত পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত গুহাবাসীদের কথা উল্লেখ করবেন। আসলে এই আচরণ যুক্তির দিক থেকে যেমন প্রত্যাখ্যাত, ন্যায়-নীতির দিক থেকে তেমনি পরিত্যাজ্য। সর্বোপরি পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত গুহাবাসীদের আচরণ থেকে সন্ন্যাসব্রত প্রমাণ করার কোন সুযোগই নেই; বরং প্রমাণিত হবে তাঁরা অর্থাৎ ঐ গুহাবাসীরা তৎকালীন তাগুতের বিরোধিতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করায় তৎকালীন তাগুত তাঁদের পাথর ছুঁড়ে হত্যার হুমকি দেয় এবং তাঁরা আল্লাহর রহমতের জন্য দোয়া-মোনাজাত করে গুহায় আশ্রয় নেন। অর্থাৎ তৎকালীন তাগুতী ব্যবস্থার সমাজ থেকে তাঁরা তাঁদের নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। আর সন্ন্যাসব্রতকে কোরআন অন্যত্র সমালোচনা করেছে এবং রাসূল (স.) বলেছেন, لَارُهْبَنِيَّةَ فِىْ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসব্রত নেই। দ্বীনের যথাযথ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা বর্তমান তাগুতকে চিহ্নিত না করে থাকছেন, অথচ নিজেরা ব্যক্তি জীবনে পরিচ্ছন্ন ও নির্লোভ জীবন যাপন করছেন তারা এই দলে আছেন।

বস্তুত এ ধরনের আচরণে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব পরিত্যাজ্য হয়। আল্লাহ্‌র শত্রু তাগুত শয়তানের পথ কাঁটামুক্ত হয়। সমাজের সৎ জীবনাকাঙ্ক্ষীদের মনে হতাশার সঞ্চার হয়। এরা যদিও বিশ্বাসঘাতকরূপে আল্লাহর দরবারে চিহ্নিত হবেন না, কর্তব্যে অবহেলার জন্য অবশ্যই দায়ী হবেন। তাগুতকে চ্যালেঞ্জ করার পর তাগুত যদি তাদেরকে নির্বাসনে পাঠায় কিংবা সমাজের তাগুতকে চিহ্নিত করার পর পুরা সমাজ যদি তাদের প্রতি বৈরী আচরণ করে সে অবস্থায় কেবল তাঁদের **উপরোক্ত আচরণ বৈধ হতে পারে এবং হিজরত হিসেবে গণ্য হতে পারে।**

৯. খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শনকারীরা প্রথম দলের ন্যায়। পার্থক্য হল, প্রথম দল তাদের অপারগতা ঢাকার জন্য কোন খোঁড়া যুক্তি পেশ করে না, এরা তা-ই করে। এদের যুক্তির ভাণ্ডারে প্রচুর তাক-লাগানো কথা আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরা সত্যের সাক্ষ্য গোপন তথা "কিত্‌মানে শাহাদাত"[৫]–এর ন্যায় বিষয়কে নানাবিধ ছলচাতুরিপূর্ণ যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়। এরা প্রথম দলের চাইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এ কারণে যে, তাদের প্রদত্ত খোঁড়া যুক্তি অনেক সরলপ্রাণ সাধারণ লোক (যাদের

৫. ক্বিতমান শব্দের অর্থ লুকান। কোন কিছুকে গোপন করা অর্থে ব্যবহার হয়।

কোরআন-সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান নেই)–এর "মহাযুক্তি" হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা প্রকৃত তৌহিদের আন্দোলন এবং এই নকল আচরণ-এর পার্থক্য বুঝতে অপারগ হয় এবং ক্রমান্বয়ে আরও গোমরাহীর মধ্যে ডুবে যায়।

"সর্বনাশ! অমুক কাজ করা যাবে না, অমুকের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, অমুক কথা বলা যাবে না, অমুক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা যাবে না তা-হলে তামাম দুনিয়ার বাতিল শক্তি, এ দেশীয় চ্যালা-চামুন্ডা সবাই মিলে এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যে, নিঃশ্বাস নেয়া দায় হবে ...." ইত্যাকার জুজুবুড়ীর ভয় দেখাতে এরা ওস্তাদ। এরা ভুলে যান, আল্লাহ্ সবার উপরে ক্ষমতাবান এবং সব বিষয়ের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন।

এদেরই অনেক তাগুতী সমাজের সব সুযোগ-সুবিধা সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করেন, কিছুটা রাখঢাক করে হারাম আয়-উন্নতির সাথে সমঝোতাকারীদের নিয়ে তথাকথিত আত্মার উন্নতি সাধনে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল খোলেন। অথচ ভুলে যান যে, তাগুতের অনুসরণ করে হারামের সাথে আপোষ করে আত্মার উন্নতি তো দূরে থাকুক সাধারণ ঈমানদার হিসেবে টিকে থাকাও সম্ভব নয়।

ঈমানের রাস্তায় প্রথম সোপান যেখানে তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং সব প্রকার শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়া, সে অবস্থায় এদেরকে তাগুতের চিহ্নিতকরণে কিংবা তাগুতের উৎখাতে আহ্বান করলে তখনই এরা এটাকে **"দুনিয়াবী ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা"** বলে পাস কাটিয়ে যায়। অনেক সময় তাগুত এদেরই অশিক্ষিত অন্ধভক্ত মুরিদদের মাধ্যমে সামান্য ভেট উপঢৌকন দিয়ে দেয়, **যাতে প্রকৃত তৌহিদী আন্দোলনকে মসিলিপ্তকরণের কাজে এরা বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।**

১০. দুনিয়ার স্বাভাবিক কোন কোম্পানীর এ জাতীয় দায়িত্বশীল এক্ষেত্রে তার জন্য সর্বাধিক সম্মানের, বিবেকসম্মত ও যুক্তিসম্মত বলে যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে তা হল, সে এই প্রতারক ভুয়া মালিকের প্রকৃত পরিচয় সাধারণ কর্মচারীদের সামনে তুলে ধরবে, তাদেরকে সংগঠিত করবে এবং প্রতারককে উৎখাত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। এমন কি এ পথে সে তার জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান সব কিছুকে কুরবানী করতে পিছপা হবে না। আজকে যারা তাগুতকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চিহ্নিত করে; অন্যদেরকে এই চিহ্নিত করার

কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং সমষ্টিগতভাবে তাগুতের সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে; প্রকৃত খিলাফাহ্ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে– যেমন আফগানিস্তানের মোল্লা উমর এবং সৌদি আরবের উসামা বিন লাদেন ও তাঁদের সহচরবৃন্দ; তাঁরা অবশ্যই এই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্গত। খিলাফাহ্র ডাক যারা দিচ্ছেন তারা যদি কোরআন ও সুন্নাহ্কেই একমাত্র পন্থা মনে করেন তারাও এই দলে। যদি না তারা চলমান জ্বিহাদ-ক্বিতালকে পশ্চিমাদের সুরে সমালোচনা করেন।

এখন একটু ভেবে দেখুন

ঐ বিশেষ কোম্পানীর মালিক বিদেশে অবস্থানরত এবং সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোম্পানীর এদেশীয় দায়িত্বশীলের কর্ম-আচরণ এই মুহূর্তে জানতে অপারগ এবং ঐ দায়িত্বশীলকে সরাসরি সাহায্য করতে অক্ষম। এ কথা জেনেও সৎ, যোগ্য, দায়িত্বশীল উপরোক্ত প্রতিরোধের কর্মপন্থাকেই সবচাইতে বিবেকসম্মত বলে রায় দিচ্ছে এবং তার প্রতিকারার্থে নিজের জান-মালকে ক্ষতির ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। অপরদিকে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই কখনও বাইরে নয় এবং তিনি সর্বাবস্থায় তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে সক্ষম। এ কথা জেনেও প্রকৃত কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী কেমন করে উপরোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে পিছপা হচ্ছে? কেমন করে সে প্রকৃত "তাগুত" (তথা ভুয়া মালিক, ভুয়া সার্বভৌমত্বের অধিকারী, ভুয়া আইন প্রণয়নকারী, গায়রুল্লাহ্র কর্তৃত্ব) কে চিনেও না চেনার ভান করতে পারে? কেমন করে সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই তাগুতদের খেদমতে এগিয়ে যাচ্ছে? কিভাবে সে খোদায়ী খেলাফতের এই আমানতকে খেয়ানত করে তথাকথিত সন্ন্যাসব্রত নিয়ে জঙ্গলে পালাচ্ছে? কিভাবে সে আপন দায়িত্ব এড়িয়ে নিজের পার্থিব আরাম-আয়েশ, সম্মান-প্রতিপত্তির লোভে আপন কর্তব্য অবহেলাকে ঢাকার জন্য অন্ধ, খোঁড়া যুক্তি পেশ করছে? তবে কি তাঁর কাছে আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের যে ওয়াদা আছে তা গ্রহণযোগ্য নয়?

বস্তুত, কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী যদি এই প্রতিরোধ কর্মসূচী ও আচরণ গ্রহণ না করে উপরোক্ত আর যে কোন আচরণ গ্রহণ করে তবে তা তার জন্য কোন প্রকৃত সফলতা বয়ে আনবে না; বরং সে জাহান্নামে চির অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাবে।

কথিত বিশাল কোম্পানী যতই বিশাল হোক না কেন, যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন যদি তা এ দুনিয়ার কোন শক্তি হয় তবুও **তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব অবশ্যই সীমাবদ্ধ। তার পাকড়াও থেকে পার পাওয়া হয়ত সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত মালিক বিশ্ব জাহানের মহাপ্রভুর পাকড়াও থেকে প্রকৃত কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী অথচ সত্য গোপনকারী (কিতমানে শাহাদাতে অভিযুক্ত), কিংবা নিজ দায়িত্ব ছেড়ে পলায়নকারী, কিংবা রাব্বুল আলামীনের শত্রুর সাথে সমঝোতাকারী বিশ্বাসঘাতক, কিংবা মুখরোচক যুক্তির বেড়াজাল সৃষ্টিকারী কিভাবে পালাবে?** যারা কোরআন-সুন্নাহ্ জানে না তারা প্রকৃত তাগুতকে চিনে না। কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারীর কি এ কথা বলার কোন সুযোগ আছে যে, তিনি তাগুতকে চিনতে পারছেন না। না, নেই, কখনও নেই।

আল্লাহ্র কোরআন, রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ প্রকৃত রবুবিয়্যাহ্, উলুহিয়্যাহ্, তৌহিদ, শিরক, তাগুত, ঈমান, ইসলাম, ইহসান, মুসলমান ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্ট করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসে তা বর্ণিত হয়ে থাকছে। সেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যত গন্ডগোল তা আমাদের মাঝেই। আমরা যারা কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবন করছি বলে দাবী করছি অথচ তাগুতকে চিহ্নিত করছি না, তাগুতের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করছি না এবং তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই করছি না, তারাই নিজেরা নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছি আর দুনিয়া সম্পর্কে, আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে ধোঁকায় পড়ে আছি। আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে যাবতীয় ভীরুতা, কাপুরুষতা, আপোষকামিতা, স্বার্থপরতা তথা লোভ-মোহ-এর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বড়ই ক্ষমাশীল। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে সক্ষম হলে, তওবা করলে এবং তাগুতকে চিহ্নিত করে তাকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় কর্মসূচী গ্রহণ করলে আল্লাহ পাক আমাদের অতীতের সব গুনাহকে মাফ করবেন, ইসলামের উপর আমাদের জিন্দেগী নসীব করবেন, ঈমানের সাথে আমাদের মৃত্যু দেবেন, কবরে শান্তিতে রাখবেন, হাশরে-মিজানে সম্মানিত করবেন, চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অন্যথায় আমরা দুনিয়া-আখেরাতের সব মঞ্জিলেই চরম লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি আমাদের অতীত বুজুর্গানে দ্বীন, সলফে সালেহীনগণ, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি তথা তাগুতের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়েননি, তাঁরা কি ক্ষতিগ্রস্তদের দলে? এক্ষেত্রে জবাব পবিত্র কোরআনের ভাষাতে এই একটাই আর তা হল قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى فِى كِتٰبٍ لَّايَضِلُّ رَبِّى وَلَايَنْسٰى অর্থাৎ, এর জ্ঞান আমাদের রবের কাছে পুস্তকে সংরক্ষিত, আমাদের রব ভুলেও যান না পথভ্রষ্টও হন না।[৬]

আমরা যারা কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারী তারা অনেকে নিজেদেরকে 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' বলে দাবী করছি এবং সেই অনুযায়ী যাবতীয় অধিকার ও সম্মান সমাজ থেকে তালাশ করছি। অথচ আমাদের মূল দায়িত্ব যা নবী ও রাসূল (স.)-গণ পালন করেছেন যার কারণে ইব্রাহীম (আ.) (নমরূদের শত্রু হয়েছেন, যার কারণে মূসা (আ.) ফেরাউনের শত্রু হয়েছেন, যার কারণে ঈসা (আ.) রোমীয় শাসকের শত্রু হয়েছেন, যার কারণে মোহাম্মদ (স.) তৎকালীন আরবীয় ক্ষমতা–কর্তৃত্বের অধিকারী জাহেলিয়্যাতের ধ্বজাধারী আবু জাহেল, আবু লাহাব গংদের শত্রু হয়েছেন, সেই নির্ভেজাল দায়িত্ব এড়িয়ে অধিকার ভোগ করার কি চমৎকার অবস্থাই না সৃষ্টি করছি। ঈমান না আনলে ইসলামে প্রবেশ করা যায় না, মুসলমান হওয়া যায় না। আবার তাগুতকে অস্বীকার না করলে ঈমানও হয় না।

তাগুতের পরিচয় লাভই আমাদের প্রথম কর্তব্য এবং তাগুতকে চিহ্নিত করাই আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। বর্তমান সমাজের কোরআন-সুন্নাহ্ জানা লোকের ঘাড়েই বর্তায় এই দায়িত্ব। কোন প্রকার খোঁড়া যুক্তিই তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না।

নিজেদের ভীরুতা, কাপুরুষতা, অলসতা, আপোষকামিতা, স্বার্থপরতা, আরামপ্রিয়তা, স্থানবিশেষে অহমিকা, একক নেতৃত্বের মনস্কামনাকে ঢাকা দেবার জন্য বলি– **'বাপুরে, তাগুত মহাশক্তিশালী, জঘন্য, আন্তর্জাতিক ক্ষমতাশালীদের সাথে তার হাত, এদের বিরুদ্ধে আমাদের মত মোস্তাজআফিন টুঁ শব্দটি করলে রেহাই নেই, বৌ–বাচ্চাসহ চৌদ্দগোষ্ঠীর সর্বনাশ করে ছাড়বে....'। কিংবা বলি, 'এর জন্য দরকার একজন আল্লাহ ওয়ালার নেতৃত্ব যাঁকে অন্তত ইমাম মাহদীর সমপর্যায়ের হতে হবে। স্বাভাবিকভাবে সেই আল্লাহ্ওয়ালাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় (যা**

৬. (সূরা তা–হা আয়াত নং ৫২)।

আপতঃদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব)– যিনি সব দোষ-ক্রটির উর্ধ্বে থেকে এ আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবেন। যেহেতু আপাততঃ তিনি অনুপস্থিত সুতরাং বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।'

আমাদের এই মানসিকতার জওয়াবে পবিত্র কোরআনে সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো প্রণিধানযোগ্য–

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِى اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَائَتْ مَصِيْرًا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ○

গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে– সমান নয়। যারা জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা গৃহ উপবিষ্টদের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের সাথেই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। নিজের উপর জুলুম করা অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলে? তারা বলবে এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় (মুস্তাদআফ) ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্র যমীন কি তোমাদের জন্য প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের অবস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় করতে পারে না, তারাই (ঐ মন্দ পরিণতির) ব্যতিক্রম। অতএব আশা করা যায় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।[৭]

উপরোক্ত আয়াতগুলি থেকে প্রমাণিত হয়–

এক তাগুতকে হটিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দিয়ে যারা জিহাদ করে তারা এ কাজ যারা করে না তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

দুই. তাগুত হটান এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কেবল সেই পঙ্গু শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অক্ষম, দুর্বল, বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুদেরকে যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।

সুতরাং দ্বীনের সমঝদার সুস্থদের এই একমাত্র কর্মসূচীর গত্যন্তর নেই।

তিন. এই সংগ্রাম সাধনায় বাধা হলে তারা হিজরত করবে তথাপি এই তাগুতী ব্যবস্থার সাথে আপোষ করবে না।

চার. আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসহায়, সংখ্যার দিক থেকে অপ্রতুল, নেতৃত্বহীন অসংগঠিত মুস্তাদআফ–এ কথা বলে মাফ পাওয়া যাবে না বরং এ কাজ ও এ অবস্থান আমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম বলেই সাব্যস্ত হবে।

পাঁচ. এই পঞ্চম কর্মসূচী তথা তাগুত চিহ্নিত করণ এবং তাগুত উৎখাতকরণের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী কোরআন-সুন্নাহ্ অনুধাবনকারীর বর্তমান সময়ের একমাত্র কাজ। আমরা এ থেকে বিরত থাকি কতগুলো দুর্বল যুক্তি দিয়ে। তার মধ্যে একটা হলো এ যুক্তি যে, আমরা **"দুর্বল এবং মোস্তাদআফ"** এ যুক্তি যে ধোপে টেকে না তা উপরোক্ত কোরআনের আয়াতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আর যে যুক্তিতে বলা হয় '**সে জন্য যে জ্ঞান এবং বিচক্ষণতার দরকার তা আমাদের নেই।**' এর সাথে একমত হওয়া দুষ্কর। কারণ হুজুর (স.)-এর সময় এবং তাঁর পরবর্তী কয়েক যুগ এত তাফসীর এবং সঙ্কলিত হাদিস গ্রন্থ কিংবা মাদ্রাসা ছিল না যা এখন আছে এবং তথ্যভিত্তিক জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা বরং এখন বেশি মাত্রাতেই আছে। তবে এক্ষেত্রে অভাব হল ইসলামের সাথে "আমল" "তাওয়াক্কুল" ও "মা'রিফাত"–এর সমন্বিত সংযোগ। বস্তুত, এগুলোর একত্র সংযোগ হওয়ার প্রশিক্ষণ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া সম্ভব নয়।

স্মরণ রাখা দরকার, হুজুর (স.) যখন বিপ্লব সাধনে ব্যস্ত ছিলেন তখনই কোরআন আস্তে আস্তে নাযিল হয়। **কোরআন-হাদিস পূর্ণ অনুধাবনের জন্য তাগুতের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ময়দানই উপযুক্ত ক্ষেত্র**। সুতরাং জ্ঞানের অপ্রতুলতার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। **বাস্তবে এই প্রতিরোধ কর্মসূচীর জন্য আমাদের যে জিনিসটির অভাব তা হল পূর্ণাঙ্গ সাহস। আমরা প্রাণভয়ে ভীত, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, প্রভাব-প্রতিপত্তিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় আশঙ্কিত।** দ্বীন কায়েমের সঠিক আকিদা আমরা ভুলে গিয়েছি। আমরা আরও ভুলেছি – اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ অর্থাৎ তরবারীর ছায়ার নিচে বেহেশত। আমরা নির্ঝঞ্ঝাট আরাম-আয়েশে থেকে তস্‌বিহ্‌র দানা টিপে বেহেশ্‌তের পথ খুঁজছি আর নবীর সুন্নাহ্ পালন করছি বলে আত্মশ্লাঘায় ভুগছি। অথচ হুজুর পাক (স.)-এর নবুওয়্যাতী জিন্দেগীর কোন অধ্যায়ই নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। হুজুর (স.)-এর জীবনে সবচাইতে বড় সুন্নাহ্ ছিল সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া, তাগুতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আমরা সেই সব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ্ ছেড়ে দিয়ে, লম্বা দাড়ি লম্বা জামা আর ঢিলা-কুলুফের সাথে কিংবা মিষ্টি খাওয়ার মধ্যে সুন্নাহ্‌কে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। একটু ভাবলেই আমরা বুঝব যে, আমাদের এই সৎ সাহসের অভাবের পিছনে কারণ হল اِسْتِقَامَتْ, صَبْر এবং تَوَكُّل بِاللّٰهِ এর অনুধাবন ও অনুশীলনের অভাব। আর এগুলোর অনুশীলন ব্যতীত প্রকৃত جِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- সম্ভব নয়।

৭. (সূরা নিসা, আয়াত নং ৯৫– ৯৯)।

পরিশেষে প্রতিটি কোরআন-সুন্নাহ অনুধাবনকারীর কাছে বর্তমান সময়ের তাগুতকে চিনে নেয়া, চিহ্নিত করা এবং তাগুতের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে চূড়ান্ত اَلْقِتَالُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–য় অংশ গ্রহণের কামনা করছি।

হযরত ঈসা (আ.) ঃ নবুওয়্যাতপূর্ব জীবন

আমাদের প্রথম প্রস্তাবনার সপক্ষে [১] কোরআন ও সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট দলিল রয়েছে। বিশেষতঃ আসহাবে কাহাফের ঘটনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল নিশ্চয়। তদুপরি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এবং জনসমক্ষে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করার পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর শৈশব, কৈশোর ও প্রাথমিক যৌবনের দিনগুলো কোন বিশেষ পরিবেশে কেটেছে সে বিষয়টি জানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পেশ করেছেন জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহীম তাঁর Jesus a Prophet of Islam গ্রন্থে। এ বইটি লেখার জন্য লেখক ৩০ বছর ধরে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করেছেন এবং যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছেন তার পূর্ণ Bibliography তিনি পেশ করেছেন। [২]

দিল্লী থেকে প্রকাশিত বইটির An Historical Account of Jesus অধ্যায়ের ১৯ থেকে ৩৬ নং পৃষ্ঠার সরল বঙ্গানুবাদ পেশ করছি। মাঝে মধ্যে ব্রাকেটে আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে সেই সময় ও পরিস্থিতির মূল্যায়নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি। আমাদের বিশ্বাস আমাদের বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থার সাথে ইয়াহুদী জাতির সেই সময়কার অবস্থার সাথে এক অতি চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা সেসব বিষয় স্থান বিশেষে উল্লেখ করবো। এরপর ঐ পরিস্থিতিতে ইয়াহুদী জাতির ন্যায়-পরায়ণ এবং আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের কর্মনীতি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে যা সঙ্গতিপূর্ণ তা তুলে ধরবো যাতে আমাদের সম্মুখে আমাদের কর্তব্যকর্ম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগ্রহী পাঠককে অনুরোধ করবো তারা যেন পবিত্র কোরআনের সূরা কাহাফ-এর মধ্যে উল্লিখিত আসহাবে কাহাফের কাহিনী এবং তার

---

১. তাগুত ঃ মুক্তি কোন পথে, এ শিরোনামে অত্র পুস্তকে ইতোপূর্বে যে তিনটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার প্রথমটি সম্পর্কে এখানে বলা হচ্ছে।

২. JESUS A PROPHET OF ISLAM
MUHAMAD ATAUR RAHIM
ISBN NO. 81-85738-46-7
EDITION-2002
PUBLISHED BY ABDUN NAEEM

Ph :- 3253514
3265380
3286551
Fax :- 3277913
110 002 e-mail: ibsdelhi @delh2 vsnl.net in ISLAMIC BOOK SERVICE, NEW DELHI (INDIA)
Website:- http:// www.islamic-indi, com.

সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যাখ্যায় হাদিসসমূহের বক্তব্য এবং সূরা বুরুজের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

ইতিহাসের এই অধ্যায়ে ইয়াহুদীগণ ক্রমাগত বিদেশী শত্রুদের আক্রমণে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হচ্ছিলো (যেমন মুসলিম বিশ্ব মহাযুদ্ধোত্তর সময় থেকে ক্রমাগতভাবে বৃটিশ বেনিয়া, নব্য আমেরিকান এবং বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় পরাশক্তিদ্বারা ক্রমাগত ভাবে আক্রান্ত ও পদদলিত হয়ে আসছে)। এই পরাজয় তাদেরকে অসহায় করে দিয়েছিলো। তাদের এই অপারগতা তাদের মনে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল অন্যদের বিরুদ্ধে। (ঠিক এই অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশের মনে বিদেশী অপশক্তির বিরুদ্ধে যেমন ধিকি ধিকি ঘৃণার আগুন জ্বলছে)। এই চরম সঙ্কট এবং বিপর্যয়ের মুখেও ইয়াহুদী জাতির এক বিরাট সংখ্যক লোক মানসিক সুস্থতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। (এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমাদের অতি ক্ষুদ্র অংশই কেবল এই সুস্থতার পরিচয় দিচ্ছে)। ইয়াহুদী জাতির এই সুস্থ অংশ নিরাশার অন্ধকারত্ব পায়ে ঠেলে আশার আলোয় উজ্জীবিত ছিলো। তাঁরা নতুন মূসার আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিলো এই নতুন মূসা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে এই বিদেশী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেন এবং তিনি তাদের জন্য সারা বিশ্বে জিহোভার রাজত্ব কায়েম করবেন। (ঠিক আমরা এখন যেমন মনে করছি যে আমাদের উপর বিদেশী প্রভুদের এই শোষণ শাসন আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদেরকে বিজয়ী করবেন ইমাম মেহেদী ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং দাজ্জাল হত্যা করে সারা বিশ্বে দ্বীন কায়েমে সহায়তা করবেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.))। তাঁরা এই নতুন মূসাকে মেসাইয়াহ বা মোচনকারী মনে করতেন। অপরদিকে ইয়াহুদী জাতির মধ্যে সর্বদাই এমন দুনিয়া পূজারী বিশ্বাসঘাতকদের উপস্থিতি ছিলো যারা “যে দিক থেকে বৃষ্টি সে দিকে ছাতা” ধরার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলো এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের দু'পয়সা কামানোর সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধার করছিলো। যদিও এভাবে তারা দুনিয়াবী এবং ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল ছিল তথাপি তারা তাদের জাতির বেশির ভাগ লোকের নিকট বিশ্বাসঘাতকরূপেই চিহ্নিত ছিল। (বর্তমানে আমাদের দরবারী আলেম তথাকথিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সৌখিন ইসলামী আন্দোলনগুলোর নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে ইয়াহুদী জাতির এই বিশ্বাসঘাতকদের চিনতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়)। এ দু'ধরনের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে তৃতীয় আরও একটি

দল ছিল। তারা বনে-জঙ্গলে পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। ওখানে তারা নির্বিঘ্নে তৌরাতের আইন অনুশীলন করতে পারছিল এবং বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি সঞ্চয় করছিল। (বর্তমানে আমাদের মাঝে এই তৃতীয় শ্রেণী যে নেই তা জোর দিয়ে বলা যায় না)। তাঁরা বিদেশী শক্তিকে পরাভূত করার সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করছিল। এমতাবস্থায় রোমানগণ কতগুলি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এই বিশেষ দলের খোঁজ নিতে। এই স্বজাতি প্রেমিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল।

এ বিষয়ে আমরা জোসেফিয়াস (Josepheus) এর বর্ণনা থেকে প্রথম অবগত হই। এই জোসেফিয়াসই এই তিন ধরনের ইয়াহুদীদের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে ফরিসি, সাদ্দুসাই এবং ইসসেনী। (Pharisees, Sadducees, Essenes)

ইসসেনীদের অস্তিত্ব জানা ছিল। কিন্তু বিস্তারিত কেউ জানতোনা। এই বিশেষ দলের সম্পর্কে গস্‌পেলগুলোও নীরব। হঠাৎ করেই মৃত সাগরীয় চামড়ায় লিখন অর্থাৎ "Dead Sea Scroll" এর বিষয় যা মৃত সাগরের নিকটে জর্দান-এর পাহাড়ের গুহা থেকে আবিষ্কৃত হয়, জন সমক্ষে প্রচারিত হয়। এতে সমগ্র বুদ্ধিজীবী মহল যার মধ্যে গীর্জার পাদ্রীগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আলোড়িত হয়ে পড়েন। যেভাবে ঐ চামড়ার লিখন হাতে পাওয়া যায় তার কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

১৯৪৭ সাল। ক্বোমরান উপত্যকার এক আরব রাখাল বালক মেষ চরাতে গিয়ে একটি মেষ হারিয়ে ফেলে। ঐ প্রাণীটির খোঁজে কথিত রাখাল বালক নিকটবর্তী পাহাড়ে আরোহণ করে একটি গর্তের সন্ধান পায়। তার ধারণা হয় সম্ভবতঃ তার মেষটি ঐ গর্তেই গিয়ে থাকবে। সে ঐ গুহায় একটা পাথর নিক্ষেপ করলো এবং আশা করছিলো অপর পাথরের সাথে নিক্ষিপ্ত পাথরের পতনের শব্দ শুনবে (এতে করে গুহার গভীরতা অনুমান করতে চাইছিলো সম্ভবতঃ)। অথচ প্রাপ্ত শব্দে তার মনে হলো পাথরটি কোন পাত্রের গায়ে পড়েছে। তৎক্ষণাত তার মনে হলো ঐ পাত্রটি নিশ্চয়ই একটি গুপ্তধনের আধার হবে। পরদিন সকালে সে তার এক বন্ধুসহ ঐ পাহাড়ের গর্তের নিকট আসল এবং গর্তে প্রবেশ করলো। তারা হতাশ হয়ে দেখলো গুপ্ত ধনের পরিবর্তে সেখানে পড়ে আছে ভাঙ্গা মাটির পাত্র এবং চামড়ার রোল। চামড়ার রোল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। তারা ঐ চামড়ার রোল নিজেদের ঘরে নিয়ে আসলো এবং মেলে দেখলো এগুলো তাদের তাঁবুর এ পাশ থেকে ও পাশ দখল করছে।

এই চামড়ার রোলগুলির একটিই পরবর্তীতে সিকি মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়। এগুলো তারা মাত্র কয়েক শিলিং-এর বিনিময়ে একজন সিরিয়ান খৃষ্টান-এর নিকট বিক্রি করে যার নাম ছিল কান্ডো। কান্ডো ছিল একজন মুচি। তার আকর্ষণ ছিলো সস্তায় পাওয়া এত চামড়া দিয়ে অনেক জুতায় তালি দেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কান্ডো অবাক হয়ে দেখলো পূর্ণ চামড়া জুড়ে তার অপরিচিত ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। খুব মনযোগ দিয়ে দেখার পর সে সিদ্ধান্ত নিল জেরুজালেমে মহান মার্কস-এর মিউজিয়ামের একজন প্রভাবশালীকে দেখাবে। অতঃপর এই দুই ব্যক্তি দেশ থেকে দেশান্তরে এগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে অর্থ বানানোর নিয়তে। অবশেষে আমেরিকান ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্টিটিউট অব জর্ডান-এ এসে জানা যায় এই চামড়ার লিখন সবচেয়ে প্রাচীন জানা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গ্রন্থ ইসাইয়াহ-এর কপি। এর সাত বছর পর ইসরাইল গভর্নমেন্ট ঐ চামড়ার লিখনগুলিকে জেরুজালেম-এর পবিত্র গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা করে।

জর্দান নদীর তীরবর্তী পাহাড়িয়া এলাকায় প্রায় ছয় শতের মত গর্ত পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিতে ধারণা করা হয় ইসেনীরা বাস করতো। এরা এমন একটা দল ছিলো যারা আল্লাহ্‌র (তাদের বিশ্বাস মতে জিহোভা-এর) উদ্দেশ্যে দুনিয়া ত্যাগ করেছিলো। তারা এ জন্যই গুহায় বাস করতো। **তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, ইয়াহুদীগণ কেবল জিহোভার সার্বভৌমত্ব মেনেই বাস করতে পারে এবং জিহোভা ছাড়া অন্য কোন শক্তির আনুগত্যকে তারা বৈধ মনে করতো না। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে ইয়াহুদি রোমান সম্রাটের কিংবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির অধীনতা স্বীকার করে এবং তাদের আইন মানে তারা শিরক করে।** (খাঁটি তৌহিদ-এর বক্তব্যও তাই। খাঁটি ঈমানদার জ্ঞানবান মুসলিম মাত্রই এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তাগুত সম্পর্কিত আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সাথে এর সামঞ্জস্য লক্ষণীয়)।

দুনিয়ার চাকচিক্য যা অপ্রতিহতভাবে পরকালীন ক্ষতির সম্মুখীন করে এমন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই ইসসেনীরা মৃত সাগরের তীরবর্তী পাহাড়িয়া নির্জন কোলাহলমুক্ত গর্তে তাদের আশ্রয় বেছে নিয়েছিল। জিহোভার দরবারে প্রশান্তির মিলনের প্রত্যাশায় তারা নির্জন পাহাড়ীয় জীবন গ্রহণ করেছিল। এতে শিরকমুক্ত পবিত্র জীবন যাপন তাদের জন্য সহজ ছিল। ইয়াহুদীদের প্রচলিত ধর্মীয় পণ্ডিতদের ন্যায় তৌরাত দিয়ে তারা তাদের অন্ন সংস্থান করতো না। বরং তারা চাইতো

তৌরাত অনুযায়ী পবিত্র জীবন যাপন করতে। (বর্তমানে আমাদের দ্বীন বিক্রয়কারী দুনিয়াদার আলেম পন্ডিত এবং সৌখিন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবর্গ যে জিন্দেগী বেছে নিয়েছে তা নয় বরং বিশ্ব তাগুত আমেরিকা ও তার দোসরদের চ্যালেঞ্জ করে পাহাড়ে জঙ্গলে মরুভূমির বালুর আড়ালে প্রকৃত ঈমানদার মুজাহিদের সাথে এদের কি চমৎকার সাদৃশ্যই না দেখা যাচ্ছে।) এ জীবনে তারা চাইতো পবিত্রতা অর্জন করে জিহোভার সান্নিধ্য লাভ। এভাবে তারা চাইতো সমাজের অপরাপর ইয়াহুদীদের জন্য শিরকমুক্ত পবিত্র জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত পেশ করা যাতে ইয়াহুদীগণ তাদের নিজেদের যথার্থ সংশোধন করে নিতে পারে।

তারা মর্মস্পর্শী কবিতা ও গান রচনা করতো যার মাধ্যমে তারা অন্যদের মনকে নাড়া দিতো এবং পাহাড়ীয়া বন্য কিন্তু শিরকমুক্ত জীবনের প্রতি অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতো। মৃত সাগরীয় ঐ চামড়ার লিখন আবিষ্কারের আগে ইসসেনীদের ঐ একাকী গুহার জিন্দেগী সম্বন্ধে বাইরের দুনিয়া খুব কমই খবর রাখতো। প্রাচীন ঐতিহাসিক প্লীনি এবং জোসেফাস তাঁদের সম্পর্কে উল্লেখ করলেও তারা পরবর্তী ঐতিহাসিকদের নিকট অজ্ঞাতই থেকে যায়। Pliny তাদেরকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার গোষ্ঠি বলে চিহ্নিত করেন। Pliny-এর ভাষায়– তাঁদের কোন নারী ছিলনা, তাঁরা যৌন কর্ম ত্যাগ করতো। তাদের টাকা-পয়সা ছিলনা। তথাপি তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলছিল। এক বিরাট সংখ্যক লোক এ ধারার জীবন যাপনে আকৃষ্ট ছিল। যদিও তারা কাউকে জন্ম দেয়নি তথাপি তাদের এই দল টিকেছিল হাজার বছর ধরে। (মোল্লা উমর এবং উসামা-বিন-লাদেন এর জীবন যাপন পদ্ধতিকে পছন্দ করার মতো মন-মানসিকতার লোক বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে কম আছে বলে মনে হয় না। এখানে অবশ্য এরা বিবাহিত জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নয়। এই পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো)।

জোসেফাস, যিনি একজন ইসসেনী হিসাবেই জীবন শুরু করেন তিনি ইসসেনীদের সম্পর্কে বলেন– 'তারা বিশ্বাস করেন আত্মা অমর। ইহা জিহোভার এক বিশেষ দান। জিহোভা কিছু লোককে তাঁর নিজের জন্য প্রবৃত্তির লালসা থেকে পবিত্র করে নেন। এভাবে যাকে পবিত্র করা হয় তিনি পূত পবিত্র জীবন লাভ করেন।'

এই গুহাবাসীরা তাদের জীবনকে বিদেশী আক্রমণকারীদের থেকে নিরাপদ দূরে রেখে তাদের পঙ্কিলতার স্পর্শ থেকে হেফাজত করতে সক্ষম হন। প্রতিটি ইয়াহুদীর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তথা ধর্মীয় পবিত্রতা অর্জন এবং অ-ইয়াহুদী শাসনমুক্ত

থাকার জিম্মাদারী থেকে এই গুহাবাসীরা নিজদেরকে মুক্ত মনে করতোনা। প্রাত্যহিক জীবনের নিয়মিত ইবাদাত-বন্দেগী এবং ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন ছাড়াও তারা মূসা (আ.)-এর প্রদর্শিত পথের পথপ্রদর্শক হিসাবে নিজেদের গড়তো এবং বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধ করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। (সুতরাং দেখা যায় দৈনন্দিন জীবন যাপনের সাথে সাথে দ্বীনি জ্ঞানার্জন এবং দ্বীনের শত্রুদের মোকাবেলায় নিজকে প্রস্তুত করা সকল মু'মিনের ব্যক্তিগত জিন্দেগীর মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরআনের আয়াত ৮ ঃ ৬০ ও ৯ ঃ ৪৬ এই বক্তব্যেরই সাক্ষ্য পেশ করে)।

তাদের এই জীবন ইহলৌকিক লাভের জন্য ছিলোনা, কেবলমাত্র জিহোভার সন্তুষ্টিই তাদের লক্ষ্য ছিলো। (বর্তমান সময়ে উসামার দল এবং তাঁদের সম মানসিকতার দলগুলির উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে।) এই সশস্ত্র দলের সদস্যদেরকে তাদের শত্রুরা বলতো Zealot (ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কাজে অতি উৎসাহী, ত্যাগী আত্মনিবেদিত ব্যক্তিকে অভিধানের ভাষায় সাধারণতঃ "জিলট" বলে। তবে তাদের শত্রুরা ব্যঙ্গ করেই তাদেরকে এই নামে আখ্যায়িত করতো। বর্তমানে এই মুসলিম উম্মাহ্‌র কারো মধ্যে উপরোক্ত গুণ প্রকাশ পেলেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূল হোতা আজকের বিশ্বের সকল অনিষ্টের মূল আমেরিকা এবং তাদের পা-চাটা কুকুররা যেমন এদেরকে "সন্ত্রাসী" বলে গালি দেয় তেমনি এই ইসসেনীদেরকে তখন তাদের শত্রুরা গালি হিসাবেই বলতো "জিলট")। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে একই পতাকাতলে একটা দলের মতই কাজ করতো। প্রতিটি গোত্রের জন্য একটা নির্দিষ্ট ব্যানার ছিল। এই জিলটরা চারটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রুপে বনি ইসরাঈলের ১২ গোত্রের তিন গোত্র শামিল থাকতো এবং তাদের গ্রুপ প্রধান অবশ্যই একজন লেবীয় (Levite) হত। এভাবে বনি ইসরাঈলের ১২ গোত্রের সকল গোত্রই এই ইসসেনীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। গ্রুপ প্রধান কেবল মাত্র সৈন্য পরিচালক ছিলেন না, তিনি তাদের ধর্মীয় গুরুও ছিলেন। এই চারটি গ্রুপের আলাদা আলাদা মিদ্‌রাস (আরবী মাদরাসা শব্দের সমার্থক) বা স্কুল ছিলো। গ্রুপ প্রধান যিনি অবশ্যই একজন লেবীয় ছিলেন তিনি সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও প্রতিনিয়ত ঐ মিদ্‌রাস-এ দরস দিতেন (আমাদের মধ্যে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে গঠিত দলগুলোর নেতারা যেমন নিয়মিত কোরআন ও সুন্নাহ্‌র "দরস" দিয়ে থাকেন। লক্ষণীয় বিষয় যে ইসসেনীরাও এই কার্যকে "দরস" বলতো)।

এইভাবেই ইসসেনীগণ নির্জন গুহার বন্য জীবনে পার্থিব জীবনের চাকচিক্য বিবর্জিত নারী সংসর্গ বিমুখ নির্লোভ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো। তারা নিজেদের মধ্যে গোপন সমাজ গড়তো এবং এই গোপনীয়তা যারা এই গোপন সমাজের সদস্য ছিলনা তাদের নিকট প্রকাশ করতো না (ইসলাম বিতানাত সম্পর্কে যেই নির্দেশ দেয় অনেকটা তাই ছিল এই ইসসেনীদের মধ্যে। সূরা আলে-ইমরানের আয়াত ১১৮ এর ব্যাখ্যায় মা'রিফুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত তফসীর ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পৌত্তলিক আগ্রাসী রোমান শক্তি এই ইসসেনীদের সম্পর্কে জানতো কিন্তু এদের (ইসসেনীদের) গোপনীয়তার পর্দা এত কঠোর ছিলো যে ঐ দুশমনরা তা ভেদ করতে সক্ষম ছিলনা। প্রতিটি সাহসী উদ্যমী ইয়াহুদীই এ দলের সদস্য হওয়ার স্বপ্ন দেখতো কারণ ওটাকেই ইয়াহুদীদের মুক্তি এবং জিহোভার সন্তোষ লাভে সর্বোত্তম বাস্তব পন্থা মনে করত (এখন যেমন প্রতিটি শাহাদাতপ্রার্থী ঈমানদারই উসামা ও মোল্লাহ উমর-এর সাথী কিংবা অনুরূপ কোন দলের সাথী হওয়ার স্বপ্ন দেখে)।

আমরা প্লীনির রেকর্ড থেকে যেভাবে জানি যে ইসসেনীগণ কৌমার্য জীবনে অভ্যস্ত ছিলো তেমনি জানি যে তারা পালক পুত্র গ্রহণ করতো এবং প্রত্যেকে পালক পুত্রের সাথে নিজ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করতো এবং তাদের (অর্থাৎ ইসসেনীদের) মত করে এই পালকপুত্রদের গড়ে তুলতো (এই বিশেষ পদ্ধতি ইসলাম এবং মুসলিমদের নিকট নিরুৎসাহিত বা অগ্রহণযোগ্য)। দীর্ঘ সময় এই ইসসেনীরা টিকে ছিলো যদিও তাদের কারও কোন ঔরসজাত সন্তান ছিলোনা। জেরুজালেমের প্রধান ইবাদাতগাহ্ (আল আক্সা মসজিদ)-এর তৎকালীন প্রধান ধর্মীয় গুরু (আল্লাহ্‌র নবী) হযরত জাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ বয়সে অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত একমাত্র সন্তান ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালামকে এই ইসসেনীদের সাথেই প্রেরণ করেছিলেন (পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াহইয়ার জন্ম সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ৩৭-৪১, ৩ ঃ ৩৭/৪১ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে)। এই ইয়াহইয়া (আ.)-ই খৃস্টীয় ইতিহাসে "জন-বাপ্তাইজক" জন-দি-ব্যাপ্টিস্ট নামে পরিচিত।

এখন আমরা বুঝি কেন এই গুহাবাসী বন্য জীবনে নবী জাকারিয়া (আ.) তাঁর প্রিয় পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আদরের সন্তানকে একা ইয়াতিম করে পাঠাননি বরং তিনি ইসসেনীদের সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য গ্রুপ যারা জিহোভার সন্তুষ্টি লাভে সর্বাধিক অগ্রসর ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধানেই তাঁর বৃদ্ধ বয়সের পরম স্নেহের সম্পদ

একমাত্র সন্তানকে পাঠিয়েছিলেন। জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রী এলিজাবেথের চাচাত বোন মেরী (বিবি মরিয়ম) তাঁরই তত্ত্বাবধানে আল্-আকসা মসজিদে লালিতপালিত হচ্ছিলেন। কারণ মেরীকে তাঁর মা জিহোভার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় ইবাদাতগাহের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন (এর বর্ণনার জন্য পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৪১ ঃ ৫৯ আয়াত এবং সূরা মরিয়াম-এর ১৬ ঃ ৩৪ আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য)। এই পূত-পবিত্র পরিবেশেই শিশু ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়। সাধারণ ইয়াহুদী জনগণের মাঝে মসীহ-এর আগমনের প্রত্যাশা ব্যাপকভাবে বিরাজ করছিলো। যে মসীহ তাদের রাজাদের মুকুট পরাবে (মুকুট পরাবে কথাটা আমাদের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করলাম। মূল ইংরেজিতে লিখা রয়েছে Who would baptise and annoint their King। এই মসীহর আগমনের অত্যাসন্নতার গুজব এবং তার বেথেলহ্যাম-এ জন্মগ্রহণ করার বিষয়টি এত ব্যাপক ছিলো যে তৎকালীন আগ্রাসী শক্তি পৌত্তলিক রোমান সম্রাট হেরড এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় যে বেথেলহ্যাম-এ জন্মগ্রহণকারী সকল শিশুকে হত্যা করা হবে এবং এই মর্মে নির্দেশ জারি করে। এমতাবস্থায় শক্তিশালী ইসসেনী গ্রুপ-এর সাহায্যে হযরত জাকারিয়া (আ.) মা-মেরী (বিবি মরিয়ম) এবং তার অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত শিশু-সন্তান হযরত ঈসা (আ.)-কে রোমান শক্তির রক্তচক্ষু ও হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। মিশরের যে এলাকায় ইসসেনীদের অপর একটি কলোনী ছিল সেখানেই মা-মেরী এবং শিশু হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত হন।

মাতা মেরী এবং শিশু-পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে কেটে যাওয়া ঈসা (আ.)-এর প্রাথমিক জীবন তাই 'মৃত সাগরের চামড়ার লিখন' আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এক বিরাট রহস্য, জিজ্ঞাসা এবং নানা কল্পনার জন্ম দেয়। প্রচলিত এবং গীর্জা কর্তৃক গৃহীত কোন গস্‌পেলেই ঈসা (আ.)-এর জীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করেনি। (এই গস্‌পেলগুলো যে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘনিষ্ঠ সাথীদের কারও লেখা নয় এটি তার অতিরিক্ত প্রমাণ বৈকি)। ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক জন্ম, জন্মগ্রহণের পরই স্পষ্ট ভাষায় তাঁর ও তাঁর মাতার পবিত্রতা ঘোষণা তৎকালীন ইয়াহুদী সমাজে যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে সে অবস্থায় রোমান সৈন্যদের হাত থেকে পালানো সম্ভব ছিলো কেবল মাত্র শক্তিশালী ইসসেনীদের উপস্থিতির কারণেই। অথচ অন্য অবস্থায়

যে শিশু পিতৃহীনভাবে জন্মগ্রহণ করেই তার ও তার মায়ের পবিত্রতা সুস্পষ্টভাবে অত্যন্ত আস্থার সাথে ঘোষণা করে এমন শিশুকে তার (চির-শত্রু শয়তানের আকর) রোমানদের হাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব ছিলো। বিশেষ করে তাকে যখন রাখালদের একদল এবং ম্যাগীদের একদল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলো এমতাবস্থায় ইসসেনীদের অনুপস্থিতিতে তাকে বাঁচানোই কঠিন ছিলো।'

চতুর্থ বি.সি.-তে ঈসা (আ.) যখন তিন থেকে চার বছরের ছিলেন তখন সম্রাট হিরোদ মারা যায়। এতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হুলিয়া শিথিল হয় এবং তিনি অনেকটা মুক্তভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম হন। অনুমিত হয় তিনি ইসসেনী শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে কঠিন শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তৌরাত শিক্ষা করেন এবং অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার কারণে অতি অল্প বয়সেই তৌরাতের জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই মাত্র বার বছর বয়সে যখন তিনি ধর্মীয় গীর্জায় জনসমক্ষে উপস্থিত হন তখন তাকে ছাত্রসুলভ জ্ঞান-পিপাসু নয় বরং ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ পন্ডিতরূপে দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত আস্থার সাথে গভীর পান্ডিত্যের সাথে তৌরাতের আলোচনা উপস্থাপন করেন। মুসলিমদের বর্ণনায় তাঁর জীবনের অলৌকিক বিষয়ের অনেক আলোচনা দেখা যায়।

ছালাবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) থেকে বর্ণনা করেন–ওয়াহাব বলেন, "হযরত ঈসা (আ.)-এর অলৌকিকত্বের নিদর্শন যা লোকেরা প্রথম অবগত তা হলো তাঁর মা মিশরের এক গ্রাম্য অধিপতির বাসায় থাকতেন। অনেকগুলো গরীব লোক ঐ অধিপতির ঘরে কাজ করতো। বিবি মরিয়ম ও তাঁর স্বামী কাঠমিস্ত্রী জোসেফ ঐ গ্রাম্যাধিপতির বাসাতেই থাকতেন। একদিন ঐ গ্রাম্যাধিপতির ধনভান্ডার থেকে কিছু সম্পদ চুরি যায়। ঐ মাতব্বর এতে দরিদ্র লোকদের কোন সন্দেহ করেনি। কিন্তু বিবি মরিয়ম এই ঘটনায় খুব মর্মাহত হন। মায়ের মুষড়ে পড়া অবস্থা দেখে ছোট্ট ঈসা (আ.) তাঁর মাকে বললেন, "মা, তুমি কি চাও যে আমি এই গ্রাম্যাধিপতিকে তার সম্পদের খোঁজ দেই ?" তখন তাঁর মা বললেন, "হাঁ বাবা, আমি তাই চাই।" তখন ঈসা (আ.) বললেন, তাহলে তাঁকে বলুন তিনি যেন গরীবদের একত্রে এক যায়গায় জড়ো করেন। একথা বিবি মরিয়ম ঐ লোককে বলেন এবং কথানুসারে গরীব লোকদের একত্রিত করা হলো। যখন তারা একত্রিত হলো তখন তাদের মধ্যে অবস্থিত দুইজনের নিকট হযরত ঈসা (আ.)

গেলেন। তাদের একজন ছিলো অন্ধ অপরজন ছিলো খোঁড়া। তিনি খোঁড়া লোকটিকে অন্ধ লোকটির ঘাড়ে চড়ে বসতে বললেন এবং অন্ধ লোকটিকে দাঁড়াতে বললেন। অন্ধ লোকটি বললো, "আমি ওকে নিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।" ঈসা (আ.) বললেন, "তাহলে গতকাল তুমি তা কিভাবে করেছিলে?" একথা শুনে অন্যরা অন্ধ লোকটিকে মেরে বাধ্য করলো যাতে সে দাঁড়ায়। যখন সে দাঁড়ালো দেখা গেলো খোঁড়া লোকটি তার কাঁধের অবস্থান থেকে ভান্ডারের জানালা নাগাল পাচ্ছে। তখন ঈসা (আ.) বললেন, "এভাবেই গতকাল খোঁড়া লোকটি অন্ধের শক্তি ব্যবহার করেছে এবং অন্ধ লোকটি খোঁড়া লোকটির দৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং পরস্পরে মিলে ভান্ডার থেকে সম্পদ গায়েব করেছে।" তখন তারা দু'জনেই বললো, "জিহোভার শপথ! সে সত্য কথা বলেছে।" এবং তারা সকল সম্পদ ফেরৎ দিলো। গ্রাম্যাধিপতি এতে খুশি হয়ে বিবি মরিয়মকে ঐ ফেরৎ পাওয়া সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করতে বললো। তখন বিবি মরিয়ম বললেন, "জিহোভা আমাকে এ জন্য সৃষ্টি করেন নি।" তখন ঐ গ্রাম্যাধিপতি বললো, "তাহলে এগুলো শিশু ঈসা (আ.)-কে দাও। বিবি মরিয়ম জওয়াবে বললেন,"আমার চাইতে তার অবস্থান উপরে" এবং তখন ঈসা (আ.)-এর বয়স ছিলো ১২ বছর।"

অপর একটি হাদিস ঃ

সাদী বলেন, " ঈসা (আ.) যখন স্কুলে থাকতেন তখন তিনি অন্য বালকদেরকে তাদের পিতা ঐ সময়ে কি করছেন বলে দিতেন ; এমনকি তিনি কোন কোন বালককে বলতেন ঘরে গিয়ে দেখ তোমার পরিবারের লোকেরা এই এই খাদ্য তৈরী করছে, তোমার জন্য এই এই খাদ্য রেখে দিচ্ছে, তারা নিজেরা এটা ওটা খাচ্ছে। তখন বালকেরা গিয়ে সেই খাদ্য দাবী করে যে পর্যন্ত না দেওয়া হতো কান্না করতো। তখন পরিবারের লোকেরা বালকটিকে জিজ্ঞাসা করতো এসব কে বলেছে ? বালকরা জওয়াব দিতো ঈসা (আ.)। এক দিন ঐ বালকদেরকে তাদের মুরুব্বীগণ একটা ঘরে একত্র করলো। ঈসা (আ.) তাদের দেখতে গেলেন। লোকেরা বলল, বালকরা নেই। তিনি বললেন, "তবে এ ঘরে কি আছে ?" লোকেরা জওয়াবে বললো, "শূকর!" ঈসা (আ.) বললেন, "শূকর হোক।" লোকেরা দরজা খুলে দেখলো হায়! সব শূকরে পরিণত হয়ে রয়েছে। এতে জনবসতির মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। ঈসা (আ.)-এর মা বিবি মরিয়ম তাকে নিয়ে গাধার পিঠে করে মিশরের দিকে পালালেন"।

আতা থেকে বর্ণিত

যখন মেরী ঈসা (আ.)-কে স্কুলের বিদ্যা শেষে ঘরে নিলেন তাঁকে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করতে চাইলেন। অবশেষে একজন রং এর কার্যকারীর নিকট তাঁকে

নিয়োজিত করলেন যাতে তিনি এটা শিখতে পারেন (মনে রাখা ভালো, ঈসা (আ.) স্কুলে তৌরাতের জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেন । তাঁর মা কিংবা তিনি নিজে তৌরাতের জ্ঞান বেচে খেতে রাজী হন নি। তাই খাওয়া পরার প্রয়োজন পূরণের জন্য দুনিয়াবী পেশা শিক্ষা করা প্রয়োজন মনে করলেন। বিবি মরিয়ম জানতেন তাঁর ছেলে নবী হবেন। তথাপি তিনি তাকে দুনিয়াবী শিক্ষা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। যারা দ্বীনি কাজে নিয়োজিত থেকে দুনিয়া কামানোর চেষ্টা করছেন কিংবা যারা দ্বীনি পুস্তক লিখে কপি রাইটের স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন তাঁরা কি এ থেকে কোন শিক্ষণীয় বিষয় দেখতে পাচ্ছেন ? অপর দিকে সকল ঈমানদার ভাইয়ের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা যেভাবে খাওয়া-পরাকে জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করছি তেমনি কোরআন-সুন্নাহ্র মৌলিক জ্ঞানার্জনকেও যেন এর চাইতে অধিক প্রয়োজনীয় মনে করি)। যিনি ঈসা (আ.) কে রং-এর কাজ শিখানোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি একদিন বাইরে ভ্রমণে যাবার পূর্বে ঈসা (আ.)-কে ডেকে বললেন, "আমি দশদিনের আগে ভ্রমণ থেকে ফিরবোনা। এখানে অনেকগুলো কাপড় আছে। কাপড়গুলোর কোনটাতে কোন রং হবে তা আমি নির্দ্ধারণ করে চিহ্নিত করে রেখেছি। সেই অনুযায়ী কাপড়গুলোকে আমি ফিরে আসার পূর্বেই রাঙ্গিয়ে রাখবে।" একথা বলে তিনি চলে গেলেন। হযরত ঈসা (আ.) সবগুলো কাপড়কে একটি পাত্রে রেখে বললেন, "তোমাদের যাকে যেই রং ধারণ করার আশা করা গেছে তোমরা জিহোভার ইচ্ছায় সে সেই রং ধারণ করে থাক।" যখন লোকটি ফিরে আসলেন বললেন, "ঈসা কি করেছ ?" বললেন, "ঐ পাত্রে।" লোকটি বললেন, "সব কাপড়ই কি ঐ একটি পাত্রে ?" ঈসা (আ.) বললেন, "হ্যাঁ"। লোকটি বললো, তা কিভাবে হবে (সব এক পাত্রে থাকলে সব কাপড়ই একই রং-এর হবে ফলে) সব কাপড় নষ্ট।" ঈসা (আ.) বললেন, দেখুন। এর পর তিনি একটা হলুদ কাপড় একটা সবুজ কাপড়, একটা লাল কাপড় এভাবে যেই কাপড় যেভাবে রং করার নির্দেশ ছিল সেভাবে বের করলেন। তখন সেই রংকারক ব্যক্তি বললেন, "তিনিই মহান যিনি জিহোভা।" অতঃপর লোকটি হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীতে পরিণত হলেন। তাঁর প্রতি এবং জিহোভার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করলেন।"

"ঈসা (আ.)-এর বাল্য কালেই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে হযরত ইয়াহইয়া (আ) ইসসেনীদের ত্যাগ করে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" উটের পশমের তৈরী সাধারণ পোশাক পরে কোমরে চামড়ার বেল্ট পরে, ফড়িং এবং বনমধু খেয়ে জীবন ধারণ করছেন" (মথি, ৩ ঃ ৪)। তিনি সরাসরি দৈববাণী প্রচার শুরু করলেন এবং ইসসেনী ভ্রাতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ সাধনা ব্যতিরেকেই লোকদেরকে তাঁর (হযরত ইয়াহ্ইয়ার) অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছিলেন। সুতরাং তিনি এক

আন্দোলনের সূচনা করলেন। তিনি লোকদেরকে একমাত্র জিহোভামুখী হতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, জিহোভার রাজত্ব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে।

জোসেফাস তিন বছর মরুভূমিতে নিরাপদ (লোক সংসর্গহীন) জীবন যাপন করেছেন। তখন তিনি একজন ধর্মীয় গুরুর তত্ত্বাবধানে ছিলেন যার নাম ছিল বান্নাস। তিনি গাছের পত্র-পল্লব দিয়ে দেহ্ ঢাকতেন, বন্য ফল-মূল খেতেন এবং প্রত্যহ শীতল পানিতে গোসলের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতেন। এ থেকে এটা ধরে নেয়া যায় ইয়াহইয়া (আ.) এ ধরনের সুশৃঙ্খল নিরাপদ জীবন যাপন করতেন যা তৎকালীন এ জাতীয় ধর্মগুরুদের (যাদেরকে Hermit বলা হয়) মধ্যে সাধারণ প্রচলন ছিলো। এই বন্য জীবনই ছিলো তাঁর পূর্বেকার নবীদের এবং দাউদ (আ.) এর আশ্রয় স্থল। এ অবস্থাতেই ইয়াহুদীরা বিদেশী আগ্রাসনের প্রভাবমুক্ত হয়ে একমাত্র জিহোভামুখী হতে পারতো এবং মিথ্যা দেবতাদের পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকতে পারতো।

এই বন্য মরুময় জীবনেই তারা পার্থিব লোভ-লালসামুক্ত শিরকবিহীন জিহোভার ইবাদাত করতে সক্ষম হতো। এমতাবস্থায় কেবল জিহোভার উপরই নির্ভরতা বাড়তো। এটাই ছিলো একত্ববাদের মূল বক্তব্য। মরুময় বন্য জীবনের অনিশ্চয়তা মিথ্যা খোদার তথা পার্থিব উপায় উপকরণের মিথ্যা নিরাপত্তাবোধকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতো। এতে একজন মানুষ প্রকৃত বাস্তব স্রষ্টার উপর একান্তই নির্ভরশীল হতে শিখতো।

যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র জিহোভার ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করতে চায় তবে তা সম্ভব কেবল তখনই যখন সে তার আভ্যন্তরীণ অপশক্তি তথা রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয় (আমাদের আত্মশুদ্ধির মূল বক্তব্যের সাথে কি চমৎকার সাদৃশ্যই না প্রত্যক্ষ করছি। আসলে সকল নবীই এই আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির কাজ শিখিয়েছেন)।

ইতিহাসের প্রথম থেকে আমরা দেখি ইয়াহুদীগণ তাদের নিজেদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা তা করতো এজন্য যে তাদের রাজা-বাদশাহগণ সদা প্রভু জিহোভার ইচ্ছানুযায়ী চলতোনা। (কিংস, ১৩ ঃ ১১)) বেবিলনের বাদশাহ নেবুচাঁদ নাজ্জার* জেরুজালেম দখল করলো। প্রথমতঃ ইবাদতগাহ এবং তার সম্পদ এবং তাদের রাজাদের সম্পদ অক্ষত অবস্থায় বেবিলনীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকলো। এমতাবস্থায় ইয়াহুদীগণ শীঘ্রই বেবিলনীয়দের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করলো। এবার বেবিলনীয়রা তাদের ইবাদতগাহ্ ধ্বংস

* বুখ্ত-ই-নাসের।

করলো, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করলো, তাদেরকে দাসে পরিণত করলো। অনেককে তারা বেবিলনে নিয়ে গেলো দাস হিসাবে।

তাদের ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরলো। ইরানের সাইরাস বেবিলনীয়দের পরাজিত করলো এবং ইয়াহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলো। ইয়াহুদীরা এবার আবার ষড়যন্ত্র শুরু করলো। সাইরাস বেবিলনে এত অধিক সংখ্যক ইয়াহুদীর উপস্থিতিকে বিপজ্জনক মনে করলো। সুতরাং সাইরাস তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরে যেতে সাহায্য করলো এবং আল-আকসা ইবাদাতগাহ্ (আল-আকসা মসজিদ) পুনর্নির্মাণে সাহায্য করলো।

জেরুজালেমগামী এই শোভাযাত্রায় ৪২,৩৬০ জন ইয়াহুদী ছিলো, অধিকন্তু তারা তাদের সাথে বহন করেছিলো ৭,৩৩৭ জন চাকর এবং মহিলা। এদের মধ্যে ছিলো ২০০ গায়ক-গায়িকা। তাদেরকে বহন করছিলো ৭৩৬টি ঘোড়া, ২৪৫টি খচ্চর, ৪৩৫টি উট এবং ৬৭২০টি গাধা। (এজরা, ৬৪-৬৯)

জেরুজালেম-এ পৌঁছে তারা আল-আকসা ইবাদাতগাহ্ পুনর্নির্মাণ শুরু করলো, এজন্য তারা ৬১০০০ ড্রাম (Dram) স্বর্ণ এবং ৫০০০ পাউন্ড রৌপ্য ব্যয় করলো। এগুলি ছিলো সেই সম্পদের অতিরিক্ত যা তারা বেবিলন থেকে বহন করেছিলো এবং এর পরিমাণ ছিলো ৩০ ঘোড়ার বোঝা পরিমাণ স্বর্ণ এবং ১০০০ ঘোড়ার স্বর্ণ ও রৌপ্য। তদুপরি ইবাদাতগাহে তারা রেখেছিলো ৫৪০০ স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র। (এজরা, ১ ঃ ৯-১১)

এই দাসরা যারা বেবিলন থেকে ফেরৎ আসলো তারা সম্পদে ও সংখ্যায় আধিক্য অর্জন করলো। কিন্তু জেরুজালেমের শাসক হিসাবে ইয়াহুদীগণ বেশিদিন শান্তি ভোগ করতে পারলোনা। আলেকজান্ডার জেরুজালেম দখল করে। ৩২৩ খৃষ্টপূর্ব অব্দে ইন্ডিয়াতে পৌঁছার পূর্বেই আলেকজান্ডার মৃত্যু বরণ করলে তার সেনাপতিগণ সাম্রাজ্যকে তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে রাজধানী স্থাপন করে টলেমী তার অংশ শাসন করলো। সেলুসিয়ান সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের রাজধানী হলো এ্যান্টিয়ক এবং বোবলন থাকলো আলেকজান্ডারের বাকী সম্রাজ্যের রাজধানীরূপে। টলেমীয় এবং সেলুসিয় শাসকরা পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত থাকলো। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ যা ঘটে তাহলো যারা রাজনীতি বিমুখ এবং ধর্ম পরায়ণ তাদের নিকট বিষয়টা দেখা দিলো কে জিহোভার অধিক নিকটবর্তী।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটে ইয়াহইয়া (আ.)-এর জিহোভার দিকে প্রত্যাবর্তনের উদাত্ত আহ্বান বিরাট সংখ্যক মানুষের মন জয় করতে শুরু করলো। তিনি ইসসেনীদের

একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি (যা ইসলামের ক্ষেত্রে বিতানাতের নীতি) পালন করতে ব্যর্থ হলেন। নীতিটি ছিলো "মৃত্যু মুখে পতিত হলেও সদস্যদের গোপনীয় বিষয় অ-ইসসেনীদের নিকট তা প্রকাশ না করা।"

গোপনীয়তার এই নীতি অনুসরণে ব্যর্থ হওয়ার রোমকদের জন্য হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর মূল আন্দোলনে তাদের "চর" ঢোকানো সহজ হয়ে যায়। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তার নবীসুলভ হিকমতের জ্ঞানে এই চরদের চিনতেন। (যেমন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) মোনাফিকদের চিনতেন) তিনি তাদেরকে বলতেন, "VIPER" (বিষাক্ত সাপ) (মথি ৩ ঃ ৭)।

হযরত ঈসা (আ.) যিনি ছিলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ভাই এবং বয়সে ছোট-তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি তার হাতে প্রথম বাপ্তাইজ হন। এটাও বিচিত্র নয় যে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথীদের মধ্যে বারনাবাসও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অপর সাথী মথিয়াস সম্পর্কেও এই ধারণা হয়। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে তাঁর আন্দোলন যথাযথ ফললাভের আগেই "চর"দের ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর বাপ্তাইজ হওয়াতে তিনি খুশি হলেন। কারণ তিনি ভাবলেন তাঁর ওফাতের পরও তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মত যোগ্য লোক থেকে যাবে। হযরত ইয়াহইয়ার অন্তর্দৃষ্টিকে সত্যে প্রমাণিত করে রোমান সম্রাট তাঁর শিরচ্ছেদ করে। সুতরাং আন্দোলনের পরিপূর্ণ দায়িত্বের যোঁয়াল এসে পড়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর কাঁধে। ইত্যবসরে হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স হয় ৩০ বছর।

তাঁর নবুয়ত প্রচার তথা আন্দোলন পরিচালনার সময়কাল তিন বছরের বেশি ছিলো না। তিনি বুঝলেন তাঁর প্রস্তুতির সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল উপস্থিত। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের এই সময়কার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে ইয়াহুদীদের তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। ইসসেনীদের উপস্থিতি, ইয়াহইয়ার (আ.) আন্দোলন এবং রোমান ও ঈসা (আ.)-এর দ্বন্দ্ব এ সব মিলে এমন একটা ঘটনা পরম্পরা এবং রাজনৈতিক সামাজিক দৃশ্যপট ফুটে ওঠে যা বার বার ইয়াহুদী ইতিহাসে ঘুরে ঘুরে আসছে। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যখন বহিঃশত্রু কিংবা আগ্রাসী শক্তি ইয়াহুদীদের শিরক করতে বাধ্য করতো তখনই ইয়াহুদীরা তাদের এই আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো কারণ ইয়াহুদীরা মনে করতো একমাত্র জিহোভার ইবাদত ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যায় না এবং একমাত্র জিহোভার আইন ছাড়া আর কোন আইনের আনুগত্য করা যায়না (আসলে প্রকৃত

একত্ববাদের ইতিহাসই এটি। যদি যত্নসহকারে কেউ দুনিয়ার ইতিহাস ঘাঁটে এই সত্য তার নিকট অবশ্যই ধরা পড়বে।)

শাসক হিসাবে ইয়াহুদীরা কখনও সফল ছিলোনা (এখনও তাই)। মিশরীয়-গ্রীক (টলেমী)-দের সময় তারা ইয়াহুদের বিশাল জনতার এক যায়গায় থাকা পছন্দ করলো না। তারা তাদেরকে দলে দলে মিশরে হিজরত করতে বাধ্য করলো। এর ফলে ইসরাঈল রাষ্ট্রের বাইরে মিশরই হলো ইয়াহুদীদের সর্ববৃহৎ আবাসস্থল। এখানে তারা গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসলো। এখানে তাদের সকল হিব্রু ধর্মীয় গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় অনূদিত হলো। টলেমীয়রা ইয়াহুদীদের থেকে কিছু খাজনা গ্রহণ করে বাকী কাজ-কর্ম তাদের নিজেদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলো। কারণ তারা এদেরকে দূরবর্তী জনগোষ্ঠিরূপেই মনে করতো।

১৯৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে টলেমীয়দের থেকে সেলুসিয়ানরা জেরুজালেম দখল করে নিলো। এই সেলুসিয়ানদের নিকট জেরুজালেম কাছের প্রদেশ মনে হলো। সুতরাং তারা টলেমীয়দের চাইতে ইয়াহুদীদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অধিকতর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেলো। টলেমীয়দের সময় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক গতিতে হেলেনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি তাদের মধ্যে প্রবেশ করছিলো। কিন্তু সেলুসীয়ানরা এই অনুপ্রবেশকে দ্রুত ত্বরান্বিত করলো। একাজ তারা সজ্ঞানেই করছিলো যাতে জিহোভামুখী একত্ববাদী ইয়াহুদীদেরকে মুশরিক-পৌত্তলিক জীবন ধারায় অভ্যস্ত করা যায়। (এখন যেমন বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে এ অঞ্চলের তৌহিদী জনগোষ্ঠির মধ্যে পৌত্তলিক হিন্দু রীতি-নীতি প্রবেশ করানোর মারাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে)। এ্যন্টিয়কাস ইপিপ্লিয়ানাস-এর সময় এই অনুপ্রবেশ সর্বাধিক ত্বরান্বিত করা হয় (আমাদেরও কোন কোন বিশেষ সরকারের আমলে সরকারী পৃষ্ঠাপোষকতায় ও তথাকথিত আঁতেলদের সহযোগিতায় একাজ দ্রুত চলে)।

এই এ্যন্টিয়াকাস ইপিপ্লিনিয়াস-এর সবচাইতে মারাত্মক ভুল হয়েছিলো যে, সে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মস্জিদে (মস্জিদুল আক্সাতে) "জিয়াস" দেবতার এক মূর্তি স্থাপন করলো। এতে সমগ্র ইয়াহুদী জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো এবং তারা জুদা মেক্কাবির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো (হায়! মাত্র একটা মূর্তিতেই তৎকালীন তৌহিদবাদী ইয়াহুদীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। অথচ আজকের তৌহিদবাদী বাংলার মুসলিম শতসহস্র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখেও চেতনায় ফিরে আসছেনা। কেবলমাত্র কুকুরের চেহারায় দাঁড়ি ফিট করাতে এবং মাথায় টুপি লাগানোতে একটুখানি ক্ষেপে গিয়েছিলো, এই যা! অপর একটি সত্য কথা চুপি চুপি বলছি, "দাঁড়ি টুপি যদি শুধু ইসলামের চিহ্ন হতো তা হলে ক্ষেপতো না, ক্ষেপেছে কারণ এগুলো কায়েমী স্বার্থবাদী মোল্লাদেরও একমাত্র সম্বল বলে)।

হাতুড়ি ছিল তাদের বিদ্রোহের প্রতীক। এতে গ্রীকদের তাড়িয়ে দিতে তারা সক্ষম হয়েছিলো। বিদ্রোহের দাঙ্গায় শেষ পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মসজিদ পুড়ে ধ্বংস হলো। তারা তৌরাতের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ মস্জিদ পুনর্নির্মাণ করলো। তাদের বিপ্লবের নেতারা এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করল যে তারা একাধারে ইবাদাতগাহের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্বের ধারক-বাহকে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু এই নতুন শাসকরা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ায় অতি উৎসাহে ইয়াহুদী ধর্মের কঠোর আইনসমূহের যদৃচ্ছ ব্যবহার শুরু করলো।[৩] এতে সাধারণ ইয়াহুদী জনতা আবার পূর্ববর্তী পৌত্তলিক গ্রীকদের উদার শাসনকে মনে মনে কামনা করতে লাগলো। (যেমন, আফগানিস্তানে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠার পরপরই কিছু কিছু ইসলামী অনুশাসনের অত্যধিক কড়াকড়ি কিছু কিছু লোকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো)। জনমনের এই অসন্তুষ্টি অনুধাবন করে শাসক ম্যাক্বাবী নিজকে সংশোধন না করে বরং আরও কঠোর হঠকারী এবং একগুঁয়েমির পরিচয় দিতে শুরু করলো।[৪] (আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মোহাম্মদ (স.) বলেছেন," দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা)"। ইয়াহুদী জনতা আবারও তাদের নিজেদের শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং তাদের এই ষড়যন্ত্রের কারণেই রোমানরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্ষমতা কর্তৃত্ব জেরুজালেম-এর উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থাতেই ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়।

রোমানরাও পুনরায় তাদের পূর্ববর্তী গ্রীক শাসকদের ভুল পুনরাবৃত্তি করলো। তারাও বিশাল এক স্বর্ণ নির্মিত ঈগল বসিয়ে দিলো সোলায়মানের মসজিদের একেবারে সদর দরজায় (ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না)। এতে ইয়াহুদীরা পুনরায় বিক্ষুব্ধ হলো এবং ক্রমাগত বিদ্রোহ শুরু করলো। ক্ষমতাচ্যুত শাসক ম্যাক্বাবীর দুই অধঃস্তন পুরুষই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলো। তাদের লক্ষ্য ছিলো ঐ স্বর্ণ ঈগল ভেঙ্গে ফেলা। রোমানরা ইয়াহুদীদের অপমানিত করতে এবং মানসিকভাবে অধিক শাস্তি দিতেই এ কাজ করেছিলো। তাই প্রচুর রক্তপাত করে রোমানরা ঐ বিদ্রোহকে দমন করেছিলো। বিদ্রোহীদের দুই নেতাই ধৃত হলো এবং জীবন্ত দগ্ধ করে তাদের মারা হলো। এতে আরো একটা বড় বিদ্রোহ হলো এবং এবার দুই হাজার বিদ্রোহীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হলো।

৩. জনাব আতাউর রহীম-এর এ বর্ণনার সাথে আমরা একমত নই। আল্লাহ্‌র আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলেই অনেকে একে কঠোর প্রয়োগ বলেন। আমরা এরূপ ব্যাখ্যা যথাযথ মনে করি না।

৪. জনাব আতাউর রহীম-এর এ বর্ণনার সাথে আমরা একমত নই। আল্লাহ্‌র আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলেই অনেকে একে কঠোর প্রয়োগ বলেন। আমরা এরূপ ব্যাখ্যা যথাযথ মনে করি না।

পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও রোমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের ঘৃণার আগুন জ্বলছিলো। তাই খৃষ্টীয় ৬ অব্দে সম্রাট অগাষ্টাস যখন ইয়াহুদীদের উপর অতিরিক্ত করারোপের জন্য আদম শুমারির নির্দেশ দিলো তখন তাদের অসন্তোষ তুঙ্গে উঠলো। বিদেশী আগ্রাসী শক্তিকে কর দেয়া ছিলো তাদের ধারণামতে তৌরাতের অনুশাসনের বিরুদ্ধে। ইয়াহুদীরা কেবল একজনকেই শাসক মানত আর তিনি হলেন সদাপ্রভু জিহোভা। এমতাবস্থায় তৎকালীন ইয়াহুদী সমাজের ধর্মীয় চিন্তামুক্ত তথাকথিত উদারনীতির ধারকরা সমূহ বিপদ অনুভব করলো। তারা বুঝলো কর অস্বীকারের পরিণতিতে রোমান খড়গ তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবে (এখনও মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত উদারনৈতিক ধর্মবিমুখ দুনিয়া পূজারী গোষ্ঠি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃত্বের ধারক-বাহক দল মনে করে বিশ্ব বেহায়া বড় শয়তান আমেরিকার সাথে হাত না মেলালে মুসলমানরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা নানা ছলে নানা অজুহাতে আমেরিকাকে অন্ধ অনুকরণ এবং সহযোগিতা দিয়েই যাচ্ছে)। যারা এভাবে ধর্মীয় নীতি বিসর্জন দিয়ে পৌত্তলিক রোমানদের থেকে শান্তি কেনার ব্যবস্থা করছিলো খাঁটি তৌহিদবাদীরা তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলেই মনে করতো। (এখনও তাই মনে করা হয়)।

হযরত ঈসা (আ.) ইতিহাসের যে অধ্যায়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেই সমাজে তিনি তাঁর শিশুকাল এবং কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছেন তার বাস্তব চিত্র এক্ষণে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর শাহাদাতের পর ইয়াহুদীদের সাথে রোমানদের দ্বন্দ্বের সব ঘটনাই ঘটে নবুওয়্যতী ধারার তৎকালীন একমাত্র ব্যক্তিত্ব ঈসা (আ.) কে ঘিরে।

দায়িত্ব আসার পর অন্য কিছু করবার আগে ঈসা (আ.) ৪০ দিন বনে একাকিত্বে জিহোভার সান্নিধ্যে কাটালেন। এ অবস্থায় তাঁর বয়স ৩০ পূর্ণ হলো। এ বয়সেই ইয়াহুদী ধর্মীয় নীতিতে একজন তার পিতার কর্তৃত্ব মুক্ত হয়। হজরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর মত তিনি খোলা যায়গায় অধিক জনসমাগমে শিক্ষা দিতেন না। তিনি গোপন আস্তানাতে বিশ্বাসীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। রোমানদের মোকাবেলায় সুচিন্তিত সুচারু প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিলো। সাম্প্রতিক বিপর্যয়সমূহ এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর মৃত্যুর স্মৃতি তাঁর মনে দগদগে জাগ্রত ছিলো। অত্যন্ত দূরদৃষ্টি এবং বাস্তবসম্মতভাবেই তিনি ইয়াহুদীদের সংঘটিত করছিলেন। তিনি কাউকে সরাসরি বাপ্তাইজ করতেন না। কারণ এতে রোমানদের দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হতোনা। রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিরোধ আন্দোলনে বাপ্তাইজ করার খোলাখুলি পদ্ধতি "চর" অনুপ্রবেশ-এর সহায়ক হতো। ইসরাঈলদের বার গোত্রের বার প্রতিনিধির সমার্থক ১২ জন এর একটি নিকটবর্তী অনুসারীদল তিনি নিযুক্ত

করলেন। এদের প্রত্যেকের নেতৃত্বে ছিল ৭০ জনের বেশি "পেট্রিয়ট" বা স্বদেশী। ফরিসীয়রা সর্বদাই দূর গ্রামের বিত্তবানদের সহায়ক ছিলো। এই দূরগ্রামের বিত্তবানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ভক্তে পরিণত হলো। এই ভক্তদেরকেই জিলট বলা হতো। বাইবেল অনুযায়ী ১২ জন হাওয়ারীর মধ্য থেকে অন্ততঃ ৬ জন জিলট ছিলো। ঈসা (আ.) তৌরাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছেন, নাকচ করতে নয়। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, "যে কেউ জিহোভার আইনে অবনত অনুসারী এবং চুক্তি রক্ষাকারী তাদেরকেই আমার অনুসারী হতে দাও।"

এক বিরাট দল তাঁর অনুসারী হল কিন্তু তাদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ড রাখা হল এবং বনে-জঙ্গলে-মরুভূমিতে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে লাগলো। এ অনুসারীদেরকে বলা হতো "বার ইয়েনিম" বা জঙ্গল পুত্র। তাদের মধ্যে যারা অস্ত্র চালনা শিখেছিলো তাদেরকে "শিকারী" বা অস্ত্রদল বলা হতো। এদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠিকে অধিকতর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হলো এবং এদের নাম রাখা হলো "বার জেসাস" ঈসা পুত্র। ইতিহাসে অনেক "বার জেসাস" এর উল্লেখ আছে বটে তবে এদের নাম জুড়ে সর্বত্র রয়েছে রহস্যঘন কথাবার্তা। যথাযথ কোন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ নেই। এই অবস্থাটা বুদ্ধির অগম্য নয়। কারণ তারা ছিলো ঈসা (আ.)-এর ঘনিষ্ট জন এবং গোপনীয়তাই ছিলো তাদের মূল দায়িত্ব।

জেসাস মানে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের জন্য নির্দেশ জারি করলেন যে, "যার থলে আছে সে তা নিক এবং সেই সাথে সম্পদও আর যার তরবারি নেই সে তার বস্ত্র বিক্রি করে তরবারি খরিদ করুক।"(যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের তাগাদায় হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষ্য লক্ষ্য করুন। এর সাথে পবিত্র কোরআনে পড়ুন 'তোমরা তোমাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে দুশমনের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাক' আয়াত ৮ ঃ ৬০ এবং 'যদি তারা যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো তবে অবশ্যই তারা কোন না কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতো' আয়াত ৯ ঃ ৪৬। যে সব ঈমানের দাবীদার সারা জীবন কেটে যায় অথচ তারা নিজ দেহ গঠন কর্ম এবং অস্ত্র-চালনার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা থেকে একদম গাফিল তারা কতখানি মারাত্মক ভ্রমে নিপতিত এর থেকে কি কিছুই আন্দাজ করা যায় না)? এদিকে তাঁর (হযরত ঈসা (আ.)-এর) শিক্ষায় এবং অনুপ্রেরণায় এবং অলৌকিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ দর্শনে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তাঁর এই কার্যক্রমের সরাসরি ফল হল কেউ মনে করেন (যেমন গীর্জায় ফাদার লেক্টানিয়াস) তাঁর ত্যাগী অনুসারীদের সংখ্যা হয় নয়শত। অপরদিকে জেরীসোফিয়াস-এর হিব্রু ভাষায় লিখিত অধুনালুপ্ত এক লেখায় এই ত্যাগী সদা জাগ্রত অনুসারীদের সংখ্যা ২০০০ থেকে ৪০০০

বলে উল্লেখ করা হয়। (এখানে স্মরণ রাখা দরকার মোল্লা ওমর এবং উসামা-বিন-লাদেন এর সশস্ত্র সদা জাগ্রত সঙ্গীদের সংখ্যা এ সময়ে পৃথিবীর এ জনশক্তির তুলনায় এবং শয়তানী সামরিক শক্তির তুলনায় অবশ্যই অনেক অনেক বেশি হওয়া দরকার, দুই/চার/ছয় হাজার কোন সংখ্যাই নয়। তাগুত উৎখাতকারী প্রকৃত আল্লাহ্‌র সৈনিকরা অবশ্যই বিষয়টার গুরুত্ব দিবেন।)

ঈসা (আ.) অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন যাতে তিনি মূসা (আ.)-এর শরিয়তের নিয়ম বিধান থেকে বিচ্যুত না হন। তিনি তাঁর নবুওয়্যতি কর্মময় জীবনে কখনও তাঁর কোন অনুসারীকেই তাঁর শিক্ষা একত্রে প্রকাশ করেননি। তাঁর পরিপূর্ণ শিক্ষা অল্প কজনই জানতো।

"তোমাদের বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে। এখনও তোমরা তার সব বহন করার ক্ষমতা রাখনা। তবুও যখন সত্যের আত্মা তোমাদের মাঝে আসবেন তিনি তোমাদেরকে পরিপূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে যাবেন। তিনি তাঁর নিজ থেকে কিছুই বলবেন না। তিনি যে সত্য (জিহোভার বা আল্লাহ্‌র) থেকে শুনবেন তাই তিনি শোনাবেন। অর্থাৎ তিনি অহীর ভিত্তিতে কথা বলবেন। (জন, ১২-১৪)

(অনেকে গস্‌পেল-এর এই বাক্য কটিকে মোহাম্মদ (স.)-এর আগমন সম্পর্কিত ঈসা (আ.)-এর ঘোষণা মনে করেন)।

তিনি পার্থিব ক্ষমতা তা দেশ চালনার শাসন কর্তৃত্বের হোক কিংবা গীর্জার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং ফরিসীদের কর্তৃত্ব হোক- কোনটাই চাইতেন না। কিন্তু তাঁর প্রতি সাধারণ গণমানুষের সমর্থন এবং তাঁর কথায় লোকদের উঠা-বসা তৎকালীন ইয়াহুদী ধর্মীয় পন্ডিত ও রোমীয় শাসকরা নিজেদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর মনে করছিলো এবং তারাই বলে বেড়াচ্ছিলো যে ঈসার উদ্দেশ্য হলো জাগতিক ক্ষমতা কর্তৃত্ব দখল করা।

(সকল নবী (আ.) দের এবং প্রতিটি খাঁটি দ্বীনি আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমাজের ক্ষমতা-কর্তৃত্বের অধিকারী কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা ঐ একই অভিযোগ তুলেছে, তুলছে এবং তুলবে, কারণ, প্রত্যেকে নিজ মনের আয়নার অন্যকে বিবেচনা করে)।

তাদের এই মনের ভয়ই হজরত ঈসা (আ.) কে বিচারের কাঠগড়ায় রাজদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে দাঁড় করাতে উদ্বুদ্ধ করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর সমগ্র শিক্ষাই ছিলো জিহোভার নির্দেশমত মানুষ যেন কেবল তাঁরইমুখী হয়ে কেবল তাঁরই এবাদত করে। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা যেই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তা ছিলো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদেরকে তাঁদের নির্দিষ্ট দ্বীন থেকে ফিরানোর চেষ্টা করবে।

রোমানদের প্রতি অনুগত ইয়াহুদীদের সাথে তাঁর প্রথম যুদ্ধ হয় (মোনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যাবেনা- যারা বলেন তারা এখানে কোন আলো পাচ্ছেন কি?) বার-জেসাস বা ঈসা-পুত্র বারাব্বাস এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এতে এই দল নিশ্চিহ্ন হয়। বারাব্বাস বন্দী হন।

ঈসা (আ.)-এর পরবর্তী টার্গেট ছিল সোলায়মান (আ.)-এর মসজিদকে রোমীয় কর্তৃত্ব মুক্ত করা। কিন্তু মসজিদের নিকটেই রোমানরা এক শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিলো। ইয়াহুদী ধর্মীয় উৎস পাস্‌ওভার-এর সময় নিকটবর্তী হচ্ছিলো, রোমীয়রা বছরের অন্যান্য সময় যেমন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছিলো এই সময়ে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করলো। এছাড়া মসজিদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনীকেও সতর্কাবস্থায় রাখা হলো। এই সতর্ক কড়া পাহারার মধ্যে এমন দক্ষতা এবং কৃতিত্বের সাথে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে মস্‌জিদে (সোলায়মান (আ.) এর মসজিদে) ঢুকে পড়লো এবং মসজিদের নিয়ন্ত্রণ দখল করলো। এতে রোমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। ঈসা (আ.)-এর মসজিদের এই নিয়ন্ত্রণ লাভই "মসজিদ পবিত্রকরণ' নামে খ্যাত। জন এর সুসমাচার বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করে—

সোলায়মান (আ.) এর মসজিদে হযরত ঈসা (আ.) দেখলেন ষাঁড় বিক্রেতাদের, ভেড়া বিক্রেতাদের এবং কবুতর বিক্রেতাদের দল, তিনি তাদেরও দেখলেন যারা অর্থের বিনিময় করতো। তিনি বেত্রাঘাত করে তাদের সকলকে তাড়ালেন। ভেড়া, ষাঁড়, কবুতর কোন কিছুকেই থাকতে দিলেন না, অর্থবিনিময়কারীদের টেবিল উল্টিয়ে ফেললেন। (জন, ২ ঃ ১৪-১৫)

"বেত্রাঘাত" এবং "টেবিল উল্টানোর" মতো সুসমাচারে উল্লেখিত শব্দের উপস্থিতি জনাব কারমাইকেলকে নিম্নোক্ত মন্তব্য করার প্রয়াস জুগিয়েছে—

এ শব্দগুলি নিঃসন্দেহ "ভাংচুর" এর সমার্থক, সাথে সাথে এ বিষয়টিকে নিরীহ-নির্দোষ দেখানোর প্রয়াসও বটে। অথচ বাস্তব ছিলো এক প্রচন্ড হৈ-হট্টগোল এবং জ্বালাও-পোড়াও ব্যাপার। আমরা যদি শুধু মসজিদ এলাকার বিশাল আয়তন এবং এতে ঠাঁসাঠাঁসি লোক সমাগত, পুলিশ পাহারাদার ও রোমীয় সৈন্যদের উপস্থিতি, ষাঁড়-ভেড়া বিক্রেতাদের হৈ-হুল্লোড় এগুলোকেও কল্পনা করি, অর্থবিনিময়কারীদের কথা না হয় বাদই দিলাম তথাপি এর যে চিত্র ভেসে উঠে তাতে একে সামান্য কোন বিষয় বলে মনে করা ঠিক হবে না। "বেত্রাঘাত ও "টেবিল উল্টানোর" মত দু'একটা টুকরা খবর-এর পিছনে যে দৃশ্য লুকিয়ে আছে তা আমাদের সুসমাচার লেখকদের বিষয়টি নরম-নিরীহ দেখানোর এবং আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের প্রয়াস বললে অত্যুক্তি হবেনা।

যে কোন স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল স্থানীয় পুলিশ পাহারাদাররা স্ব-গোত্রীয়দের কার্যকলাপকে উপেক্ষা করে, আড়াল করে এবং তাদের প্রতি দয়ার্দ্র থাকে। তেমন কোন বিষয় এক্ষেত্রেও কাজ করে থাকবে (সুতরাং যারা তাগুত উৎখাতকারী, শয়তানী শক্তির মোকাবেলাকারী তারা তাদের স্ব-ধর্মী সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীকে পূর্ব থেকেই কাফির মুশরিক মুর্তাদ ঘোষণা দিয়ে শত্রুতে পরিণত করা মোটেই ঠিক হবে না। বরং দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করলে দেখা যাবে তাগুতের অস্ত্র এই আর্মি ও পুলিশ বাহিনীই ঠিক সময়ে তৌহিদবাদী জনতার সাথে একাত্ম হয়ে তাগুতকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে। যেমনটি ঘটেছে এক্ষেত্রে, যেমনটি ঘটেছে ইরানের বিপ্লবে)।

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর দলের হাতে সোলায়মান (আ.) মসজিদের পতন এবং রোমানদের অকৃতকার্যতার জন্য সম্ভবতঃ এটিও একটা কারণ হিসাবে কাজ করেছে।

রোমানদের সাময়িক সীমিত পরাজয় ঘটেছিলো। তাদের পূর্ণ শক্তি চূর্ণ হয়নি। তারা কেন্দ্র ও অন্যস্থান থেকে পুনরায় বিপুল সংখ্যক সামরিক শক্তির জেরুজালেমমুখী অগ্রাভিযান ঘটালো। এই বিশাল সামরিক শক্তির প্রতিরোধ আল্আকসা মসজিদের সদর দরজা অল্প কয়দিনেই কাবু হয়ে গেলো। আর এদিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রায় সকল সঙ্গী সুযোগমত জনতার কাতারে মিশে হাওয়া হয়ে গেলো। এমনকি তাঁর খাস অনুসারীরাও পালাল। কেবলমাত্র গুটি কয়েক প্রাণ উৎসর্গী তাঁর সাথে রয়ে গেলো। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর ঐ অল্প কয়জন সহচরসহ আত্মগোপন করলেন। আর রোমানরা তাদের খুঁজে বের করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলো।

হযরত ঈসা (আ.)-এর "বন্দী" হওয়া, "বিচারের সম্মুখীন" হওয়া এবং "শূলে" চড়ার বিষয়গুলি বিভিন্ন বিপরীতমুখী বর্ণনা এবং দাবীর মুখে ঘুরে-ফিরে এমন অন্তহীন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিলো যে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া এক প্রকার প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো, এসবের মাঝে যে কথাটি সবার উপর সত্য হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিলো তা'হলো রোম সরকার ইয়াহুদীদের ক্ষুদ্র কায়েমী স্বার্থবাদীদের সহায়তায় তাদের শাসন কর্তৃত্বকে জেরুজালেমের উপর শক্ত করে জেঁকে বসালো এবং তার স্থায়িত্বে নিতে সক্ষম হলো।

(জুদাস ইস্কারিয়ট) নামে হজরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের একজনকে রোমীয়রা মাত্র ৩০টি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করতে সক্ষম হলো। তার প্রতিশ্রুতি ছিলো ঈসা (আ.)-এর অবস্থানকে চিনিয়ে দেয়া। খুব বেশি গন্ডগোলের আশঙ্কায় রাত্রে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ঈসা (আ.) যেখানে তার গুটি কয়েক সহচরসহ ছিলেন, সেস্থানে গিয়ে জুদাস-এর দায়িত্বে ছিলো তাঁর হস্ত-চুম্বন করা

যাতে করে রোমান সৈন্যরা নিঃসন্দেহে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু তাদের ধূর্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সৈন্যরা যখন রাতের অন্ধকারে তাদের অভিযান পরিচালনা করলো তখন এক ভীষণ হট্টগোল সৃষ্টি হলো এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পরিবর্তে তারা জুদাস-ইস্কারিয়টকেই গ্রেফতার করলো। এক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের বক্তব্য হলো–

'তারা তাকে না হত্যা করেছে, না শূলে চড়িয়েছে, বরং তাদের নিকট সন্দেহ হয়েছে, বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানারূপ কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান নেই তারা কেবল ধারণা কল্পনার অনুসরণ করছে, না তারা অবশ্যই ঈসা (আ.) কে হত্যা করেনি [১] -----

যখন 'বন্দীকে' রোমীয় বিচারক পাইলেইট-এর সামনে আনা হলো তখন ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তনে সকলেই খুশী হলো।

বেশির ভাগ সরল ধর্মানুরাগী ইয়াহুদী এই ভেবে খুশি হলো যে আলৌকিক ঘটনায় ঈসা (আ.)-এর পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতক জুদাস-এর শাস্তি হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতক রোমের তাবেদার ইহুদী চক্র খুশি হলো এই ভেবে যে শূলে চড়ানোর ঘটনার মধ্য দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর আইনতঃ মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তিনি বেঁচে থাকলেও ঐ নামে এসে তাদেরকে আর সমস্যায় ফেলতে পারবেন না।

এক্ষেত্রে রোমান বিচারক পাইলেইট-এর আচরণ ব্যখ্যা করা দুষ্কর। বাইবেলের সুসমাচারে তার সিদ্ধান্তহীনতার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইহুদী নেতার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ও তার সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তার সদিচ্ছার বিষয়টি পুরো ঘটনাকে অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। এটি সম্ভবতঃ সুসমাচার লেখকগণ রোমীয় শাসকদের ভাল নির্দোষ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ইয়াহুদীদের প্রতি পরিপূর্ণ দোষ চাপাতে অন্যায়ভাবে চিত্রিত করে থাকবেন। ঈসা (আ.) এ জীবনের একটি ঘোষিত লিখিত চরিত গ্রন্থ কেবল তখনই টিকে থাকা সম্ভব ছিলো যখন কেবল বিদেশী শাসকদের নির্দোষ ভাবমূর্তিতে মসি লিপ্ত না হয় এমন ব্যবস্থা থাকতো (এই একই কারণে ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যে সব হাদিস উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের গাত্রদাহের কারণ ছিলো তা পরিচিত ও বহুল আলোচিত হাদিস গ্রন্থগুলোতে স্থান পায়নি, কিংবা পেলেও যথাযথ গুরুত্ব পায়নি)। যে সব বর্ণনা বিদেশী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ছিলো কিংবা অপছন্দনীয় ছিলো সুসমাচার লেখকগণ তা হয় বাদ দিয়েছেন, নতুবা অর্ধ সত্য গোছের জোড়া তালি দিয়েছেন নতুবা অন্য কোন বর্ণনা দিয়ে তা ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছেন।

---

১. সূরা আল নীসা, ১১৫ নং আয়াত।

অপর একটি বিশ্বস্ত বর্ণনায় বলা হচ্ছে পাইলেইট ৩০,০০০ পাউন্ড ঘুষ-গ্রহণের বিনিময়ে জেনে বুঝে এ নাটক করেছেন যাতে ঘটনার সমাপ্তি রোমীয়দের ভাবমূর্তি রক্ষার মাধ্যমে হয়। বাইবেলের সুসমাচারগুলির বর্ণনাকে যদি সত্য ধরা যায় তা হলে এ বর্ণনা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

পরিশেষে এ বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মিশর এবং ইথিওপিয়া উভয় স্থানের কপটিক চার্চ এর ক্যালেন্ডারে খৃস্টান ঋষিদের তালিকায় পাইলেইট এবং তার স্ত্রী স্থান পেয়েছে। এ থেকে এ কথার প্রতি অধিক যুক্তি আসে যে পাইলেইট বাস্তব সত্য অবগত হয়েই বিশ্বাসঘাতক জুদাসকে শূলে চড়িয়ে হযরত ঈসা (আ.) কে আত্মগোপন করতে সাহায্য করেছেন।

অপরদিকে বারনাবাস-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, জুদাস্ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত ঈসা (আ.)-এর হস্ত চুম্বন করছিলো তখন অলৌকিকভাবে জিহোভা তাকে হযরত ঈসা (আ.) এর চেহারায় ও আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন এবং সৈন্যরা এই রূপান্তরিত জদাসকেই ঈসা (আ.) ভেবে গ্রেফতার করে। তার রূপান্তর এতটা নিখুঁত হয় যে স্বয়ং ঈসা (আ.)-এর মা বিবি মরিয়ম ও তাঁর ঘনিষ্ট সহচরগণ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলো যে হযরত ঈসা (আ.)-ই বন্দী হয়েছেন এবং শূলে চড়েছেন। তাঁর কথিত শূলে মৃত্যু বরণের পর যখন তিনি সশরীরে তাঁর মা ও ঘনিষ্টজনদের সাথে দেখা করেন কেবল তখনই তাঁদের ভুল ভাঙ্গল, এতো সব ভিন্ন বর্ণনাই প্রমাণ করে কি পরিমাণ রহস্য ঘেরা, অনুমানভিত্তিক বক্তব্য ছিলো ঈসা (আ.)-এর কথিত শূলে চড়ার ঘটনাকে ঘিরে। তাই সুসমাচার লেখকগণ যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না এবং ঈসা (আ.)-এর সহচরও ছিলেন না তারা তাই ভুল করেই বিশ্বাস করেছেন যে হযরত ঈসা (আ.)-ই শূলে চড়েছেন।

প্রত্যেকে অবশ্য একমত নয় যে, ঈসা (আ.)-এর বিশ্বাসঘাতক জুদাসই শূলে প্রাণ ত্যাগ করেছে। করিন্থিয়ান এবং পরবর্তীতে বেসিলিডিয়ান যারা প্রাথমিক খৃস্টানদের অন্তর্ভুক্ত দল ঈসা (আ.)-এর শূলে প্রাণ ত্যাগকে অস্বীকার করে এবং তারা দাবী করে সীরিনের সাইমন শূলবিদ্ধ হয়েছে।

পিটার পল আর জন এর সমসাময়িক ক্যারিনথাসও হযরত ইসা (আ.) এর শূলবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করে। প্রাথমিক খৃস্টানদের মধ্য থেকে কারপো ক্রেটিয়ানরা মনে করে হযরত ঈসা (আ.) নন বরং তাঁর সাথীদের মধ্যে তাঁর সদৃশজন শূলবিদ্ধ হয়েছেন। চতুর্থ শতকের প্লুটিনাস বলেন তিনি (Journy of Aposteles) নামে একটা বই পড়েছেন যেখানে পিটার, জন, এ্যান্ড্রু, টমাস এবং পল-এর কার্যবিবরণী বর্ণিত ছিলো। বইটিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও ছিলো

যে হযরত ঈসা (আ.) নন, তৎপরিবর্তে অপর একজন শূলে চড়েছে এবং প্লুটিনাস এ নিয়ে যারা ঈসা (আ.)-ই শূলবিদ্ধ হয়েছেন বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে ঠাট্টা করেছেন।

তাই কেউ কেউ বর্ণনা করেন ঃ

যখন কেউ রোমানীয় সৈন্যদের শোক এবং ক্ষোভের বর্ণনা পড়েন এবং এর প্রমাণে ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর কতগুলি বাক্যকে উক্ত করেন তখন অনেকেই একে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ও নব-আবিষ্কার বলেই মনে করেন।

(এ সব সন্দেহমূলক বৃত্তান্ত-এর তুলনায় পবিত্র কোরআন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক জন্ম, দোলনায় থাকাকালীন কথা বলা, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য-কলাপ করা, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, ইয়াহুদী এবং রোমানদের ষড়যন্ত্র ও অবশেষে তাঁকে তুলে নেওয়া এবং তাঁর এ দুনিয়াতে পুনরায় আগমন ও রাজত্বকরণ এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা করে এবং তা কারও নজর থেকে এড়ায়না)। ইসলামে শিরক চিহ্নিত করার গুরুত্ব, শিরক বর্জন এবং শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার সর্বোচ্চ তা'কীদ রয়েছে। বাবা হজরত আদম (আ.) থেকেই শিরক এর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এ প্রচেষ্টা চলে আসছে। পূর্ববর্তী নবীরা কেমন জিন্দেগী যাপন করেছেন তার দৃষ্টান্ত পেশ করার জন্যই আমরা এতবড় উদ্ধৃতি পেশ করলাম। সেই সাথে এই যুগেও যাঁরা তৌহিদের হেফাজতের জন্য, শিরক নিশ্চিহ্ন করার জন্য, তাগুত উৎখাত করার জন্য অকাতরে জীবন দিচ্ছেন এবং পাহাড়-মরু-জঙ্গল ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় আশ্রয় নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছেন তাঁরা যে সঠিক পথে থেকে নবীদের প্রদর্শিত পথে লোকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তার দৃষ্টান্তও পেশ করলাম। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাগুতাশ্রিত জীবনের গোমরাহী থেকে উদ্ধারের রাস্তা তিনটি। অত্র পুস্তকের ৩১-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তার মধ্যে প্রথম রাস্তাটি অবলম্বন করে নবীদের যুগে সে কাজ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার মোটামুটি চিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে।

পরিবেশক

কাঁটাবন বুক কর্ণার
কাটাবন মসজিদ মেইন গেইট
এলিফেন্ট রোড
ঢাকা-১০০০
ফোন - ৯৬৬০৪৫২

গাজীপুর ইসলামী বুক কর্ণার
ঈদগাহ্ মসজিদ মার্কেট
চৌরাস্তা দোতলা
গাজীপুর
ফোন - ৯২৬৪১৮৩

লেখক পরিচিতি

নাম : মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

জন্ম : ৩১. ১২. '৫৩

শিক্ষা : এম. বি. বি. এস
এম. সি. পি. এস
(এনেসথেসিওলজী)

পেশা : বেসরকারি এনেসথেসিওলজি
প্র্যাকটিস

অপরাপর লেখা : ১. কোরআনের দিকে
প্রত্যাবর্তন
২. কোরআনের ভাষা শিক্ষা

সামাজিক কর্ম : কোরআনের ভাষা শিক্ষা
কর্মসূচি বাস্তবায়ন